পরিক্রমা

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পরিষদ পত্রিকা

প্রথম সংখ্যা : ১৪০২ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬

সম্পাদক
অপূর্বানন্দ মজুমদার

গবেষণা পরিষদ
বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পরিষদ পত্রিকা

প্রথম সংখ্যা : ১৪০২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
শ্রীবিজয়কুমার ধর
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কৃতজ্ঞতা
চতুর্দশ অধিবেশন অভ্যর্থনা সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

প্রচ্ছদ
ময়নুল হক বড়ভুইয়া

মুদ্রণ
দরবারী অফ্‌সেট প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর
উত্তর ২৪ পরগণা

পরিবেশক
এন. পি. সেলস্ প্রাঃ লিঃ
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আবাহন
প্রেমতলা, শিলচর-৭৮৮ ০০১
(আসাম)

মূল্য : ষাট টাকা

GAVESHANA PARISHAD PATRIKA : A Research Journal in Bengali. Vol. 1, No. 1. Editor : Dr. Apurbananda Mazumdar, Reader, Deptt. of Commerce, Assam University (R.E.C. Campus), SILCHAR - 788 010, Assam.

পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় অভিব্যক্ত মতামত, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট লেখকদের, গবেষণা পরিষদের নয়।

শুভেচ্ছা বাণী

গবেষণা পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে, এতে আমরা আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস, এই পত্রিকাটি বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্মকাণ্ডে একটি নতুন ও বলিষ্ঠ মাত্রা সংযোজন করবে।

নদীমাতৃক আমাদের সভ্যতা। বরাক নদী ধারণ করে আছে এ অঞ্চলের সুপ্রাচীন বঙ্গ সংস্কৃতির ধারাটিকে। সুদূর প্রাচীনকাল, অন্ততঃ দেড় হাজার বছর আগেকার প্রাপ্ত নিদর্শন আমাদের বলে দেয় বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত আমাদের এই অঞ্চলভূমির মূল সাংস্কৃতিক উৎস এবং আবহটির কথা। ইতিহাসের দীর্ঘকালীন সচল প্রক্রিয়ায় নানা জাতি উপজাতির সমাগম এখানে প্রাচীন কাল থেকেই হয়েছে ; যদিও বরাক উপত্যকার মূল সংস্কৃতির ধারাটি যে বঙ্গ সংস্কৃতিরই —এ সত্যের সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে এখানকার সমাজ জীবন প্রবাহে।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দশকগুলোতে কলকাতাই ছিল বঙ্গভাষা অধ্যুষিত এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্পন্দন ও চিন্তা-চেতনার নিরন্তর উৎসস্থল। সময় পাল্টেছে। স্বাধীনতা এসেছে দেশভাগের মাধ্যমে। বহু বছর পর অঙ্গচ্ছেদের গ্লানি কাটিয়ে উঠে আমাদের প্রিয় বরাককে আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি আমরা চাইছিলাম এ উপত্যকায় গড়ে উঠুক একটি উন্নত গবেষণার পরিকাঠামো। বস্তুতঃ চতুর্দশ অধিবেশন অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হবার পর গবেষণা-বিষয়ক কিছু করা যায় কি না, তেমন একটা ভাবনা আমাদের প্রথম থেকেই ছিল। অধিবেশনের পর তাই উদ্বৃত্ত অর্থের একটি অংশ সর্বসম্মতিক্রমে গবেষণা পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য বরাদ্দ করা হয়।

প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটি যে এ অঞ্চলের চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের
চতুর্দশ অধিবেশন অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে

প্রভাস সেন মজুমদার
সভাপতি

শিলচর,
১লা মাঘ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

মুখবন্ধ

গবেষণা পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হ'ল।

অঞ্চলভিত্তিক গবেষণাকে ব্যাপ্তি ও বলিষ্ঠতা দানের উদ্দেশ্যে গত শতকের শেষ লগ্নে গবেষণা পরিষদ যে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, পঞ্চদশ শতকে এসে তা প্রত্যয়ী ও বেগবান হয়ে উঠেছে। উপত্যকার বিদ্বৎমহলে গবেষণা পরিষদ আজ একটি পরিচিত নাম। শিলচরে সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি গবেষণা পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য এককালীন কুড়ি হাজার টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। গবেষণা পরিষদ যে সবার আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, এতে আমরা আনন্দিত।

উত্তর পূর্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় বরাক উপত্যকার গবেষণার অগ্রগতি এখনো অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, ইতিহাস—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবেষণায় এ উপত্যকা অনেক পিছিয়ে। অগ্রাধিকার দাবী করে এমন ক্ষেত্রগুলোর তালিকাটি সুবিশাল। সমস্যা বহুতর। সবার উপরে অবশ্যই রয়েছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। গবেষণা আজ উত্তরোত্তর ব্যয়সাপেক্ষ। অথচ এ উপত্যকায় গবেষণার কাজে সরকারী আনুকূল্য এখনো প্রায়-অনুপস্থিত।

এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উপত্যকায় গবেষণার কাজ থেমে নেই। একদিকে প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের প্রয়াস অবারিত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি প্রতি বছরই বহু তরুণ গবেষক এগিয়ে আসছেন নব নব দিক উন্মোচনের স্পৃহা নিয়ে। এদের সবার প্রয়াসকে একসূত্রে বাঁধা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত গবেষণা প্রকল্পগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করার। গবেষণা পরিষদ পত্রিকাটি এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

গবেষণা পরিষদের সদস্যবর্গকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই চতুর্দশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতিকে। প্রথম সংখ্যাটি গবেষক ও পাঠকমহলে সমাদৃত হবে—এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী
সভাপতি
বিজয়কুমার ধর
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি

মাঘ ১৪০২

বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

সূচি

সম্পাদকীয় ১

☐ প্রস্তাবনা

গবেষণার কথা অসীম কুমার দত্ত ৩

বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা
জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য ৬

☐ বিশেষ নিবন্ধ

বরাক উপত্যকায় আর্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : কয়েকটি অনালোচিত ও লোলায়ত তথ্যসূত্র অমলেন্দু ভট্টাচার্য ১২

ভাটেরা তাম্রশাসন : সাহিত্য বিচার ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন হরিপদ চক্রবর্তী ৫৪

সুলতানী আমলের একটি অনালোচিত লিপি সুজিৎ চৌধুরী ৭৭

কাছাড়ে চা-শিল্পের আদিপর্ব : অপ্রকাশিত কয়েকটি সরকারী পত্র দেবব্রত দত্ত ৮২

☐ আলোচনা

বরাকের উপন্যাস ও অশ্রুমালিনী ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য ১০৩

☐ সমালোচনা : গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

মননের প্রাকৃতায়ন তপোধীর ভট্টাচার্য ১১৮

ইতিহাসের মৌন মুখর মুহূর্তগুলি কথা বলুক আজ অনুরূপা বিশ্বাস ১২৫

☐ পরিশিষ্ট

বরাক উপত্যকা-ভিত্তিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, নিবন্ধ ও থিসিস সমূহের একটি প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ তালিকা ১২৮

ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে গবেষণা পরিষদ আহবায়কের লিখিত প্রতিবেদন ১৪২

লেখক-পরিচিতি

অসীমকুমার দত্ত	ইতিহাসবিদ্। ভূতপূর্ব ডীন, কলেজ অব্ আর্টস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য	ইতিহাসবিদ্। উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।
অমলেন্দু ভট্টাচার্য	লোকসংস্কৃতি গবেষক। প্রভাষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর।
হরিপদ চক্রবর্তী	প্রবক্তা, সংস্কৃত বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।
সুজিৎ চৌধুরী	প্রাবন্ধিক। গবেষক। প্রাক্তন ফেলো, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, সিমলা।
দেবব্রত দত্ত	ইতিহাসবিদ্। প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কাছাড় কলেজ, শিলচর।
ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য	অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।
তপোধীর ভট্টাচার্য	অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।
অনুরূপা বিশ্বাস	কবি ও প্রাবন্ধিক। সভানেত্রী, নর্থ-ইস্টার্ণ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, শিলচর।
প্রশান্ত আচার্য	প্রভাষক, অর্থনীতিবিদ্যা বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর।
ময়নুল হক বড়ভুইয়া (প্রচ্ছদ শিল্পী)	প্রভাষক, সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভ আর্টস, উত্তর পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়, শিলং।

সম্পাদকীয়

গবেষণা পরিষদ পত্রিকার যাত্রা শুরু হ'ল।

বরাক উপত্যকা থেকে একটি উন্নতমানের গবেষণা-পত্রিকা বের হোক—চাহিদাটি দীর্ঘদিনের। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও হিসেব মেলানো যাচ্ছিলো না কিছুতেই। গবেষণা পরিষদ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আসামের দক্ষিণতম প্রান্তে বঙ্গভাষী বরাক উপত্যকায় এ-ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলায় গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশের কাজে উদ্যোগী হওয়াটা অস্বাভাবিক না হলেও খুব সহজ কাজ ছিল না। বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি এককালীন আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এই অসাধ্য-সাধনে আমাদের সহায়তা করেছেন। তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

সম্পাদনা ও পত্রিকা প্রকাশের দীর্ঘ পরিক্রমায় শ্রীদেবব্রত দত্ত, শ্রীমতী অনুরূপা বিশ্বাস, শ্রীবিজিৎ চৌধুরী, ড. সুবীর কর, শ্রীনৃপতি রঞ্জন চৌধুরী ও শ্রীবিজয়কুমার ধরের পথনির্দেশ এবং চতুর্দশ অধিবেশন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রভাস সেন মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুজিৎ ভট্টাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীশ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর উদ্যোগ ও আগ্রহ আমাদেরেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে অবিরাম। কলকাতার এন. পি. সেলস্ প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে শ্রীমতী আরতি মিত্র মুদ্রণ-সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে পরিবেশনার আংশিক দায়ভার গ্রহণ করে পত্রিকা-প্রকাশের কাজটিকে সহজতর করেছেন। সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা করেছেন ড. তপোধীর ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, সঞ্জীব দেব লস্কর, অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী ও অধ্যাপক সঞ্জীব ভট্টাচার্য। এঁদের সবাইকে গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

পত্রিকার ক্রমাগত উৎকর্ষ-সাধনই এ মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য। যদিও পাঠকরা জানেন, গবেষণা পরিষদের একক চেষ্টায় তা হবার নয়। সম্ভাব্য লেখার গুণাগুণের উপরই নির্ভর করবে আগামীদিনে পত্রিকার মান। পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান গবেষক এখনো সংখ্যায় নগণ্য। গবেষণায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্যের যথার্থতা বিচারের সক্ষমতা ও পদ্ধতির প্রয়োগকুশলতা—উত্তর-পূর্বের এই প্রান্তিকায়িত ভূগোলে এসব গড়ে উঠছে মাত্র। অথচ, জ্ঞান ও তথ্যের মুক্তপ্রবাহের এ-যুগে নিজেদেরকে বিশ্বমানে উন্নীত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে পত্রিকার আগামী সংখ্যাগুলোর লেখা নির্বাচনের সময় নিম্নের চার ধরনের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে ঃ

(ক) নতুন তথ্য, পদ্ধতি বা দৃষ্টিকোণের প্রয়োগে প্রচলিত কোন ধারণা অথবা সিদ্ধান্তের নব মূল্যায়ন ;

(খ) অনালোচিত বিষয়ের উপর বিজ্ঞানসম্মত আলোকসম্পাত ;

(গ) অনাবিষ্কৃত তথ্যসূত্রের উদ্ঘাটন এবং

(ঘ) গবেষণার পদ্ধতি-প্রকরণ-বিষয়ক প্রাগসর আলোচনা।

লেখকদের পদ্ধতি-সচেতন ও মৌলিক-তথ্য-নির্ভর হবার আহ্বান জানাই।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৪০১ বঙ্গাব্দে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন বছরটিকে এ উপত্যকায় 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ'রূপে উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বর্ষ-কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রথম সংখ্যার আলোচ্য বিষয় ঃ ***বরাক উপত্যকার ইতিহাস।***

বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবং গবেষণা পরিষদ প্রথম সংখ্যা সম্পাদনার পুরো স্বাধীনতা দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। দায়িত্ব কতখানি পালন করতে পেরেছি, তা পাঠকদের বিচার্য। বন্ধুবর ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ধৃষ্টতা আমার নেই। সম্পাদনার প্রতিটি স্তরে তিনি ওতপ্রোতভাবে নিজেকে না জড়িয়ে রাখলে প্রথম সংখ্যা সময়মত প্রকাশ করা অসম্ভব হতো।

লেখকদেরকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। যথাসাধ্য সতর্কতা নেয়া সত্ত্বেও পত্রিকাকে ত্রুটিমুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই এককভাবে সম্পাদকের।

মাঘ ১৪০২ **অপূর্বানন্দ মজুমদার**

অসীমকুমার দত্ত

গবেষণার কথা

সংস্কৃতে গবেষ্ ধাতুর অর্থ 'অন্বেষণ করা' ; তা থেকে উৎপন্ন 'গবেষণা' শব্দের অর্থ একান্তভাবে চাওয়া। বাংলায় 'চলন্তিকা' অর্থ দিচ্ছে তত্ত্বানুসন্ধান। Research বলতে আমরা যা বুঝি তা এই একটি কথাই পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। Research এর- ধারা আমাদের দেশে এসেছে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন প্রথা থেকে। তাই ইংরেজি অভিধানে এই পদটির কি অর্থ দিচ্ছে দেখে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Concise Oxford Dictionary-র মতে Research হচ্ছে 'careful search or enquiry after or for, endeavour to discover new facts etc. by scientific study of a subject, course of critical observation.' Webster এই কথাটিই সামান্য আলাদা ভাষায় বলছেন : 'careful or critical enquiry or examination in seeking facts or principles, diligent investigation in order to ascertain something.' অর্থাৎ, Research এর লক্ষ্য নতুন তথ্য আবিষ্কার, অভিনব কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তার পন্থা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাসঙ্গিক পটভূমিকে বিচার করে সযত্নে তথ্য আহরণ করে অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে নতুন একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা।

বলা অন্যায় নয় যে স্কুলে বা কলেজে যেভাবে পড়ান উচিত তার সঙ্গে Research এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। কেমন করে? সেই দৈনন্দিন পড়ানও হওয়া চাই যে তথ্য আহরণ করা যায় তাকে যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের সামনে ধরা। স্কুলের ক্ষেত্রে তথ্য সীমিত; কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তা বহু বিস্তৃত—কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই পড়ানোর ভিত্তি থাকবে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের পথে ব্যবহারের প্রথম ও প্রধান অস্ত্র হ'ল প্রশ্ন— কেন এমন হয় বা হয়েছিল? কেন তেমন হ'ল না? ওরকম হ'লে কি পরিণতি হ'ত? এক ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া, অন্য ক্ষেত্রে অন্য ধরনের কেন? গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সত্য নিরূপণের পন্থা ছিল প্রশ্ন করে উত্তর নিয়ে তাকে যাচাই করে নতুন আরেক প্রশ্ন করে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া। "Socratic method" কথাটি সাধারণ অভিধানে স্থান পেয়ে গিয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে, যেখানে আপ্তবাক্যের মর্যাদা বড় বেশি, সেখানেও সর্বজনমান্য বই গীতাতে বলা হয়েছিল, জ্ঞান লাভ করতে হ'লে প্রশ্নও করা চাই - 'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' (চতুর্থ অধ্যায়, ৩৪ সংখ্যক শ্লোক)—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায়, এমন ভাষায় তার অনুবাদ হ'তে পারে, বিনয়ের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করো, প্রশ্ন করে জেনে নিয়ো, জ্ঞানকে সেবা করো। জানার পথে প্রশ্ন করা কেমন জরুরী সেই কথাটি হালকা করে সুন্দর এক কবিতা স্তবকে বলেছিলেন ইংরাজ লেখক Rudyard Kipling :

'I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew) :
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.'

কি, কেন, কখন, কেমন করে, কোথায়, কে—এই ষড়ঙ্গ সেনা জ্ঞানান্বেষণকারীর পদে পদে প্রয়োজন।

হিন্দীতে এক প্রবাদ, 'চেলা গুরকা গুরা'—শিষ্য হ'ল গুরুর গুরু। কেমন করে? না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শিষ্য গুরুকে পাঠাভ্যাসে অতন্দ্র রাখে। ক্লাসে পড়ানতে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম—ছাত্রেরা ক্লাসে চুপ করে থাকে। এদের ধারণা শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অশিষ্ট আচরণ। (আমরা কেউ কেউ যে কেমন তটস্থ তা নয় !) আরেকটা কারণ ক্লাসে যেহেতু ইংরেজিতে বক্তৃতা হয়, ছাত্রেরা সেখানে মুখ খুলতে অনিচ্ছুক, পাছে ব্যাকরণেশ ভুল ধরা পড়ে। তাই সাধারণতঃ আমাদের ক্লাস ঘরে একতরফা বক্তৃতাই চলে, আলোচনা হয় না। ছাত্রের মনে কৌতূহল বা সংশয় যাই জাগুক সেটা প্রকাশ পায় না। অজান্তে জন্মে বিচার-না-করে আপ্তবাক্য মেনে নেওয়ার। আমাদের দেশের 'গুরুবাদ' এই অভ্যাসের অনুকূল জমি প্রস্তুত করে রেখেছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে বহু বিষয়ে তর্কবিতর্কে শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে দিলে প্রতিপক্ষ একেবারে চুপ হয়ে যায়। যেন এর জবাব নেই। হিন্দুশাস্ত্র বিশাল ; এমনকি বলা হয়েছে একটা আলাদা মত যিনি প্রকাশ করেন অমনি তিনি 'মুনির' মর্যাদা পাবার যোগ্য নন—'নাসৌ মুনিযস্য মতং ন ভিন্নম্'। ফলে, শাস্ত্রের, আপ্তবাক্যের জয়জয়কার। যে সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলে কেউ দাবী করতে চায়, সে নিজের সমর্থনে একাধিক শাস্ত্রবচন পেয়ে যাবে। এ যেন ইংরেজদের আইনে পুরনো রায়ের নজির। এখানে আইনের সব রকম ব্যাখ্যাণর সমর্থনে 'ruling' পাওয়া যায়, এবং দুইপক্ষের কৌঁসুলি বিচারকের সামনে পরস্পর-বিরোধী দুই গ্রন্থ নজির উপস্থিত করেন। বিচারক কি নীতি অবলম্বন করবেন? তাঁর কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি রায়ের পিছনে যুক্তিটা কি তা বের করা, যাকে বলা হয় 'ratio decidendi', এবং তার সমন্বয় করে সিদ্ধান্তে আসা। আমাদের শাস্ত্রেও সেই উপদেশ আছে—

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজয়তে।।'

'শুধু শাস্ত্রকে আশ্রয় করে কর্তব্য নির্ণয় করো না—যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের ক্ষতি হয়।' এই শ্লোকটি একটা অপ্রত্যাশিত স্থানে রয়েছে। মনুস্মৃতি, যা আপ্তবাক্যেই ভরা, তার দ্বাদশ অধ্যায়ের টাকাতে কুল্লুভট্ট এই উক্তিটি দিয়েছেন।

জাতি হিসাবে আমরা যেন Quotation-প্রিয়। স্কুল কলেজে পড়ার সময় অনেক ছাত্রের মনেই ধারণা জন্মে যে রচনাতে, উত্তরপত্রে, বড় পণ্ডিত ব্যক্তির উক্তির সমাবেশ ঘটালে তার মূল্য বাড়ে—প্রমাণিত হয় সে কত পড়েছে। Rhetoric বা অলঙ্কার হিসাবে মনোগ্রাহী বা চটকদার উক্তির মূল্য থাকে, কিন্তু যুক্তি হিসাবে নয়। Ph.D. thesis-এ বিখ্যাত সব পণ্ডিত ব্যক্তির উক্তি বা অভিমতের সংগ্রহ জড়ো করে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সেই অভিমতের সঙ্গে যদি যুক্তি প্রমাণটি না দেওয়া থাকে, তবে এমন উদ্ধৃতির মূল্য বড় থাকে না, উক্তিটি যত বড় পণ্ডিতেরই হোক না কেন। অন্যের অভিমত গ্রহণ করার মানে হচ্ছে তাকে যুক্তি প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত থাকা। গবেষণাপত্রের মূল্য বিচারিত হবে লেখক নিজে কতখানি নতুন তথ্য খুঁজে পেয়েছেন এবং তাকে সাক্ষ্য প্রমাণে গ্রহণযোগ্য করে দিতে পেরেছেন কিনা। উদ্ধৃতি হিসাবে *ipse dixit*—'প্রভুর উক্তি এই'—বা আপ্তবাক্যের মূল্য কিছু নেই। এগুলি স্বয়ংসিদ্ধ সত্যের (axiomatic truth) পর্যায়ের নয়। আপ্তবচনের অর্থ জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস বলছেন, 'বেদবাক্য, ঈশ্বর প্রকটিত সত্য।' Monier Williams তার অর্থ দিতে গিয়ে বলছেন—'... সত্য ঘোষণা, বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য, বেদ, স্মৃতি, ... পুরাণ ইত্যাদি।' স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাভ্যাসের একটা প্রধান অঙ্গ হ'ল একটা উক্তি বা অভিমত গ্রহণযোগ্য কিনা তা যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে বিচার করে দেখা। পরীক্ষা দিয়ে, নিজের বিদ্যা প্রমাণ করে, উচ্চতম যে ডিগ্রী পাওয়া যেতে পারে তা হ'ল Ph.D. সেই স্তরের পরীক্ষার্থীকে তার নিবন্ধে প্রতিপদে দেখাতে হয় যে তার উক্তি আর অভিমতের পিছনে সাক্ষ্য-প্রমাণ-যুক্তি রয়েছে। এবং অন্যের সিদ্ধান্ত যেখানে তিনি নিয়েছেন সেখানে যুক্তিও দেখিয়ে দিচ্ছেন। যেসব অভিমত

পণ্ডিতসমাজ গ্রহণ করে নিয়েছেন, সেখানে নতুন করে প্রমাণের অবতারণার প্রয়োজন হয় না। যেমন ঐতিহাসিকেরা যুক্তি প্রমাণ পেয়েছেন বলে মেনে নিয়েছেন 'দেবানাং পিয় পিয়দসি' এই নাম যিনি অনুশাসনে ব্যবহার করেছেন তিনি মৌর্য সম্রাট অশোক। এখন আর নতুন করে এই কথা প্রমাণ করতে হবে না, এবং যে কোন গবেষক পূর্ববর্তীদের অভিমতের উপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু তিনি নতুন যে মতই প্রকাশ করবেন তার জন্য তাকে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের একটা আদর্শ হ'ল যে সব তথ্য আবিষ্কৃত তার খবর তিনি ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেবেন, সেই তথ্য আহরণে যতই অসুবিধা থাকুক। এও গবেষণা। আর সেই সঙ্গে নিজের গবেষণা দিয়ে তিনি জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে থাকবেন ('extend the frontiers of knowledge')। নিজে Ph.D. ডিগ্রী অর্জন করে তিনি প্রমাণ দেবেন যে এই কাজ তিনি করতে পারেন— গবেষণা করার কৌশল তাঁর আয়ত্তাধীন। Ph.D. ডিগ্রীর আবশ্যিক শর্ত হ'ল এই নিবন্ধ হবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন এবং তাতে লেখকের মৌলিকতার স্বাক্ষর থাকবে। এই মৌলিকতা নতুন তথ্য আবিষ্কারের প্রকাশ পেতে পারে বা তার নিজস্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতায়। তবে Ph.D. অর্জনেই যেন একজন শিক্ষকের জ্ঞানস্পৃহা থেমে না যায়। স্কুলে হোক, কলেজে হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক, একজন শিক্ষক যেন আজীবন বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী থাকেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ নিত্য ঘটছে। তার সন্ধান থাকে নতুন প্রকাশিত বইয়ে, পত্রপত্রিকার প্রবন্ধে। সহকর্মী বন্ধু-বান্ধব এরা যদি বিদ্যোৎসাহী হ'ন, এদের সাহচর্যে নতুন আবিষ্কার আলোচনা ব্যাখ্যার খবর পাওয়া যায়। প্রতিবারের ছাত্ররা নতুন—তারা তাদের উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে ক্লাসে আসে—আশা করে শিক্ষক তাদের নবীনতার স্পর্শ দিয়ে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। শিক্ষককে তাই অধীত পরিচিত বিষয়ের সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় করে নিতে হয়। এই ব্যাপারে 'Peer culture' এর একটা বড় স্থান আছে। যে প্রতিষ্ঠানে একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে শিক্ষকেরা নতুন বই পড়েন, দৃষ্টিভঙ্গী সজাগ রাখেন, সেখানে নতুন যেসব শিক্ষক আসবেন তাঁরাও এই আদর্শ গ্রহণ করে নেবেন। নতুন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুব জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে এমন ঐতিহ্য স্থাপন করা।

জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য

বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চা : আবশ্যকতা

একটি দেশ, জাতি বা একটি সমাজের তাৎপর্যমূলক ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণকে ইতিহাস বলা হয়েছে। এসব ঘটনরাজির ভিত্তিতে সমালোচনাত্মক এবং সংহত বিবরণ উপস্থাপন করা হল ঐতিহাসিকের মূল কর্তব্য। সৌরজগত থেকে শুরু করে ভূ-প্রকৃতি বা জীবজন্তুরও ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু এখানে যে ইতিহাসের কথা বলা হচ্ছে এর বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ। সেই জন্য অতীতকাল থেকে মানব সমাজ কি ভাবে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে তার সত্যান্বেষণের প্রক্রিয়াই হল ইতিহাস চর্চা।

কলা হিসেবে ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টের জন্মের বহু আগেই গ্রীস দেশে ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। গ্রীক 'ইস্টুরিয়া' এবং ল্যাটিন 'হিস্টুরিয়া' থেকে বর্তমান ইংরেজী শব্দ History-র উৎপত্তি। ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন গ্রন্থে 'ইতিহাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে বিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনের স্রোত নিয়ে এসেছিল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছিল। ফলে পুরনো কালের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক নূতন ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করেছিল। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ইতিহাসেও এক শক্তিশালী ব্যবসায়িক প্রবণতা যুক্ত হয়েছিল। বর্তমান শতকে ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানব সমাজের বর্তমান সমস্যাকে অনুধাবন করতে অথবা এর সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতার ভূমিকা অপরিহার্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন কার্ল মার্ক্স। তাঁর মতে ইতিহাসের প্রথম কথাই হল পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের প্রবাহ অন্তহীন। মানব সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায় সমাজব্যবস্থা ছিল সরল এবং বৈষম্যহীন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই থেকে ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণী বিরোধের ইতিহাস। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমাজের উদ্ভব হয়েছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক জীবন ও চেহারাও পরিবর্তিত হয়েছে; এ ভাবে মানুষ এক যুগ থেকে অন্য যুগে, সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক জগৎ আধুনিক ধনতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। সে জন্য বিভিন্ন যুগে বা বিভিন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে মূল প্রভেদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি নজর দিতে হচ্ছে।

পরিবর্তনের প্রবাহ অন্তহীন। এর ক্রমবিকাশের অসমান গতি, কখনও বা বিপ্লবের আবির্ভাব, শ্রেণীবিরোধ এবং সেই সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থের প্রাধান্য এবং শ্রেণীসম্বন্ধ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যসঙ্কুল সমাজের উদ্ভব সম্পর্কে আগ্রহই হচ্ছে আধুনিক ইতিহাস চর্চার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। মার্ক্সের সূত্রে শুধু অতীত নয় মানব সমাজের ভবিষ্যতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এজন্য

বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার জন্য বর্তমানকালের ঐতিহাসিকদের অনেকেই মার্ক্সীয় পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অতীতের অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা অসীম। এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস মানুষের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যের দর্পণ। এই দর্পণে মানুষ নিজের ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। জন্মগত অধিকারে নিজস্ব ঐতিহ্যের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে মনোবল এবং ভবিষ্যৎ-সমাজ নির্মাণের প্রেরণা। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এদের মধ্যে পরম্পরাগত উত্তরাধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের বর্তমান হঠাৎ করে তৈরী হয়নি। দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করে আমরা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। সে জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমানের সমস্যাবলীার একটা সমাধান সূত্র দিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের সহায়ক হতে পারে। অতীত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা মানবজাতির অন্যায়, ভুলত্রুটি বা দুঃখ-দুর্দশার কারণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি আর এসবের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এজন্য সচেতন হতে পারি। এককথায় আজকের মানুষ, আজকের সমাজ বা আজকের সমস্যা সব কিছুর অস্তিত্বই অতীতে লুকিয়ে রয়েছে। অতএব বর্তমানকে বুঝতে হলে বা ভবিষ্যৎ-এর আগাম সঙ্কেত পেতে হলে ইতিহাসের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

ইতিহাসের আবশ্যকতা : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা

নানা সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এই বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রেও ইতিহাসের আবশ্যকতা অপরিসীম। দেশ বিভাগের ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কোন কোন প্রভাবশালী মহল এখানকার মানুষের ইতিহাস বিকৃত করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নানা অপপ্রচারের ফলে অবশিষ্ট দেশবাসীর মনেও বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক ও ভাষিক চরিত্র নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। এখানকার মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট এক জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযোগী একটি মুক্ত পরিবেশের অভাব সকলেই অনুভব করে আসছেন। মানুষের আত্মবোধ ও আত্মপ্রত্যয় আহত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সৃজনশীলতা নানা ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইতিহাস সচেতনতাই আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্ত করে সাহিত্য সংস্কৃতির সাবলীল বিকাশের সহায়ক হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে।

অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পিছনেও নিশ্চয়ই কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হয়েও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযুক্ত পরিকাঠামো এখনও বরাক উপত্যকায় গড়ে ওঠেনি। স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা বার বার উপেক্ষিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে অনেকগুলো প্রকল্প অনুমোদিত হয়েও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও দুর্বল, কৃষি পদ্ধতির আশানুরূপ আধুনিকীকরণ যেমন হয়নি তেমনি কৃষির জন্য উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থাও হয়নি। শিল্পায়ন এখনও দূর-সম্ভাবনা। ঐতিহ্যমণ্ডিত চা শিল্প অতীতের জৌলুস হারিয়ে আজ বহু সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যুৎ সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য। বন্যা এখনও একটি জীবন্ত সমস্যা। চার দশক থেকে বরাক-ড্যাম একটি স্বপ্ন হয়েই রয়েছে। বহুল প্রচারিত প্যাকেজ প্রোগ্রামই বা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে? চিনির কলে উৎপাদন শুরু হতে না হতেই বন্ধ হয়ে গেল। কাগজ কলেরও বেসরকারী করণের কথা শোনা যাচ্ছে। বেকার সমস্যা কেন বেড়েই চলেছে? প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিন্তাধারাও কেন দূষণ? শৈক্ষিক পরিবেশ কেন যথেষ্ট মুক্ত নয়? অথচ

প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ এই উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান শিল্পায়ন ও আঞ্চলিক স্তরে বাণিজ্যিক বিকাশের অনুকূল হতে পারত। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের পাঁচটির সঙ্গমস্থল হচ্ছে বরাক উপত্যকা। এই উপত্যকার সঙ্গে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সরাসরি বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে; বাংলাদেশ হয়ে স্থল ও নৌপথ চালু হলে কলকাতা বা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এ অঞ্চলের দূরত্ব অনেকখানি কমে যেত। এতসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রগতি আশানুরূপ বা যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার পর থেকে কয়েকটি প্রকল্প গ্রাহ্য হয়েও সঠিক সময়ে বাস্তবে রূপায়িত হল না কেন? এসব প্রশ্নের জবাব পাঁচ দশকের ইতিহাসের কাছে পাওয়া যেতে পারে। অতএব পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মত বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রেও ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয়রূপে স্বীকৃত হবার প্রয়োজন বার বার অনুভব করা গেছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বরাক উপত্যকার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। এই সমস্যা হয়ত শুধু বরাক উপত্যকারই নয়; কেননা ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গবেষণা যে হয়নি সেটা ভারতবর্ষের সকল ঐতিহাসিকরাই মেনে নিয়েছেন। সেই জন্য ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্তরের দশক থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ইতিহাস সংস্থা গড়ে উঠেছে। আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলেও 'নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া হিস্ট্রি এসোসিয়েশন' বা উত্তর পূর্ব ভারত ইতিহাস সংস্থা নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। বরাক উপত্যকায় কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে এখনও কোন ইতিহাস সংস্থা গড়ে ওঠেনি। এসব কথা ভেবেই হয়ত বরাক উপত্যকা বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বরাক উপত্যকায় ১৪০১ বঙ্গাব্দ ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ হিসেবে পালিত হোক। এই অনুসন্ধান বর্ষের মধ্যে দিয়ে যেটুকু কাজকর্ম হয়েছে তাতে এখানকার গবেষক মাত্রেই আশান্বিত। ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষে গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও যেভাবে সাড়া পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে এখানকার মানুষ নিজেদের অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে অনেকখানি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, মানুষের মধ্যে ইতিহাস-সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের বিশ্বাস এই সচেতনতার মধ্য দিয়েই এ অঞ্চলের সার্বিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যারও সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

আঞ্চলিক ইতিহাস অধ্যয়ন : পর্যালোচনা

ভারতবর্ষের ইতিহাস বা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর Fundamental Unity of India গ্রন্থে বলেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে Unity in diversity। সেই থেকে এই কথাটা আমরা বার বার ব্যবহার করে আসছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বা ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুটোই রয়েছে এটা প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এর কারণ যদি জানতে হয় অর্থাৎ কেন এই ঐক্য এবং কেন এই বৈচিত্র্য তাহলে খুঁজতে হবে ভারতের ইতিহাস। যে ইতিহাস মূলতঃ আঞ্চলিক ইতিহাস। আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের সমষ্টিগত ইতিহাসই হচ্ছে ভারতের জাতীয় ইতিহাস। ভারত রাষ্ট্রটিতে যেমন বিভিন্ন অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠী রয়েছে তেমনি প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য রয়েছে। ঐতিহাসিককালে সময়ে সময়ে কিছু কিছু অঞ্চল আর্থ-সামাজিকভাবে স্বয়ং নির্ভর এবং রাজনৈতিকভাবে খণ্ড-রাজ্য বা সার্বভৌম মর্যাদার অধিকারী ছিল। ঐতিহাসিক কারণে এসব অঞ্চলের নিজস্বতা এবং বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। অতএব ভারতবর্ষের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি রচনা করতে হয় তাহলে গবেষণা শুরু হতে হবে আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে। তাছাড়া এমন কিছু অঞ্চলও রয়েছে যা আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু কোন-না-কোন সময়ে এগুলো ভারতবর্ষের কোন-না-কোন অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং এই দেশের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায়

বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল। এসব অঞ্চলকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত গতি ও প্রকৃতি কখনও পরিস্ফুট হবে না। অতএব ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিত্তি হচ্ছে আঞ্চলিক ইতিহাস। এই ইতিহাসে প্রতিটি অঞ্চলকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং জাতীয় ইতিহাসে প্রতিটি অঞ্চলের অবদানকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু সমস্যাটি আসছে দুদিক থেকে। একটি হচ্ছে, জাতীয় মূলধারার দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা ভারতের ইতিহাসকে দেখছেন তাঁদের গবেষণায় কোন কোন অঞ্চলের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। আমরা যখন ভারতের ইতিহাস পড়ি তখন কিছু কিছু অঞ্চল বা রাজ্যের আদৌ কোন ইতিহাস আছে বলে মনে হয় না। অথচ একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখানে মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন—এর কোন ইতিহাস নেই সেটা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে, কোন কোন আঞ্চলিক গবেষক নিজেদের অঞ্চলের ইতিহাস এমনভাবে লিখেছেন যা পড়ে মনে হয়, সেই অঞ্চল এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল যে প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে সেখানকার মানুষের যোগাযোগ বা আদান-প্রদান মোটেই ছিল না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই দুই গোষ্ঠীর গবেষকরা উভয়েই চরমপন্থী এবং এরা নিশ্চিতভাবে জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির পরিপন্থী। কেননা প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের মধ্যে বিনিময়-ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই সত্য যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাসে যদি দেশের প্রতিটি অঞ্চল বা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের খুঁজে না পান তাহলে সেই ইতিহাস জাতীয় সংহতির সহায়ক হতে পারে না এবং একটি দেশের জাতীয় ইতিহাস হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না।

আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক অঞ্চল

আমরা যে আঞ্চলিক ইতিহাস বা অঞ্চলের কথা বলছি সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক এবং সামাজিক কাঠামো নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। যে প্রশ্নটি বার বার আসছে সেটি হচ্ছে, আমরা একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল কাকে বলব অথবা একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো কি হবে? সমস্যাটি আসছে এজন্য যে ভারতবর্ষে এ-মুহূর্তে পঁচিশটি রাজ্য, সাতটি কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল, পাঁচটি আঞ্চলিক উন্নয়ন-পর্ষদ এবং নয়টি রেল সংগঠন রয়েছে। ক্রিকেট খেলা হয় চারটি বা পাঁচটি অঞ্চলের ভিত্তিতে। আমার ধারণা ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা এই সমস্যাটি যথেষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেননি। বর্তমানে যে সব আঞ্চলিক ইতিহাস সংস্থা রয়েছে সেগুলো মূলতঃ এক একটি অঞ্চলের ঐতিহাসিকদের সংস্থা। সাংগঠনিক সুবিধার জন্যই এগুলো এক বা একাধিক রাজ্য নিয়ে তৈরী হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বিহারে বিহার ইতিহাস সংসদ পরিষদ, দক্ষিণ ভারতে একদিকে রয়েছে অন্ধ্র ইতিহাস কংগ্রেস, কেরল ইতিহাস কংগ্রেস ইত্যাদি আবার অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের সব কটি রাজ্য নিয়ে রয়েছে—দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য নিয়ে রয়েছে—উত্তর পূর্ব ভারত ইতিহাস সংস্থা। কিন্তু এসব রাজ্য বা প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্য নিয়ে যে ভৌগোলিক অঞ্চল, সেই অঞ্চল একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল নাও হতে পারে। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, বর্তমান ভারতের রাজ্যগুলো প্রশাসনের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ শাসনকালে তৈরী হয়েছিল। এতে কোন অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি। মোগল যুগের সুবা বা প্রাচীনকালের ভুক্তি বা বিষয়—এগুলোই ছিল প্রশাসনিক অঞ্চল। সেই অঞ্চলগুলোকে কোন মর্যাদাই দেননি ব্রিটিশ সরকার। একই ভাষাভাষী মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশকালীন বিভিন্ন রাজ্যে। শুধু তাই নয়, '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর কোন কোন জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে পড়েছেন দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে। যেমন পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী ভাষী অঞ্চল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, বাংলাভাষী অঞ্চল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। তেমনি নেপালী ভাষীরা

রয়েছেন ভারতে ও নেপালে। শুধু ভৌগোলিক প্রতিবেশী হিসেবে নয়, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল বা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কোন কোন অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তন একই সূত্রে গাঁথা ছিল। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাজ্যকে পুনর্গঠন করে নূতন নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এখনও ভাষার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অংশে অস্থিরতা ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যে সীমানা-বিরোধ বর্তমান, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী যথেষ্ট পুরনো, আসামকে ভেঙে কয়েকটি নূতন রাজ্যও হয়েছে; আসামের অবশিষ্ট দুটি পার্বত্য জেলা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে আন্দোলন চলছে। আসলে আমরা যাকে প্রদেশ বা রাজ্য বলছি, আজকের ভারতবর্ষে সেগুলো হচ্ছে এক একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থে এসব কৃত্রিম অঞ্চল তৈরী করেছিলেন। অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অঞ্চলের সঙ্গে এগুলোর কোন মিল নেই।

অতএব আমার প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে—ঐতিহাসিক অঞ্চল আমরা কাকে বলব? সম্ভবতঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর একটি ভূখণ্ডকেই ঐতিহাসিক অঞ্চল বলা যেতে পারে। মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা পর্বে দেখা গেছে ভ্রাম্যমাণ এক একটি জনগোষ্ঠী কালক্রমে স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য এক একটি অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই ভূখণ্ড বা অঞ্চলটি তাদের জীবনধারণের উপযোগী। সেই অঞ্চলের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের জীবিকা অর্থাৎ কৃষিকর্ম, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বুনিয়াদ তৈরী হয়েছিল। স্থায়ী বসতির জন্য গ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং কালক্রমে সমগ্র অঞ্চলটিকে নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন বা রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতার সুবাদে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সাংগঠনিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে এই সব প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষিক অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে এবং সেই অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে এক একটি জাতিসত্তাও গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালেও আগন্তুকেরা সেসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল সহাবস্থানের ফলে কালক্রমে তারাও আঞ্চলিক মূলধারায় সামিল হয়ে গিয়েছেন। পরম্পরাগত ভাবে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুসংহত ও স্বনির্ভর এরকম একটি ভূখণ্ডকেই ঐতিহাসিক অঞ্চল বলা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক অঞ্চলের এই পরিকাঠামো থেকেই আসছে আরও একটি সমস্যা। এই সমস্যাটি তৈরী হয়েছে '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য বা স্বয়ংশাসিত একটি অঞ্চল। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত যদি এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয় তাহলে অবশিষ্ট বঙ্গদেশ বা বাংলাভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কতটুকু পূর্ণাঙ্গ বা প্রকৃত হবে সেই সংশয় নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। একই সংশয় রয়েছে বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও। পশ্চিমবঙ্গ যেমন প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বৃহত্তর বঙ্গভাষী অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, বরাক উপত্যকার ইতিহাসও প্রায় একই। আমরা যে অবিভক্ত বা বৃহৎ বঙ্গের কথা বলছি সেই বঙ্গদেশকে আমরা দেখেছি দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ', নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালার ইতিহাস', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাঙালা দেশের ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থে। ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে সেই বাংলার তিনটি জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে জুড়ে দেয়া হয়েছিল আসামের সঙ্গে। এরপর ১৯০৫ সালে অবশিষ্ট বঙ্গদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করা হয়েছিল। সেই সময় আসামসহ শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে জুড়ে দেয়া

হয়েছিল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে। জাতিসত্তার ভিত্তিতে এর প্রতিবাদ হয়েছিল এবং প্রতিরোধ আন্দোলন তখনকার মত সফল হলেও পরবর্তীকালে ছোটনাগপুর চলে গেল বিহারে এবং শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াসহ আসাম আবার একটি প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। এখানেই শেষ নয়— '৪৭-এর দেশ বিভাজনের মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টের অধিকাংশ অঞ্চল চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। বঙ্গদেশ দুটি ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হল—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে সূচনা হল বঙ্গের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সমস্যা।

ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব গতিতে গড়ে ওঠা এই অঞ্চলটিকে আমরা যদি আজকের পরিকাঠামোর ভিত্তিতে খণ্ড-বিখণ্ড করে এর ইতিহাস নিয়ে গবেষণার চেষ্টা করি তাহলে সেই গবেষণা অনৈতিহাসিক, কৃত্রিম ও বিকলাঙ্গ ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। সেজন্যই বলছিলাম, বরাক উপত্যকার ইতিহাস একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আঞ্চলিক ইতিহাস হতে পারে কি না অথবা বরাক উপত্যকাকে একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে কি না সে নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আমি এই সমস্যাগুলোই শুধু উল্লেখ করলাম—এর পদ্ধতিগত সমাধান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খুঁজে বের করতে হবে এই প্রজন্মের গবেষকদের।

★ নিবন্ধটি উপাচার্য ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গবেষণা পরিষদ সদস্য ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুলিখিত।

অমলন্দু ভট্টাচার্য

বরাক উপত্যকায় আর্য ব্রাহ্মণ্য ভাবের সূচনা ঃ কয়েকটি অনালোচিত ও লোকায়ত তথ্যসূত্র

আসামের দক্ষিণতম প্রান্তে বরাক নদী বিধৌত কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা তিনটি নিয়ে গঠিত সাত হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সমতল উপত্যকা বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত। প্রাক স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত করিমগঞ্জ ছিল শ্রীহট্ট জেলার একটি মহকুমা; দেশ বিভাগের ফলে শ্রীহট্টের বাকী অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও করিমগঞ্জ আসামেই থেকে যায় এবং পার্বত্য উত্তর কাছাড়, করিমগঞ্জ, কাছাড় ও হাইলাকান্দি এই চারটি মহকুমা নিয়ে গড়ে উঠে কাছাড় জেলা। ১৯৫৩ খ্রীঃ উত্তর কাছাড় এবং ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ খ্রীঃ যথাক্রমে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মহকুমা জেলা স্তরে উন্নীত হবার পর সমতল জেলা তিনটি (কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি) বরাক উপত্যকা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

উত্তরে বড়াইল, পূর্বে মণিপুর, দক্ষিণে মিজোরামের পাহাড় শ্রেণী এই সমতল ভূ-ভাগকে উঁচু প্রাচীরের মত তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। উন্মুক্ত পশ্চিমদিকে রয়েছে বাংলাদেশের সমতল অঞ্চল। ফলে গাঙ্গেয় সমভূমির যে পূর্বমুখী বিৃতি ঘটেছে তা বিনা বাধায় বরাক উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই বিশেষ অবস্থানের জন্যই আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের যে পূর্বমুখী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা স্বাভাবিকভাবেই বরাক উপত্যকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> "উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান বা এর প্রাকৃতিক চরিত্র, আবহাওয়া বা জলবায়ু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই অঞ্চল বঙ্গভূমির স্বাভাবিক বিস্তার মাত্র। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের প্রতিবেশী অঞ্চলের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। উত্তর ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববদ্ধ হয়ে কাছাড়ে আসার পথে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কখনো প্রতিহত হচ্ছে না। দেই জন্যেই ভারত-আর্য গোষ্ঠীর মানুষেরা ওদের পূর্বমুখী অবাধ গতি অব্যাহত রেখে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বরাক সুরমা উপত্যকায়। কিছু এখানে এসে সেই যাত্রা থেমে গিয়েছিল প্রতিবেশী পর্বত মালার পাদদেশে। কারণ, লাঙ্গল প্রধার উত্তরাধিকারীদের কাছে পাহাড়ের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সম্ভবত পর্বতশ্রেণী তখনো ছিল ভারত-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। অতএব আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে পর্ববাসীদেরও সমতলে নেমে আসার প্রতি স্বভাবজাত অনীহা ছিল, কারণ বন্যা বিধ্বস্ত এই অঞ্চল ছিল জুম চাষের জন্য নিতান্ত অনুপযোগী।"[১]

তাম্রলিপি, মুদ্রা, সাহিত্যিক উপাদান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ইতিহাসবিদ্রা খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে বরাক উপত্যকার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে সমতল কাছাড়ে ত্রিপুরীবী রাজ্য গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনে (সপ্তম শতাব্দী) উল্লিখিত 'জয়তুঙ্গ বর্ষ' ও 'সুবৃন্দ বিষয়া' যথাক্রমে বর্তমান উত্তর কাছাড় জেলার জটিঙ্গা নদী উপত্যকা ও কাছাড় জেলার সুবন্ত চা বাগান। প্রাচীন মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এ অঞ্চল ছিল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত। ভাটেরাতি প্রাপ্ত একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মুটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় বরাক উপত্যকা ঐ সময় শ্রীহট্ট রাজ্যের অধীনে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকা ও সন্নিহিত অঞ্চলে গৌড়,

লাউড়, জয়ন্তীয়া ইত্যাদি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ১৫৬২ খ্রীঃ কোচ সেনাপতি চিলা রায় কাছাড়ের স্থানীয় রাজাকে পরাজিত করে কোচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর ভাই কমল নারায়ণকে কাছাড়ের শাসক নিযুক্ত করেন। চিল রায়ের মৃত্যুর পর কমল নারায়ণ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করে বরাক নদীর ডান তীরে খাসপুরে নূতন রাজধানী গড়ে তোলেন।

অন্যদিকে আহোম আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫৩৬ খ্রীঃ ডিমাসা রাজ্যের রাজধানী বর্তমান নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুর থেকে উত্তর কাছাড়ের মাইবঙে স্থানান্তরিত হয়। উল্লেখ্য যে, মহাভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজেদের হিড়িম্বার বংশধর বলে দাবী করার সুবাদে ডিমাসা বংশীয়রা হৈড়িম্ব বংশজ এবং ডিমাসা রাজ্য হেড়ম্ব রাজ্য নামেও পরিচিত। মাইবঙ-এ রাজধানী স্থাপিত হবার পর ডিমাসা রাজারা সমতল কাছাড়ে রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু করেন। শিলচর শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত জটিঙ্গা নদী তীরবর্তী বড়খলা গ্রামের মণিরামকে ডিমাসা রাজাদের তরফে সমতল কাছাড়ের জন্য প্রথম উজির নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ পত্রটির তারিখ ২৯শে ভাদ্র, ১৬৫৮ শক অর্থাৎ ১৭৩৬ খ্রীঃ।[২] খাসপুরের সর্বশেষ কোচ রাজা ভীমসিংহ ছিলেন অপুত্রক। তাঁর একমাত্র কন্যা কাঞ্চনীর সঙ্গে ডিমাসা রাজপরিবারের লক্ষ্মীচন্দ্রের বিবাহ হয় ১৭৪৫ খ্রীঃ। এই বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে ১৭৫০ খ্রীঃ ডিমাসা রাজ্যের রাজধানী মাইবঙ থেকে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। এরপর যে কজন রাজা রাজত্ব করেছেন তাঁরা কেউই কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কারণ আর্থিক সমস্যা, অন্তর্বিরোধ ইত্যাদির ফলে ডিমাসা রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্র (১৮১৩-১৮৩০) ১৮৩০ খ্রীঃ হরিটিকর দুর্গে আততায়ীদের হাতে নিহত হবার পর এই রাজবংশের কোন সর্বসম্মত উত্তরাধিকারী নেই—এই যুক্তিতে ইংরেজ রাজশক্তি ১৮৩২ খ্রীঃ কাছাড় অধিগ্রহণ করে।

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় বরাক উপত্যকার ইতিহাসের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর রয়েছে :

[অ] প্রাচীন পর্ব : সূচনা থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

[আ] মধ্য পর্ব : দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ১৮৩২ খ্রীঃ।

[ই] আধুনিক পর্ব : ১৮৩২ খ্রীঃ থেকে বর্তমান কাল।

মধ্য ও আধুনিক পর্বের তুলনায় বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রাচীন পর্বের উপাদান পর্যাপ্ত নয়। বর্তমান নিবন্ধে এ অঞ্চলের দৈনন্দিন জন-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উপাদানের সাহায্যে এই অনুমান প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে যে, বঙ্গদেশে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের সূচনালগ্নে বরাক উপত্যকাতেও আর্য সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়েছিল এবং ১৮৩২ খ্রীঃ ইংরেজ অধিগ্রহণের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের বিশেষতঃ বর্তমান কাছাড় জেলার দৈনন্দিন জীবন চর্যায় প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতিই অনুসৃত হয়েছে।

১. হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি ও হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি :

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' ও 'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি' ডিমাসা রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণের সময় জারী করা আইন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮-১৯৩৮) আসামের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত থাকাকালে[৩] হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি বিষয়ক একটি পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুঁথিটি তিনি পেয়েছিলেন সমতল

কাছাড়ে ডিমাসা রাজাদের প্রথম উজির মণিরামের বংশধর বড়খলা নিবাসী বিপিনচন্দ্র দেব লস্করের কাছে। গুরুত্ব বিবেচনা করে গৌহাটির বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভা পুঁথিটি প্রকাশে উদ্যোগী হন। সভার তরফে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য পুঁথিটি সম্পাদনা করে মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানোর পর ডিমাসা বুদ্ধিজীবী নন্দলাল বর্মণ দণ্ডবিধি বিষয়ক দ্বিতীয় আর একটি পুঁথি পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন। আলোচনার সুবিধার্থে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বড়খলার বিপিনচন্দ্র দেব লস্করের কাছ থেকে প্রাপ্ত পুঁথিটিকে 'ক' পুঁথি এবং নন্দলাল বর্মণ প্রেরিত পুঁথিটিকে 'খ' পুঁথি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর সম্পাদনায় দুটো পুঁথি একত্রে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' শিরোনামে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে গৌহাটির বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দণ্ডবিধির দুটো পুঁথিই খণ্ডিত;

'ক' পুঁথিটির ১৫টি পত্র পাওয়া গেছে; পত্র সংখ্যা ৮ থেকে ২২; উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।

'খ' পুঁথির প্রাপ্ত পত্র সংখ্যা ১১; পত্র সংখ্যা ১৬ থেকে ২৬।

'খ' পুঁথির পত্রগুলো আকারে বড়; প্রতি পত্রে প্রায় ৩০টি করে ছত্র, প্রতি ছত্রের গড় অক্ষর সংখ্যা ২৭। বিষয়বস্তু এক হলেও দণ্ডবিধির 'ক' এবং 'খ' পুঁথির মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। 'ক' পুঁথিতে প্রথমে সংস্কৃত অংশ-এরপর বঙ্গানুবাদ; 'খ' পুঁথিতে সংস্কৃত অংশ নেই, শুধুই বঙ্গানুবাদ। 'খ' পুঁথিতে সংস্কৃত অংশ না থাকলেও প্রত্যেক প্রকরণের সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে 'ভাষা' শব্দের ব্যবহার (যেমন : অথ বাক্ পারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা) দেখে রচনাংশটি যে অনুবাদ তা বোঝা যায়। দণ্ডবিধির পুঁথি দুটো আদি অন্তহীন—বিশেষতঃ শেষ পত্র না পাওয়ায় পুঁথি সম্পর্কিত কোন তথ্যই জানা যাচ্ছে না। কারণ প্রাচীন পুঁথির শেষ পত্রে সংশ্লিষ্ট পুঁথি সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান তথ্য, যেমন—পুঁথি সমাপনের তারিখ, লেখকের নাম, অনুলিপিকারের নাম, ধাম ইত্যাদি উল্লিখিত হত। পুঁথির এই অংশকে বলা হয় 'পুষ্পিকা' এবং যে কোন প্রাচীন পুঁথির ক্ষেত্রে 'পুষ্পিকা' অংশটি খুবই মূল্যবান। কিন্তু আলোচ্য দুটো পুঁথিরই 'পুষ্পিকা' অংশ হারিয়ে গেছে।

দণ্ডবিধি প্রকাশের কয়েক বছর পর বিপিনচন্দ্র দেবলস্কর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনটি প্রাচীন পুঁথি পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেন, পুঁথি তিনটি ছিল—হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি, দাসদাসীর সংজ্ঞা বিষয়ক পুঁথি এবং মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ প্রণীত 'রাসলীলামৃত'। পুঁথি তিনটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কাছাড় জেলার বিক্রমপুর গ্রাম নিবাসী হরগোবিন্দ সেন-এর কাছ থেকে। তৃতীয় পুঁথিটি শুধু খণ্ডিতই নয়, মাঝখানের কিছু কিছু পত্র না থাকাতে সংগতিহীন—তাই গুরুত্বপূর্ণ হলেও পদ্মনাথ ভট্টাচার্য পুঁথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি।[৪] প্রথম পুঁথি 'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি'র প্রথম থেকে ৩৪ সংখ্যক পত্র পাওয়া গেছে, শেষ পাতাটি মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত, ফলে 'পুষ্পিকা' অংশ নেই। দাসদাসীর সংজ্ঞা বিষয়ক তৃতীয় পুঁথিটি সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে—পত্র সংখ্যা দুই। 'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি' পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২৭ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।[৫] এরপর ঋণাদান বিধির পরিশিষ্ট অংশে দাসদাসী সংজ্ঞা বিষয়ক দ্বিতীয় পুঁথিটি সংযোজিত করে দুটি পুঁথি একত্রে 'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি' শিরোনামে প্রকাশ করেন হরগোবিন্দ সেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য।

দণ্ডবিধি ও ঋণাদান বিধির মূল পাঠ থেকে জানা যায়, গ্রন্থে ধৃত আইনের ধারা সমূহ মৌলিক নয়, 'বিবাদ দর্পণ' নামে একটি গ্রন্থের অনুসরণে আইনের ধারাগুলো রচিত হয়েছে। দণ্ডবিধির 'ক' পুঁথিতে আইনের ধারাগুলোকে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনায় বলা হয়েছে, "... এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে

জারী করিলেন। ‘‘ ‘খ’ পুঁথিতে এরকম কোন ভূমিকা বা কোন রাজার নামোল্লেখ নেই। ঋণাদান বিধিতেও অনুরূপ ভূমিকা রয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিবাদ নিষ্পত্তির “নিমিত্তে শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুনে” ঋণাদানবিধি জারী করা হয়েছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য পুঁথি দুটো সম্পাদনা করতে গিয়ে ‘বিবাদদর্পণ’ গ্রন্থের অনুসন্ধান করেছিলেন কিন্তু মূল গ্রন্থটির কোন সন্ধান তিনি পাননি। দণ্ডবিধির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

> “ ‘বিবাদদর্পণ’ নামক কোনও সংস্কৃত নিবন্ধ আছে কি না জানি না; দুই এক স্থলে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার তথ্য জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় এই ‘বিবাদদর্পণ’ গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়ের কাছাড়ের আইনেরই নাম। এমনও হইতে পারে যে, খ-পুঁথি খানি যে গ্রন্থের একাংশ, তাহারই নাম ‘বিবাদদর্পণ’ ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় খ-পুঁথিখানির অগ্রভাগ ও শেষভাগ উভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে, নচেৎ ইহার নাম জানা যাইত। আরও পরিতাপের বিষয় যে, ক-পুঁথিখানিরও নাম, গ্রন্থের অগ্রপশ্চাৎ উভয় ভাগই না থাকায়, জানা যাইতেছে না।।”[৬]

লক্ষ্যণীয় দিক হল, ঋণাদানবিধি ও দণ্ডবিধির উৎস হল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্র মনুস্মৃতি। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে উল্লিখিত ধারাসমূহের সঙ্গে ‘হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি’ ও ‘হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি’র সাদৃশ্য পরিশিষ্ট-ক অংশে প্রদর্শিত হল।

মনুস্মৃতির বিধি-নিষেধের সঙ্গে হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি ও ঋণাদানবিধির বিভিন্ন ধারার এই সাদৃশ্য আপাতঃদৃষ্টিতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। প্রাথমিকভাবে এই ধারণাই স্বাভাবিক যে মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র সমতল কাছাড়ের জন্য ১৭৩৮ শকে (১৮১৬ খ্রীঃ) ঋণাদানবিধি এবং ১৭৩৯ শকে (১৮১৭ খ্রীঃ) দণ্ডবিধি প্রণয়ন করবার সময় মনুস্মৃতিকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু দণ্ডবিধির খ-পুঁথিটি প্রাচীনতর এবং খ-পুঁথিতে এই আইন কে জারী করেছিলেন এ সম্পর্কিত কোন তথ্যই উল্লিখিত হয়নি। সংগ্রাহক নন্দলাল বর্মণের মতে খ-পুঁথিটি ডিমাসা রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণের (১৬৯৯-১৭০৮) সময় প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কোন রাজার আমলে আইনের ধারা প্রচলিত হলে ‘পুষ্পিকা’ অংশ ছাড়া অন্যত্রও সংশ্লিষ্ট রাজার নাম উল্লিখিত হত। ডিমাসা রাজসভায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোতে পুষ্পিকা অংশ ছাড়াও অন্যত্র পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম রয়েছে। মধ্যযুগীয় সভা সাহিত্যের এটাই ছিল রীতি। তাহলে দণ্ডবিধিতে ব্যতিক্রম হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের অনুমান হল, পূর্বঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হবার সময়কালে বরাক উপত্যকায় আর্য সংস্কৃতি গৃহীত হয়েছিল এবং ইংরেজ অধিকারের পূর্বকাল পর্যন্ত সেই রীতি-নীতির দ্বারাই বিশেষতঃ সমতল কাছাড়ের জনসাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। ডিমাসা রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ সমতল কাছাড়ে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত রীতিনীতিকে বিধিবদ্ধ করে স্থানীয় আইনকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মাত্র, নূতন করে তাঁর আমলে এসব আইন জারী করা হয়নি। রাজার নাম এবং রাজকীয় মোহরযুক্ত যে সব নিয়োগপত্র ইত্যাদি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো যে ডিমাসা রাজ্য শাসন প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হল এসব দলিলপত্রগুলো সেই বিশেষ রাজাই প্রথম জারী করেছিলেন না সমতল কাছাড়ে রাজ্য বিস্তারের পর প্রচলিত এসব স্থানীয় নিয়মকে স্বনামাঙ্কিত আদেশ পত্রে রাজারা অনুমোদন করেছিলেন অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় জারী করা নীতি-নিয়ম সংক্রান্ত আদেশ পত্রগুলো মৌলিক আদেশপত্র না অনুমোদন পত্র? কারণ সমতল কাছাড়ের সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্দের বক্তব্য হল, “রাজারা

সমতলের 'খেল' ভিত্তিক শাসন প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। খেল-মুক্তার ও রাজ-মুক্তারাই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা।"[৭] এ সম্পর্কে আমাদের অনুমান হল, এ সব রাজপত্র মৌলিক নয়, অনুমোদন পত্র। এই অনুমানের স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি হল, প্রথমতঃ সমতল কাছাড়ে ও পার্বতী কাছাড়ে সমাজ শাসনের কাঠামো ছিল আলাদা। বিশেষতঃ 'খেল' প্রথা একান্তভাবেই সমতল কাছাড়ে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ ডিমাসা রাজারা সমতল কাছাড়ে বিভিন্ন পদাধিকারীদের যেসব নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন সেগুলোর কয়েকটিতে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যাতে মনে হয় এখানে একটি আলাদা নিয়মের অস্তিত্ব ছিল। মহারাজা কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ (১৭৩৬-১৭৪৫) সমতল কাছাড়ের জন্য বড়খলার মণিরামকে যে নিয়োগপত্রটি দিয়েছিলেন, তার বয়ানটি এরকম "আর বড়খলার চান্দ লস্কর বেটা মণিরামরে আমি জানিআ কাছারির নিঅমে উজির পাতিলাম...।" এই বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি হিসেবে ডিমাসাদের সঙ্গে 'কাছাড়ী' শব্দটি যুক্ত হলেও ডিমাসা রাজা বা রাজবংশ কোথাও নিজেদের 'কাছাড়ী' বলে উল্লেখ করেননি বরং মহাভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজেদের 'হেড়ম্ব' বংশজ বলে আত্মপরিচিতি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় 'কাছারির নিয়ম' বলতে কাছাড়ে প্রচলিত নিয়মকেই বুঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ নিজেদের তরফে প্রথম উজির নিযুক্ত করতে গিয়ে কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ নিয়োগপত্রের সূচনায় কাছাড়ের নিয়মকে স্বীকৃতি জানিয়ে ঘোষণা করেছেন, কাছাড়ে প্রচলিত নিয়মেই মণিরামকে শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হল। এ থেকে এটা বোঝা যায় যে, সমতল কাছাড়ের একটা নিজস্ব নিয়ম ছিল যা ডিমাসা রাজারা অনুমোদন করেছিলেন। এই স্থানীয় নিয়মেরই বিবর্তিত রূপ দণ্ডবিধি ও ঋণাদানবিধি।

'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে দাসদাসী সংজ্ঞা বিষয়ক পুঁথিটি মুদ্রিত হয়েছে। পুঁথি প্রসঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য হল, "দ্বিতীয় পুঁথিখানি সম্পূর্ণই পাওয়া গিয়াছে, তবে ইহার পত্রসংখ্যা মাত্র ২। ইহা এতসহ পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইল।"[৮] কোন বিশেষ রাজার আমলে পুঁথিটি রচিত হলে রচয়িতা অবশ্যই সেই রাজার নাম উল্লেখ করতেন। এই ব্যতিক্রম থেকে এটা স্পষ্ট যে উক্ত পুঁথিটি কোন রাজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

এই পুঁথিতে পঞ্চদশ প্রকার দাসদাসীর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। "ইহাতে নূতন কথা যে কিছু নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। দাসদাসী পঞ্চদশ প্রকার—তাহা কেবল হেড়ম্বরাজ্যে নহে, আর্য্যভূমির সর্ব্বত্রই ছিল।"[৯] 'শব্দকল্পদ্রুমে' যে পঞ্চদশ প্রকার দাসের কথা আছে আলোচ্য পুঁথিতে সে কথাই বাংলায় লিখিত হয়েছে। অবশ্য মনুসংহিতায় সাতরকম দাসের কথা আছে।

ইংরেজ রাজকর্মচারীদের লিখিত চিঠিপত্র ও বিবরণীতে কাছাড়ে প্রচলিত দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। ক্যাপ্টেন ফিশার এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে সিলেট কাছাড় ও সন্নিহিত অঞ্চল সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন[১০] তাতে তিনি কাছাড়ে দাসপ্রথার উল্লেখ করে লিখেছিলেন, যদিও ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলে দাস চালান দেওয়া বন্ধ হয়েছে কিন্তু স্থানীয় ভাবে দাসপ্রথা রদ করা যায়নি।

দাসদাসী সংজ্ঞা বিষয়ক উক্ত পুঁথিতে দ্বিতীয় সংজ্ঞায় ক্রীতদাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "দ্বিতীয় ক্রীত অর্থাৎ পিতা ও মাতা মুনিবাদিতে মূল্যাদি দিয়া খরিদ করে।" কাছাড়ে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত এ ধরণের দাসের অস্তিত্ব ছিল। এখনও পর্যন্ত বাকী চতুর্দশবিধ দাসের অস্তিত্ব সম্পর্কিত কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ আমরা পাইনি সত্য কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে এ ধরণের তথ্যাপাতির জন্য সে রকম কোন অনুসন্ধানও হয়নি।

পুঁথিটি শেষ হবার পর ত্রুটিপূর্ণ ভাষায় একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য হল,

"এ শ্লোকটি হঠাৎ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া লেখক মহাশয় নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান মাত্র করিয়াছেন। ইহা মনুর—

স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রীয়ঃ কুর্যু দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ।।

এই বচনের (৮/৬৮) অশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া বোধ হইতেছে।।"[১১]

শ্লোকটির শুদ্ধাশুদ্ধ বা প্রাসঙ্গিকতা আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বক্তব্য হল এই শ্লোকটির ব্যবহার স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে মনুস্মৃতির গভীর সংযোগের ইঙ্গিতবাহী। দাসদাসীর সংজ্ঞা নির্ণয়ে আর্য আদর্শকে গ্রহণ করাও কাছাড়ে আর্য প্রভাবের সূচক।

২. খেল প্রথা :

ইংরেজ অধিগ্রহণের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত সমতল কাছাড়ে গ্রাম শাসনের একটি নিজস্ব নিয়ম ছিল।

> "They had a constitution of their own, based on a revenue system now peculiar to Cachar, which is perhaps a vestige of the once great Cachari kingdom. The fundamental principle of this system was the holding of land by a number of persons connected by voluntary association. The unit of the system was the Khel."[১২]

ইতিহাসবিদ W. W. Hunter 'খেল' প্রথাকে ডিমাসা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বললেও এ সম্পর্কে তিনি যে নিঃসংশয় নন তা 'perhaps' শব্দ ব্যবহারেই স্পষ্ট। 'খেল' প্রথার বৈশিষ্ট্য ছিল ;

> "The fundamental principle of the system was the holding of land in guild by a number of persons by voluntary association. 'Just as in the Hindu communities the village forms the basis of the agricultural commonwealth, which is bound together theoriticaly, by the ties of kindred in caste, so Khel formed the unit of the agricultural community of Cachar, but its members were not connected by any ties of kindred, caste, nationality or creed...' The constituent members were obliged to pay collective revenue and to discharge services including the supply of labour for state enterprise. Such payment or supply were made through a Mukhtar elected by the members and confirmed by Raja. He was generally the leading personality in the corporation and responsible to the Raja for the dues of the unit. Obviously, this officer was the Liaison between the Raja and the Khel. He carried into execution all orders of the Government in respect

of his Khel, took charge of the abandoned taluks and collected the state revenue, and, in return, held rent-free grants, enjoyed honorary titles and had the authority to confine and punish defaulters. In course of time, as the number of Khels increased, adjacent Khels were grouped together into larger unions, called Raj or Pargana. The Mukhtars of the constituent Khels elected a Raj Mukhtar, with various titles like Choudhury, Mazumdar, Bara Laskar, Barabhuiya, Majar Bhuiya, Choto Bhuiya etc. all according to the status and importance of the unit.... The members of the Khel paid their portion of the revenue of the Khel-Mukhtar while the latter paid the total dues of his Khel to the Raj-Mukhtar who in his turn deposited the entire collection to the Royal Treasury."[১৩]

অর্থাৎ সমতল কাছাড়ের কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রমণ্ডলের নিম্নতম একক ছিল খেল। 'খেল'-এর সদস্যরা শাসনতান্ত্রিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ছিল যৌথ। 'খেল'-এর সদস্যরা রাজস্ব এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে 'খেল' প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। 'খেল' প্রধানের দায়বদ্ধতা ছিল 'রাজ' প্রধানের কাছে। লক্ষ্যণীয় যে, একই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর কথা রয়েছে মনুস্মৃতিতেও :

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রাম পতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ।।
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদগ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে।।
বিংশতীশস্তু তং সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদগ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্।। (৭/১১৫-১১৭)

[অনুবাদ :—প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশ গ্রামের একজন, বিংশতি গ্রামের একজন, শত গ্রামের একজন এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি রাজা নিযুক্ত করিবেন।। গ্রামে চৌর্যাদি কোন প্রকার দোষ সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধান করিতে অসমর্থ হইলে দশ গ্রামাধিপের নিকট তাহা আবেদন করিবেন এবং তিনিও যদি তৎপ্রতিকারে সমর্থ না হন, তবে বিংশতি গ্রামাধিপের নিকট জানাইবেন।। এইরূপ বিংশতি গ্রামাধিপ শতাধিপকে এবং শতাধিপ সহস্রাধিপকে জানাইবেন।।]

মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত 'গ্রামাধিপ'-এর কার্যপ্রণালীর সঙ্গে 'খেল মোক্তার'-এর শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার সাদৃশ্য রয়েছে :

"The duties of a গ্রামিক are to detect such crimes as robbery and theft and to deal with the culprits. In case he is not competent to take adequate steps, it is his duty to report to the higher authorities i.e. দশগ্রামাধিপতি who may advise him on the matter." [১৪]

খাজনা আদায়ের ব্যাপারেও 'গ্রামিক' রাজার কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন।

"The mode of payment would be such that the king should not directly collect those articles but the heads of villages i.e. গ্রামিক, দশগ্রামাধিপতি, বিংশগ্রামাধিপতি etc. would get them as the means of their livelihood." [১৫]

নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী খাজনা হিসেবে দেবার কথা বলেছেন মনু।

যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ।। (৭/১১৮)

[অনুবাদ : গ্রাম্য লোকেরা অন্নপানীয় এবং ইন্ধনাদি যে কোন বস্তু প্রতিদিন রাজাকে দান করিবে, তৎসমস্ত গ্রামাধিপতির প্রাপ্য।]

কাছাড়েও নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী খাজনা হিসেবে প্রদত্ত হত।

"... রাজস্বের পরিমাণ যৎসামান্য ছিল। একটি পাঁঠা, একটি হাঁস, একজোড়া কুকুটি এবং দুইটি করিয়া নারিকেল প্রত্যেক বন্দোবস্ত হইতে রাজস্ব স্বরূপ রাজ সরকারে প্রদান করা হইত।"[১৬]

স্থানীয় 'খেলমোক্তার' বা 'রাজমোক্তাররা' যেমন নিষ্কর জমি ভোগ করতেন 'গ্রামিক' ও তদূর্ধ্ব প্রতিনিধিদের জন্য নিষ্কর ভূমির কথা বলেছেন মনু ঃ

দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্।। (৭/১১৯)

[অনুবাদ : কুল অর্থাৎ ষড়গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমি দশগ্রামাধিপের বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্য। বিংশতি গ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ ভূমি, শতাধিপের একখানি গ্রাম এবং সহস্রাধিপের একটি নগর প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও একই ধরণের গ্রাম শাসন প্রণালীর কথা আছে।

"The village administration was carried under the supervision of the village headman, who appears to have wielded sufficient powers and had a varieties of functions to perform. According to Kautilya, he was the officer-in-charge of the militia and watch and ward. Besides this, he had to collect the government revenue; to maintain village records, to preside over the village council and to supervise the working of the various activities of the

village life. The villagers used to organise work of public utility and recreation, settle the village disputes amongst themselves, and act as trustees of the properties of the minors....

The two important officers associated with village administration were the Sthanikas and the Gopas and it seems that there was an intermediate level of administration between the district level and the village level. The Gopa had multivarious duties (mainly relating to accounts) including the maintenance of all kinds of village records, mentioned above. The tax, collected from a village, was transmitted to the Sthanikas who worked directly under the Pradeshikas. Together with Gopas, the Sthanikas were subjected to periodic inspection by revenue and other officers. The village officials were responsible to the Gopas, who, in turn, were responsible to the Sthanikas. The village headman was elected from the village elders. Village discipline and defence were his primary concern. In smaller village, he was possibly the lone functionary. Officers of the central government were paid by the state in form of land etc. There was a chain of officers from the Samaharta to the Gopas. The relation between the centre and the rural administration was maintained through these officials. Each village formed a close corporation invested with large powers and wide responsibilities. The king was bound to respect the local usage.[১৭]

প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় গ্রামই ছিল ক্ষুদ্রতম একক। গ্রামীণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

"রাষ্ট্র বা জনপদকে কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত করা হইত। প্রত্যেক গ্রামে এক একজন অধিপতিদের পরিচালক রূপে এক একজন কর্মচারীকে নিয়োগ করা উচিত, মহাভারতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিয়োগে রাষ্ট্ররক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সকল বিষয়েই প্রজাদের মতামত গ্রহণ করা হইত। বিচারবুদ্ধি বা চরিত্রবলে যাঁহারা গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন তাঁহারাই প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করিতেন। ইহারা 'গণমুখ্য' আখ্যায় বিভূষিত হইতেন এবং রাজসভায় বিশেষ সম্মান পাইতেন। তাঁহাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিত। জনসাধারণের হিতকামনায় গণমুখ্যদের মতামত রাজার নিতান্ত প্রয়োজন। ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ হইলে রাজাই মীমাংসার দ্বারা সমাধান করিতেন। ...মহাভারতে আবার এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক গ্রামে এক একটি করিয়া অধিপতি থাকিতেন। আবার

দশটি গ্রামের অধিপতিদের ঠিকপথে পরিচালিত করার জন্য দশগ্রামাধিপ নিয়োগ করা হইত। তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে কুড়িটি গ্রামের আধিপত্য সমর্পণ করিবার নিয়ম ছিল। তদপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তির হস্তে শত এবং এইরূপে সহস্র গ্রামের আধিপত্য অর্পণ করার নিদর্শন পাওয়া যায়। অধিপতিগণের কর্মপদ্ধতি বিষয়ে মহাভারতের উক্তিটি লক্ষ্যণীয়, গ্রামের শৃঙ্খলা বিধানার্থে অক্ষম হইলে উত্তরোত্তর অধিপতিদের জানানোর বিধি ছিল। ক্রমিকতার মাধ্যমেই রাজদরবারে পেশ করার রীতি ছিল; লঙ্ঘনের কোন উপায় ছিল না।।"[১৮]

সমতল কাছাড়ের 'খেল' প্রথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম-শাসনের উপরোক্ত সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম অনুমানই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে, 'খেল' প্রথা আলাদা কোন ব্যাপার নয়। কর্ষণজীবী সভ্যতার সূচনাকালে কাছাড়ে যে গ্রামীণ শাসন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তাই ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। কারণ প্রথমতঃ বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আদি ও মধ্যপর্বে সমতল কাছাড়ের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। দ্বিতীয়তঃ গ্রাম প্রধানের দ্বারা শাসিত গ্রামগুলো ছিল অনেকটা স্বশাসিত এককের মত। কেন্দ্রীয় স্তরে পট পরিবর্তন ঘটলেও গ্রাম শাসনে এর কোন প্রভাব পড়ত না। এ সম্পর্কে ১৮৩২ খ্রীঃ হাউস অব কমন্সে স্যার চার্লস মেটকাফের সাক্ষ্যটি উল্লেখযোগ্য :

"The Indian village communities are little republics, having nearly everything they canwant within themselves, and almost independent of any foreign relations. They seems to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down; revolution succeeds to revolution ..... but the village community remains the same."[১৯]

সমতল কাছাড়ে 'খেল' প্রধান ছাড়াও নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক আর এক ধরণের শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধি ছিলেন যাদের পরিচিতি ছিল 'দেশমুখ্য'। 'দেশমুখ্য'রা নিজ নিজ এলাকায় বিবাদ বিসংবাদের বিচার করতেন, সামাজিক বিচ্যুতির জন্য দোষীদের শাস্তিবিধান করতেন; অবশ্য বিচারকার্য বা শাস্তিদানের ক্ষেত্রে 'দেশমুখ্য'দের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। লক্ষ্যণীয় যে 'গ্রামিক', 'দশগ্রামাধিপ' ইত্যাদি ছাড়াও আর এক ধরণের প্রশাসকের কথা বলেছেন মনু ঃ

নগরে নগরে চৈকং কুর্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্।।
স তাননু পরিক্রামেন্ সর্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ।। (৭/১২১,১২২)

[অনুবাদ : প্রত্যেক নগরের কার্য্য তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রধান উচ্চবংশে সম্ভূত, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধাবনে সমর্থ নক্ষত্র মধ্যে ভার্গবাদি গ্রহ সদৃশ ভয়ঙ্কর তেজস্বী, অতিশূদ্র এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা রাজার কর্তব্য। এই নগরাধ্যক্ষের কর্তব্য—পূর্ব নিয়োজিত গ্রামাধিপতিগণের কার্যসকল সময়ে সময়ে স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়োজিতচর দ্বারা তাহাদের চেষ্টিত বিষয় সকল বিশেষরূপে অবগত হওয়া।]

'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'দেশমুখ্যের' নিয়োগপত্রের অংশ বিশেষের যে পাঠ মুদ্রিত হয়েছে[২০] এতে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, 'দেশমুখ্য' পদটি ডিমাসা রাজাদের সৃষ্টি। কিন্তু নিয়োগ পত্রটির সূচনা অংশে বলা হয়েছে,

> "বৈছমে শ্রীসোনারাম শম্মা সাকিন পরগণা উধারবন্দ মোতালকে হৈড়ম্ব প্রতি বেদানন্দ আগে—তোমাকে তোমার সাবেক মৌরসী পরগণা উধারবন্দ বম জীবে তপছিল মৌজা জাতের দেশমুখ্য কর্ম্মে মকরর করা গেল।"[২১]

'সাবেক' অর্থাৎ পূর্বতন আর 'মৌরসী' (মূল আরবী শব্দ 'মৌরুসী') শব্দের অর্থ পুরুষানুক্রমে ভোগদখলী বা পৈতৃক। অর্থাৎ 'সন ১২৩১ সালে বাঙ্গালা'তে (১৮২৪ খ্রীঃ) মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগপত্র দিয়ে বলছেন, সোনারামকে তাঁর পূর্বতন পুরুষানুক্রমে ভোগদখলীকৃত পরগণাতেই 'দেশমুখ্য' নিযুক্ত করা হল। রাজকীয় মোহরযুক্ত দলিলটির মূল পাঠ অনুযায়ী একটা বিষয় স্পষ্ট, সোনারাম বংশানুক্রমে 'দেশমুখ্য' ছিলেন; মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁর আমলে একটি নিয়োগপত্র দিয়ে সোনারামের ভোগদখলের পুরুষানুক্রমিক অধিকারটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন মাত্র। অতএব এই ধারণা করা যেতেই পারে যে, 'দেশমুখ্য' পদটি ডিমাসা রাজাদের সৃষ্টি নয়, সমতল কাছাড়ের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় 'দেশমুখ্য'রা আগে থেকেই ছিলেন। সম্ভবতঃ 'গণমুখ্য' পদটিই পরবর্তীকালে 'দেশমুখ্য' হয়েছে। 'গণ' শব্দটি 'দেশ' অর্থে শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাকে 'খেল' প্রথার উৎস বলে চিহ্নিত করতে হলে 'খেল' শব্দটির শিকড় অনুসন্ধান প্রয়োজন। মনে হয় 'খিল' থেকে 'খেল' কথাটি এসেছে। 'খিল' শব্দের অর্থ আচষা বা অকৃস্ট ভূমি। সাধারণতঃ আচষা ভূমিই চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়। 'খিল' ভূমি বন্দোবস্ত প্রথাই হয়ত পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তনে 'খেল' প্রথা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য একাডেমি সংস্করণ) অনাবাদি জমি অর্থে 'খিল ভূমি' কথার ব্যবহার আছে ঃ সরকার হইল কাল **খিল ভূমি** লিখে নাল বিনি উবগারে খায় ধুতি। (পৃঃ ৩)

৩. ভূমি পরিমাপ ঃ

কোন অঞ্চলের ভূমি পরিমাপ সংক্রান্ত এককের মধ্যে সেই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাছাড়ে ভূমি পরিমাপের নিজস্ব একক প্রচলিত ছিল। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পরিমিতি সার' নামক একটি বই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হরকিশোর চক্রবর্তী 'পরিমিতিসার'-এর উপযোগিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

> "সুরমা উপত্যকায় নবাবী আমল হইতে হাল ও কেদারের মাপে জমি পরিমাপ করা হয়, কিন্তু এই উপত্যকায় বহুল পরিমাণে ইউরোপীয় বণিকগণ কর্তৃক চা বাগানের জন্য জমি বন্দোবস্ত গৃহীত হওয়ায় একর, রোড্ ও পোলের্ মাপে জমি পরিমাপের এবং বর্তমান গভর্ণমেন্ট বন্দোবস্তে বিঘা কাঠার মাপের প্রচলন হওয়ায় এই সকল মাপের একটির সহিত অন্যটির সামঞ্জস্য বা একটিতে অন্যটিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন সর্ব্বদাই পড়িতেছে।"[২২]

এই মন্তব্যে 'নবাবী আমল' বলতে কোন্ নবাবের আমলকে বোঝানো হয়েছে, তা অস্পষ্ট। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, চা বাগান পত্তনের পর থেকেই কাছাড়ে সরকারি পর্যায়ে বিঘা-কাঠার

মাপ এসেছে। তা সত্ত্বেও এখনও লোকসমাজে হাল, কেদার বা কিয়ারের মাপই প্রচলিত। কাছাড়ে ১৬ হাত দীর্ঘ নল দিয়ে জমি জরিপ করা হয়। ঐ নলের ১৬ ভাগের এক ভাগে ১ হাত হয়। ১ হাতের পরিমাণ প্রায় পৌণে উনিশ ইঞ্চি। জমির পরিমাপ সংক্রান্ত স্থানীয় আর্য্যাগুলোতে কাছাড়ের ভূমি পরিমাপের এই স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ঃ

[ক] কাছাড়ে কেদার কর, তিল পরিমাণ।
৩৬৯ ভাগে তারে হাত ধরি আন।।
হাত হতে বিঘা কাঠা, একরাদি হয়।
আর্য্যামত কাজ কর নাহিক সংশয়।।

[খ] কাছাড়ের তিলমান মৌলিক ধরিবে।
তার কত তিল অন্য কালিতে ধরিবে।।
৮০০ তিলে বর্গপণ কাছাড় জেলায়।
তার ৩৬৯ তিলে বর্গহাত, একর বিঘায়।।

এরকম আর্য্যা আরও আছে। তিলকে ক্ষুদ্রতম একক ধরে কাছাড়ে কেদার-কালির হিসাবের ক্রম এরকম ঃ

২০ তিলে ১ কাগ
৪ কাগে ১ কড়া
৪ কড়ায় ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায় ১ পণ
৪ পণে ১ রেখ
৪ রেখ বা
১৬ পণে ১ জষ্টি
৭ জষ্টিতে ১ পোওয়া
৪ পোওয়াতে ১ কেদার
৩ কেদারে ১ চৌক
৪ চৌক বা
১২ কেদারে ১ হাল

বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত হালের সমার্থক আর একটি শব্দ প্রচলিত ছিল 'কুলবা'।

কাছাড়ের ভূমি পরিমাপ সংক্রান্ত এসব পরিভাষার অন্ততঃ তিনটি 'কেদার' 'হল' এবং 'কুল' মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে। তবে জমির মাপের মধ্যে তারতম্য আছে। 'কেদার' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে নিম্নোক্ত শ্লোকে ঃ

ভূমাপেক্যৈক কেদারে কালোৎপানি কৃষীবলৈঃ।
নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ।। (৯/৩৮)

ডঃ মুরারীমোহন সেনশাস্ত্রী এই শ্লোকের 'কেদার' শব্দটির অর্থ করেছেন 'ক্ষেত্র'।[২৩] অন্যদিকে V.S. Agrawala এই শ্লোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মন্তব্য করেছেন, 'Fields were divided into compartments called kedaras'। ২৪ 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' 'কেদার' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ উল্লিখিত হয়েছে,—'জল হইতে বা জল দ্বারা যাহার বিদারণ', 'ক্ষেত্র', 'খেত',

'ক্ষেত্রস্থ জলাশয় বিশেষ', 'জলমগ্ন ক্ষেত্র' ইত্যাদি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'কেদার' শব্দের অর্থ হল,—'সীমা চিহ্নিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড', 'ক্ষেত্র', 'জমি', 'কৃষিক্ষেত্র' ইত্যাদি। অর্থ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গেই 'কেদার' শব্দটি সংশ্লিষ্ট। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে 'কেদার' শব্দটি বিশেষ ভূমি পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'হল' এবং 'কুল' সুনির্দিষ্টভাবেই ভূমি পরিমাপের একক হিসেবে মনুস্মৃতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামাঝিপতিদের প্রাপ্য সম্পর্কে মনু বলেছেন ঃ

দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্।। (৭/১১৯)

[অনুবাদ : দশ গ্রামাঝিপতি 'কুল' পরিমাণ ভূমি (ছয়টি গরুর সমাবেশ এক 'হল', সেইরূপ দুই 'হল' মিলিত হইয়া যে পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিতে পারে তাহাকে 'কুল' কহে), বিংশতি গ্রামাঝিপতি পঞ্চ কুল পরিমিত ভূমি, শতগ্রামপতি একটি সম্পূর্ণ গ্রাম এবং সহস্রগ্রামপতি 'পুর' ভোগ করিবেন। —(অশোকনাথ শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদ)]

মনুস্মৃতিতে 'হল' এবং 'কুল' আলাদা আলাদা একক। কিন্তু উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী কাছাড়ে 'হল' এবং 'কুলবা' শব্দ দুটি সমার্থক। ডিমাসা রাজত্বকালে কাছাড়ের ভূমি রাজস্ব প্রসঙ্গে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ লিখেছেন,

"প্রতি 'কুলবায়' বা 'হালে' ১২ কাহন কড়ি রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। প্রতি টাকায় ৫ হইতে ৭ কাহন পর্যন্ত কড়ি পাওয়া যাইত।

"একটী গরু দিয়া যে পরিমাণ ভূমি চাষ হয় তাহা হাল বা কুলবা নামে নির্দিষ্ট হইত। এক হাল ভূমি ১৪ বিঘা অথবা ৪.৮২ একরের সমান। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী ১$^{১}/_{২}$ কেদার ও ক্ষেত্র ১০$^{১}/_{২}$ কেদার ভূমিতে অবস্থিত।"[২৫]

ভূমি পরিমাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'কুলবা' এককটি বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষে গুপ্তযুগে ভূমি পরিমাপে ব্যবহৃত এককগুলো ছিল 'পাটক', 'কুল্যাবাপ', 'দ্রোণবাপ', এবং 'আঢ়বাপ'। এর মধ্যে গুপ্তযুগে 'কুল্যাবাপ' এককটি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার 'কুল্যাবাপ' একক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন, ১২৭$^{৩}/_{৪}$ থেকে ১৬ মণ ধান্যবীজ যে পরিমাণ জমিতে বপন বা রোপন করা যেত, সেই পরিমাণ জমির নাম ছিল 'কুল্যাবাপ'।[২৬] কাছাড়ে প্রচলিত 'কুলবা' বা 'কুলবায়' সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

"বাংলায় দোন এবং আঢ়া অর্থাৎ প্রাচীন দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপ বা আঢ়বাপের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কুল্যাবাপের মত কোনও ভূমি মাপের নাম পাইনি। কিন্তু কাছাড়ে প্রচলিত 'কুলবায়' সংখ্যক যে ভূমি পরিমাণের কথা শোনা যায়, সেটি প্রাচীন কুল্যাবাপ নামটির অপভ্রংশ হতে পারে। কাছাড়ে ১৪ বিঘা জমিতে এক কুলবায় হয়। কিন্তু গুপ্তযুগের কুল্যাবাপ এর চেয়ে অনেক বড় ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।"[২৭]

কাছাড়ে 'নল' দিয়ে ভূমি পরিমাপের যে রীতি প্রচলিত আছে তাও আর্য ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর ইত্যাদির ভূমি পরিমাপ করতে গিয়ে ৮ হাত দীর্ঘ 'দণ্ড' বা 'নল' ব্যবহৃত হত।[২৮] ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের 'ভূমি পরিমাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ Pargiter ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসন সম্পাদনা করতে গিয়ে 'কুল্যাবাপ' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধান্ত করেছিলেন এক নলের দৈর্ঘ্য ১৬ হাত এবং এক হাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯ ইঞ্চি। Pargiter এর এই সিদ্ধান্ত তকতীত নয়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি।[২৯] এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দিক হল কাছাড়ে ১৬ হাত দীর্ঘ 'নল' দিয়ে ভূমি পরিমাপ করা হয় এবং এক হাত প্রায় পৌণে উনিশ ইঞ্চি।

যে কোন অঞ্চলে সুদৃঢ় কৃষি অর্থনীতি এবং স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠলেই জমির মাপ-জোখের প্রশ্নটি আসে। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ভূমি পরিমাপের আয়তনগত দিক থেকে কাছাড়ে প্রচলিত এককের সঙ্গে না মিললেও পরিভাষাগুলো এক—এই সাদৃশ্য অন্ততঃ এরকমই ইঙ্গিত দেয় যে, গুপ্তযুগ বা তারও পূর্ববর্তীকালে কাছাড়ে একটি সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল এবং তৎকাল প্রচলিত ভূমি পরিমাপের এককেই তখন জমির হিসেব নিকেশ হত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একক সমূহের আয়তনগত তারতম্য হলেও পরিভাষা বদলায়নি। কারণ ভূমি পত্তনী ব্যবস্থার পরবর্তী পরিবর্তনগুলো এখানে এসে পৌঁছায়নি।

৪. প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাস ঃ

কোন বিশেষ অঞ্চলের জনবসতির প্রাচীনতা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারগুলিও একটি উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। সংস্কার বিশ্বাসের উদ্ভব ঠিক কবে হয়েছে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যেতে পারে, প্রাগৈতিহাসিক স্তর থেকে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় শুভাশুভের যে ধারণা গড়ে উঠেছিল—তাই পরবর্তীকালে সংস্কার বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ্ Christina Hole এর মন্তব্য হল, 'Superstitions are the living relics of ways of thought much older than our own ....'[৩০] লোকায়ত জীবনে এখনও প্রচলিত কিছু কিছু সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্ বেদে। ঋক্বেদের দশম মণ্ডলে গভদর্ভক্ষর মন্ত্র (১৬২ নং সূক্ত), দুঃস্বপ্ন বা অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র (১৬৪ নং সূক্ত), পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্র (১৬৫ নং সূক্ত) ইত্যাদির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বৈদিক যুগের লোকায়ত সমাজেও সংস্কারের শিকড় কত গভীরে প্রোথিত ছিল। এ জাতীয় সংস্কারের পর্যাপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে; কারণ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবনের দৈনন্দিন জীবন চর্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হয়েছিল। বরাক উপত্যকায় বঙ্গীয় হিন্দু লোকায়ত সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস সংস্কারগুলো আলোচনা করলে দেখা যায়, আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সব সংস্কার বিশ্বাস লোকায়ত অভিধায় ভূষিত এগুলোর বড় অংশই মনুস্মৃতি কথিত বিধি নিষেধের অনুরূপ। এরকম কিছু সাদৃশ্য পরিশিষ্ট-খ অংশে উল্লিখিত হল। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হবার সময় লোকায়ত স্তরে তৎকাল প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসই স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু কিছু বিধিনিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত করে লোক সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় মনুস্মৃতির সঙ্গে বরাক উপত্যকার সংস্কার বিশ্বাসের সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুরকম ধারণা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সংস্কার বিশ্বাসগুলো লোকায়ত স্তর থেকে মনুসংহিতায় গৃহীত হয়েছিল অথবা মনুস্মৃতি থেকে লোকায়ত স্তরে এসেছিল। যে

ভাবেই হোক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দৈনন্দিন অনুসরণীয় এসব সংস্কার বিশ্বাস একদিকে যেমন বরাক উপত্যকায় আর্য প্রভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন হিসেবে বিদ্যমান অন্যদিকে তেমনি বঙ্গীয় জনবসতির প্রাচীনতার দ্যোতক।

৫. ভুবন পাঁচালী বা ধনুকধারীর পাঁচালী ঃ

বর্তমান কাছাড় জেলার দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় মিজোরামের সীমানা থেকে বরাক নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের নাম ভুবন পাহাড়। সেই পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে সুপ্রাচীন কিছু ভাস্কর্যের নিদর্শন। সেই চূড়াটি ভুবনতীর্থ নামে বিখ্যাত। বিভিন্ন সময়, বিশেষতঃ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের প্রতিবেদনে ভুবনতীর্থের কথা উল্লিখিত হলেও ভুবন তীর্থ সম্পর্কিত প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীঃ।[৩১] উল্লেখ্য যে প্রকাশিত অংশটি মূল প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার। পরবর্তী সময়েও ভুবনতীর্থ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং এই তীর্থস্থানের প্রাচীনতা এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষণীয় দিক হল ভুবনতীর্থ সম্পর্কিত একটি পাঁচালী প্রচলিত রয়েছে। 'ভুবন পাঁচালী' বা 'ধনুকধারীর পাঁচালী' নামে পরিচিত এই প্রাচীন পাঁচালীটি বরাক উপত্যকায় আর্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

মুদ্রিত এই পাঁচালীটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। ৫ থেকে ৪০ পৃষ্ঠা বর্তমান। প্রাপ্ত অংশে প্রথমে আছে 'সর্বদেব বন্দনা'। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পাঁচালীটিকে পুরাণ ইত্যাদির সমতুল্য বলা হয়েছে ঃ

"সর্ব্ব-সূচী বেদব্যাস পদে নমস্কার।
জয় পাঠে গ্রন্থারম্ভ মঙ্গল আচার।।

পাঁচালীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন নারদ, 'কহিল নারদ যাহা অপরে কীর্ত্তন।' তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল দক্ষিণ আসামে 'বৃহন্নারদীয় পুরাণের' প্রভূত জনপ্রিয়তা ছিল। ডিমাসা রাজসভায় মহারাজা সুরদর্প নারায়ণের রাজত্বকালে ১৭০৮ থেকে ১৭২০ খ্রীঃ মধ্যে ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য বাচস্পতি বৃহন্নারদীয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজসভাতেও পুরাণটি অনূদিত হয়েছিল।[৩২] বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রবক্তাও নারদ। এই নারদ-প্রাধান্য বিষয়টি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

বন্দনার পর 'গ্রন্থারম্ভ' অংশে ভুবন পাহাড়ে দেবসভার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। সূচনাতেই আছে ভুবনতীর্থের বর্ণনা ঃ

"ভুবন আশ্রম আছে গহন কাননে।
ভুবন পাহাড় নাম বলে সর্ব্বজনে।।
সূর্য্য চন্দ্র দেবগণ একত্র উদয়।
কত যে তাহার শোভা কে করে নির্ণয়।।

এই দেবসভায় এসে নারদ নরলোক সম্পর্কে তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানালেন ঃ

"ভিক্ষা হেতু যাই আমি নগরে নগরে।
ভিক্ষা নাহি মিলে ঐ নরনারীর ঘরে।।

চতুর্দিকে উঠিয়াছে মহা হাহাকার।
হায় অন্ন হায় অন্ন বলে সারা দুনিয়ায়।।"

যেহেতু 'অন্ন' নেই, তাই 'ফলমূল খেয়ে জীব আছে অনাহারে'। মানুষকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে নারদ শিবকে সেখানে নিয়ে আসার জন্য পঞ্চবটি বনে রওনা হলেন, কারণ শিবই সর্বজীবের আহার দিচ্ছেন,—

'সর্ব্বজীবের আহার শিবে দিচ্ছে দুনিয়ায়।
বৃক্ষ মাঝে পোকা থেকে সেও খেতে পায়।।'

পঞ্চবটি বনে শিব অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাল যাপন করছেন। নারদ যখন সেখানে উপস্থিত হলেন বৃষারূঢ় পঞ্চাননের সঙ্গে তাঁর 'অর্ধপথে' দেখা হল। কুশল বিনিময়ের পর নারদ তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে শিবকে ভুবনে যেতে অনুরোধ করলেন। শিব চতুর্দ্দশীতে শিব রওয়ানা হলেন। এই গহন কাননে পথ চলতে চলতে শিবের বিশ্রামের প্রয়োজন হল ঃ

"যাইতে যাইতে শিব করিল দর্শন।
গহন কাননে শ্রীরামলক্ষ্মণাসন।।
পরিশ্রমে বসে শিব আসন পাতিয়া।
রাম চৌকি নাম হলো জগৎ জুড়িয়া।।"

শিব দেবসভায় এসে 'লাঙ্গল সৃজন কথা' শোনালেন ঃ

"কাশী হইতে রুদ্র হইল যে দ্বার।
উদয় হইলাম এসে পর্বত পাহাড়।।
বনে বনে ভ্রমণায় গহন কাননে।
লাঙ্গল সৃজন কথা শুন দেবগণে।।
সম্মুখে দেখিলাম এক বটবৃক্ষের ডাল।
ঐ বৃক্ষ হইতে পাড়ে কৃষিজীবের হাল।।
মৃত্তিকা কর্ষণে যদি বীজ বপন হয়।
নর নারায়ণী ভোগ হইবে নিশ্চয়।।
হায়রে কি করি এরে এ ঘোর জঙ্গল।
কোথায় পাইব এবে হাতুরা তাবল।।
ত্রিশূল প্রহারে বৃক্ষ হইল ছেদন।
লাঙ্গল গড়িনু ঠিক পায়ের মতন।।
আপন শরীর হলো সাড়ে তিন হাত।
লাঙ্গল হইতে পারে সোয়া দুই হাত।।
গাছ কাটিতে চাহে না প্রাণে গাছে আছে গোটা।
হাঁটু ভাঙ্গা দেখে তৈরী লাঙ্গলের বোঁটা।।
নাসিকা দেখিয়া তৈরী লাঙ্গলের ঈশ।
আর কত কুটি নাটি আত্মার জ্যোতিষ।।
ভুজা অনুমানে তৈরী কাঠের জোয়াল।
নখ অনুমানে তৈরী লাঙ্গলের ফাল।।

ঈশের গোড়াতে দেই ভরা এক চেলি।
জোয়ালের দুইধারে দেই জোয়ালের হলি।।
হলির বাহিরে থাকে বলদের কান্ধ।
মালাও লেঙ্গটা দ্বারা জোয়ালের আন্ধ।।
আন্ধের নির্ভরে ঈশ রহিল বসিয়া।
যে দিকে যাইবে নিবে কর্ষণ করিয়া।।"

শিবের দেবসভায় আগমন থেকে 'লাঙ্গল সৃজন কথা' বর্ণনা পর্যন্ত অংশ প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিব লাঙ্গল সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতার কথা বর্ণনা করেছেন। শিব যেহেতু 'অর্ধপথ' থেকে ভুবনে চলে এসেছিলেন তাই তাঁকে খুঁজে না পেয়ে দুর্গাদেবী ধ্যানযোগে সব অবগত হলেন এবং শিবকে কাশীধামে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রথমে পাঠালেন 'মশা মাছি পোকা',—উদ্দেশ্য এসব পোকার কামড়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শিব কাশীতে চলে আসবেন। কিন্তু শিব গাঁজার ধোঁয়া দিয়ে মশা মাছি তাড়িয়ে দিলেন। তখন, তৃষ্ণাপীড়িত শিব যাতে জলপান করতে না পারেন এজন্য দুর্গা ভুবনতীর্থের পানীয় জলের উৎসটির জল ঘোলা করার জন্য বিজয়া পরীকে পাঠালেন; শিব জোঁক সৃষ্টি করে পরীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলেন। এরপর দুর্গা পাঠালেন 'পাহাড়িয়া চিতা', শিব সৃষ্টি করলেন 'রামকুত্তা'। এভাবে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে শিব হাল সৃষ্টি করলেন।

"পাহাড়ে জঙ্গলে জীব কত শত শত।
ত্রিশূল প্রহারে সর্ব্ব করি বিতাড়িত।।
এই রূপে পৃথিবীতে সৃজন হয়েছে।
রক্ত চোষা হিংসা জীব পৃথিবী ঘেরেছে।।"

এরপর 'জীব সৃষ্টি' প্রসঙ্গে এসেছে 'বিরনি বলা বিঙ্গুলের' কথা। বিষাক্ত বোলতা হাজারে হাজারে কাশীধামে গিয়ে পৌঁছলে পার্বতীর তপস্যা ভঙ্গ হয়ে গেল; ভীত সন্ত্রস্ত দুর্গা দেবী পাতালে আশ্রয় নিলেন এবং সেখান থেকে সুড়ঙ্গপথে ভুবনে এসে শিবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

"পাতালে যাইয়া দুর্গা খুজিয়া বেড়ায়।
শিবে না পাইয়া দুর্গা কাঁদিয়া বেড়ায়।।
শুড়ঙ্গ হইতে আসে গহন কানন।
পাতালেতে মিল মাণ্ডব বলে সর্বজন।।
অন্তরে হইল ক্লেশ ধ্যান ছিন্ন বির্ণ।
ভুবন মন্দিরে দেবী হলো অবতীর্ণ।।
শিবে সনে পার্বতীর হইল মিলন।
ভুবন ও ভবানী নাম বলে সর্বজন।।
এই মতে শিব দুর্গা সৃষ্টির কারণ।
অবতীর্ণ হইলেন গহন কানন।।"

এরপর হাল চাষ সম্পর্কিত কিছু বিধি নিষেধের কথা বলা হয়েছে ঃ

"হাল না করিও চাষ প্রতি রবিবারে।
বসুমাতা জন্ম তিথি জন্ম রবিবারে।।

আষাঢ় মাসে অম্বুচারী হইবে যখন।
সপ্ত দিবা হাল না বাইও তখন।।
নাগ পঞ্চমী জন্মা অষ্টমী না ধরিও হাল।
অনায়াসে বেয়ে যাবে ভবের জঞ্জাল।।
আষাঢ়েতে রথযাত্রা হইবে যখন।
কদাচ সেদিনে হাল না বাইও তখন।।"

তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয় 'বৃষ নরলোকে আগমন' এবং সুরভির গাভীরূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হওয়া। প্রসঙ্গক্রমে শিব জানিয়েছেন ঃ

"আমার কর্ত্তব্য যাহা করিলাম আদায়।
ভোলানাথ কহিতেছে দেবতা সভায়।।
আমার লাঙ্গল যাহা দিয়াছি সংসারে।
আমার লাঙ্গল চাষে প্রতি ঘরে ঘরে।।

মর্ত্যভূমিতে লক্ষ্মীর আগমনের কথা এবং গৃহস্থের পালনীয় আচারের বিবরণ রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। লক্ষ্মীর কৃপায়ঃ

"মাঠে মাঠে ধান্য হইল গাছে গাছে ফল।
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা হইল অটল।।

পাঁচালীর এই কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে কতগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। প্রথমতঃ পাঁচালীটি অর্বাচীন নয়, পাঁচালীর মূল পাঠেই প্রাচীনতার ছাপ রয়েছে। যেমন, প্রাচীন শাস্ত্রাদির অর্থে 'জয়' শব্দের ব্যবহার, 'ধূচনি' অর্থে 'পট্টাঙ্গি'—এই লুপ্ত লৌকিক শব্দ, ত্রিকোণ পৃথিবীর কল্পনা—('তিন কোন পৃথিবী আছে জলেতে ভাসিয়া') পাঁচালীটিকে 'সত্য যুগের কথা' আখ্যা দেওয়া,—('অদ্গত প্রাণ জীবের সত্য যুগের কথা')—এসবই প্রাচীনতার চিহ্ন বহন করছে।

দ্বিতীয়তঃ পাঁচালী বর্ণিত কিছু কিছু কাহিনী থেকে ভুবন তীর্থের কয়েকটি স্থান নামের উদ্ভববৃত্ত জানা যাচ্ছে। ভুবন পাহাড়ে হাজারে হাজার ফুট চড়াই উঠবার পর 'পানি চৌকি' (এখানে একটি পাহাড়ী নালা আছে, এরপর থেকে মূল মন্দির পর্যন্ত আর কোথাও জল নেই), 'পানি চৌকি' থেকে প্রায় আটশো ফুট উপরে একটি জায়গার পরিচিতি 'আরাম চৌকি' অর্থাৎ আরামের বা বিশ্রামের স্থান। পাঁচালীতেও শিবের বিশ্রামের কথা রয়েছে। ভুবনতীর্থের 'মেল মণ্ডপ' একটি গুহা এবং বর্তমান মূল মন্দির থেকে বেশ দূরে। পাঁচালী অনুযায়ী 'মেল মণ্ডপই' অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ, কারণ শিব দুর্গা এখানেই সুড়ঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মেল মণ্ডপে যাওয়া বিপজ্জনক বলে তীর্থযাত্রীরা এখন মূল মন্দিরেই বেশী যান; কিন্তু Frank Ede-এর প্রতিবেদনে 'মেল মণ্ডপের' মাহাত্ম্যের কথাই বলা হয়েছে।

> "I would add that the caves are far more popular and held in more reverence than the idols, and although they cannot be entered without danger to life and limb, many thousands of men and women visit them annually."[৩৩]

তৃতীয়তঃ শিবের লাঙ্গল তৈরীর বিবরণ, বৃষের আগমন, লক্ষ্মীদেবীর আগমন,—একই সূত্রে গ্রথিত এমন একটি কাহিনী যা অনাবাদী ভূমিকে আবাদযোগ্য করে তোলার পর্যায় থেকে শুরু

করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াজাত বিবর্তনের বিবরণ। ফলতঃ পাঁচালীটি কর্ষণজীবী সভ্যতার সূচনা পর্ব থেকে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার পর্ব পর্যন্ত একটি লোকায়ত সাহিত্যিক দলিল।

৬. অন্যান্য সূত্র :

[ক] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত একটি ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে কাছাড় সম্পর্কিত কিছু তথ্য রয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রীঃ। মূল ইংরেজী গ্রন্থের লেখক বা অনুবাদকের নাম মুদ্রিত গ্রন্থে নেই। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ
আখ্যাপত্র—প্রথম পৃষ্ঠা : জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় / অর্থাৎ / জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও নানা দেশ ও নদী / ও পর্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারাধনা ও বাণিজ্য / ও লোক সংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ / লোকদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে / বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জ্জমা হইল। / Treatise / On Astronomy and Geography / Translated into Bengalee. / Second Edition. / Scrampore : / Printed at the Mission Press / 1819./[৩৪]

এই গ্রন্থে কাছাড় সম্পর্কিত বিবরণে উল্লিখিত তথ্যসমূহ হল :

"হিড়ম্বদেশ — শ্রীহট্টের পশ্চিম পূর্ব্বে হিড়ম্বদেশ সে দেশ স্বরাজাধীন তথাকার রাজা দুর্ব্বল সে দেশে তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র প্রসিদ্ধ আছে। এই দেশ পূর্ব্বদিগে মণিপুরের সহিত সংলগ্ন তাহার রাজধানী পূর্ব্বে ওয়াবাদী ছিল সম্প্রতি খাসপুর হইয়াছে।[৩৫]

বর্তমান গুয়াবাড়ী স্থান নামটিকে এই বিবরণে ওয়াবাড়ী বলা হয়েছে। হিড়ম্বদেশে হিন্দুশাস্ত্রের প্রসিদ্ধির উল্লেখ মনুস্মৃতি শাসিত সমাজ ব্যবস্থারই ইঙ্গিতবাহী।

[খ] কাছাড়ে যে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে ত্রিপুরী রাজমালায়। হেড়ম্বরাজের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে দক্ষিণ নৃপতি কপিলা নদী তীরবর্তী রাজ্যপাট পরিত্যাগ করে 'বরবক্র উজানে' খলংমাতে চলে আসেন।

"কপিলা নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া।।
সৈন্য সৈন্য সনে রাজা স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল।।"[৩৬]

খলংমায় 'বহুকাল' বাস করার পর ত্রিপুরীরা একটা ব্যাপক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং বহু হতাহতের পর এখান থেকে রাজধানী সরিয়ে নেন।

"বহুকাল বাস করে এই ক্রমে সবে।
পরম হরিষে লোকে নৃপতিকে সেবে।।
মল্লবিদ্যা-বিশারদ হৈল সৈন্য জন।
খড়গ চর্ম্ম লৈয়া পাঁচা খেলে ঢালিগণ।।

খলংমা নদীর তীরে পাষাণ পড়িছে।
মলা হৈলে খড়্গ লেঙ্গা তাথে ধরাইছে।।
খলংমা নদীর তীরে বালুচর আছে।
বীর সবের খড়্গ চর্ম্ম তাথে রাখিয়াছে।।
বড় বড় যোদ্ধা সব বীর অতিশয়।
মহাবল পদ ভরে ক্ষিতি কম্প হয়।।
মদ্য মাংসে রত সব গোয়ার প্রকৃতি।
তৃণ প্রায় দেখে তারা গজমত্ত-মতি।।
ত্রিপুরার কুলে পুনঃ বহু বীর হৈল।
মদ্য পান করি সবে কলহ করিল।।
তুমুল হইল যুদ্ধ ঘোর পরস্পর।
তাহা নিবারিতে নাহি পারে নৃপবর।।
আত্মকুল কলহেতে মহাযুদ্ধ ছিল।
পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী হৈল।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বড় অহঙ্কার।
অস্ত্রাঘাতে পড়ে যত নাহি সীমা তার।।
দীর্ঘ নিদ্রাগত বীরগণে ভূমি পূর্ণ।
ভূপতির যত গর্ব্ব সব হৈল চূর্ণ।।
পঞ্চাশ সহস্র বীর সে স্থানে মরিল।
এই স্থানের এই গুণ রাজায়ে জানিল।।"[৩৭]

এই বিবরণের অতিরঞ্জন বাদ দিলেও একথা বোধ হয় বলা যায় এই গৃহযুদ্ধে হাজার পাঁচেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্যপূর্ণ দুটো দিক হল, খলংমা একটি জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ দেশ হলে এখানে ত্রিপুরীর রাজধানী স্থানান্তরিত হত না। দ্বিতীয়তঃ এ ধরণের একটি গৃহযুদ্ধ বড়মাপের জনপদের অস্তিত্বের ইঙ্গিতবাহী।

[গ] বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলায় তিনটি স্থান নাম হল—মহীশাসন, ব্রাহ্মণশাসন ও ধর্মশাসন। ধর্মশাসন নামটি বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও মাইজগ্রাম এম.ই. স্কুলের নাম ধর্মশাসন এম.ই. স্কুল। শাসন শব্দ যুক্ত স্থান নাম প্রাচীনতার ইঙ্গিতবাহী। এ সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য।

"উড়িষ্যার প্রাচীন লেখাবলীতে 'তাম্রশাসন' অর্থে 'শাসন' শব্দের ভূরি-প্রয়োগ দেখা যায়। উড়িয়া ভাষাতেও শব্দটি চলিত আছে। আজও উড়িষ্যার বহু সংখ্যক গ্রামের নামে 'শাসন' শব্দটি সংযুক্ত দেখা যায়। কারণ প্রাচীন বা মধ্যযুগে ঐ গ্রামগুলি রাজদত্ত তাম্রশাসনের বিষয়ীভূত ছিল।"[৩৮]

একই সূত্রে বরাক উপত্যকার ঐ তিনটি স্থান নামেরও উৎপত্তি হয়েছে এই অনুমান অসঙ্গত নয়। এমতাবস্থায় উল্লিখিত স্থান তিনটির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

[ঘ] সুরমা-বরাক উপত্যকায় পূজা-পার্বণ বা হিন্দু শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানে 'প্রাচীন স্মৃতি'র নির্দেশ অনুসরণ করা হয়। 'প্রাচীন স্মৃতি' প্রসঙ্গে গবেষকদের বক্তব্য হল,

> "স্মৃতি শাস্ত্রের তিনটি যুগের মধ্যে সূত্রযুগ ও সংহিতাযুগকে প্রাচীন স্মৃতির যুগ নামে অভিহিত করা হয়—সূত্র ও সংহিতাই প্রাচীন স্মৃতি।"[৩৯]

উপসংহার ঃ

ভারতবর্ষের পূর্ব সীমানায় একটি আর্য জনপদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙালার তিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যকে আর্যভূমি বলে চিহ্নিত করে এই রাজ্যের নোক্তরূপ সীমানা নির্দেশ করেছেন,

> "এক সময় এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রংপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল।"[৪০]

পাণিণির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে উল্লিখিত 'সুরমস' জনপদের পরিচিতি প্রসঙ্গে V.S. Agrawala লিখেছেন,

> "Suramasa (N.1.170). As already noted this janapada may be identified with the Surma Valley and Hill District of Assam".[৪১]

কাছাড়ের প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারা, গ্রাম শাসন পদ্ধতি, ভূমি পরিমাপ, লোক বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে মনুস্মৃতির তথ্য প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবনের এই সাদৃশ্য দেখে এরকম অনুমানই সঙ্গত বলে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আর্য বসতি বিস্তৃত হবার সময় বরাক উপত্যকায় আর্য সংস্কৃতি প্রভাবিত একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রাক্ ব্রিটিশ কাল পর্যন্ত কাছাড়ের সমাজ জীবন প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যায়, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সমতল কাছাড়ে প্রথমে এসেছিলেন ত্রিপুরীরা, এরপর কোচরা এবং সবশেষে ডিমাসারা। কেন্দ্রীয় স্তরে বার বার পট পরিবর্তন ঘটেছে, এক রাজবংশের পর অন্য রাজবংশ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দখল করেছে কিন্তু দৃঢ়মূল গ্রামীণ সমাজ অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১ বরাক উপত্যকার ইতিহাসের রূপরেখা : ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য — সংহতি ১৯৯২ পৃঃ ১৩৫-১৩৬ (শিলং রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থাগারের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ) সম্পাদক—শঙ্কর চক্রবর্তী

২ নিয়োগ পত্রটির সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নরূপ :

শ্রীরা[ম]

৭ স্বস্তিঃ প্রচণ্ড দোর্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবা
নল শলভিকৃত বৈরি নিকর শ-
রদিন্দু সুন্দর জশ হেড়ম্ব পুর-
পুরিত পুরন্দর শ্রীশ্রীজুক্ত-
কির্ত্তি চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা-
মহা মহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপেসু-

অভয় পত্র লিখনং

মিদং কার্জ্যঞ্চ-

৭ আর বড়খলার চান্দলস্করর বেটা-
মণিরামরে আমি জানিআ কাচারির-
নিঅমে উজির পাতিলাম এতে অখন-
অবধি তুমার উজিরর বেটা ও নাতিও-
পরিনাতি তার ধারাসুত্র ক্রমে এই উ-
জির হৈআ জাইব আর মজুন্দারর বে-
টা মজুন্দার হৈব বড়ভুইআর বে-
টা বড়ভুইআ হৈব এতদর্থে অভয় দিলা-
ম এতে কাল কাদাল কুনদিন এই বাক্য-
দড় কুন জনে না ডাড়িব আর চতুর সি-
মা পূর্ব্বে বৈল্যা হাহর ও আভঙ্গ পশ্চি-
মে তাহিরর পশ্চিমর শিম্না এই তা-
হিররে বড়খলার জায়রে দিলাম-
আর উত্তরে পানিঘাট দক্ষিণে বড়-
বরাক এই পূর্ব্বর চতুরস্বিমাএ দিলা-
ম এতে কুন শন্দেহ না আছে আর রা-
জ্যর মনুশ্য জে জনে উজিরর বাক্যে-
না চলে মেল দেয়নে হেলা করিআ-
দেরয়ঙ্গ করে খেল্মা ও জয়জুরা-
ইন বশায় তারে সর্ব্বদণ্ড করিমু এত-
ধর্থে অভয় [প]ত্র [দিলা]ম-
ইতি শক ১৬৫৮ [তারিক] ২৯ ভাদ্রশ্য-
(পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ কৃত পাঠ)

৩ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ-এর আসাম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র বিভিন্ন সংখ্যায় নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল :

আসাম পর্যটন	১৭শ বর্ষ	১ম সংখ্যা	পৃঃ ৪১-৫২
আসাম ভ্রমণ ঃ দ্বিতীয় প্রবন্ধ	১৮শ ,,	৩য় ,,	পৃঃ ১৮১-১৮৯
আসাম ভ্রমণের পরিশিষ্ট	১৮শ ,,	৩য় ,,	পৃঃ ১৯০-১৯১
আসাম ভ্রমণ ঃ তৃতীয় প্রবন্ধ	২০শ ,,	১ম ,,	পৃঃ ৩৭-৪৩
আসাম ভ্রমণ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	২০শ ,,	১ম ,,	পৃঃ ৪৩-৪৬

৪ পরবর্তী সময়ে মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র প্রণীত গানগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমহাভাসোৎসব গীতমালা : মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র খড়গনারায়ণ প্রণীত : নিখিল কাছাড় হৈড়ম্ব বর্ম্মণ সমিতি। শিলচর : ১৯৯৯ ইং

৫ হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি : পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (স) : প্রকাশক শ্রীহরগোবিন্দ সেন, ভাণ্ডারপার, বিহাড়া : ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

৬ হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি ; পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (স): গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা : ১৩১৭ বঙ্গাব্দ : পৃঃ ভূমিকা-৫

৭ বরাক উপত্যকার ইতিহাসের রূপরেখা : পৃঃ ১৪১

৮ হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি : পৃঃ ভূমিকা-১

৯ ঐ : পরিশিষ্ট

১০ Memoir of Sylhet, Kachar, and the adjacent Districts : Captain Fisher : Journal of Asiatic Society of Bengal : No. 104 : 1840 : Page : 808-843.

১১ হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান বিধি : পৃঃ ২১

১২ A Statistical Account of Assam : W.W. Hunter : B.R. Publication, Delhi : 1982 : Page-395.

১৩ Cachar under British Rule in North East India : Jayanta Bhusan Bhattacharjee: Radiant Publisher, Delhi : 1977 : Page-75, 76.

১৪ Manusamhita: Chapter VII : Prof. Ashoknath Shastri : Modern Book Agency Pvt. Ltd., Calcutta : 1968 : Page-132.

১৫ ঐ : পৃঃ ১৩৩

১৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত : উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ : অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটি : ১৯৭১ : পৃঃ ১৬২

১৭ Kautilya's Political Ideas and Institutions : Prof. Radhakrishna Choudhury : Chowkhamba Publication; Varanasi : 1971 : Page-194, 195.

১৮ প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম : ডঃ প্রভারঞ্জন দত্ত : গ্রন্থসংহিতা, কলিকাতা : ১৯৭১ : পৃঃ ১১৪, ১১৫

১৯ Kautilya's Political Ideas and Institutions : Page-196.

২০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত : পৃঃ ১৭৬, ১৭৭

২১ ঐ : পৃঃ ১৭৬

২২ পরিমিতিসার : শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ : শিলচর, এরিয়েন প্রেস, শ্রীমথুরানাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত : ১৩২৩ বঙ্গাব্দ : পৃঃ (গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত অংশ)-৪

২৩ মনুসংহিতা : ডঃ মুরারীমোহন সেন শাস্ত্রী সম্পাদিত : দীপালী বুক হাউস, কলিকাতা : ১৯৮৫ : পৃঃ ৩৮৩

২৪ India as described by Manu : V.S. Agrawala : Prithivi Prakashan, Varanasi : 1970 : Page-36.

২৫ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত : পৃঃ ১২৩

২৬ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) : ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার : সাহিত্যলোক, কলিকাতা : ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ : পৃঃ ১৩০

২৭ ঐ : পৃঃ ১৩১

২৮ ঐ : পৃঃ ১২৩

২৯ ঐ : পৃঃ ১২৬-১৩২

৩০ লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার : ডা: বরুণ কুমার চক্রবর্তী : পুস্তক বিপণি, কলিকাতা : ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ : পৃঃ ২ থেকে উদ্ধৃত।

৩১ The Sacred Caves of Cachar : Frank Ede Esq : Journal of the Asiatic Society of Bengal : Vol. XXI, Part III, Calcutta, 1903 : Page-36-37.

৩২ "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য তাঁর রাজসভায় 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামক একজন সভাকবিকে দিয়ে বৃহৎ নারদীয় পুরাণের কাব্যানুবাদ করিয়েছিলেন বলে জানা যায়।" রাজসভার কবি ও কাব্য : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পুস্তক বিপণি, কলিকাতা : ১৯৮৬ : পৃঃ ২১০

৩৩ The Sacred Caves of Cachar : Page-37.

৩৪ শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থে শ্রীহট্ট প্রসঙ্গ : শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, যাদবপুর-এ, এ যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালায় রক্ষিত মুদ্রিত প্রবন্ধ। নং-বাঙ-৩৯৪৮

৩৫ ঐ

৩৬ শ্রীরাজমালা (প্রথম লহর) : শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত : রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা : ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ : পৃঃ ৬৬

৩৭ ঐ : পৃঃ ৩৭

৩৮ শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ : ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার : সাহিত্যলোক, কলিকাতা : ১৯৮২ : পৃঃ ১৯৭

৩৯ সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন : ডঃ বাণী চক্রবর্তী : কলিকাতা : ১৯৭০ : পৃঃ ১৩

৪০ বঙ্কিম রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ সংস্করণ : কলিকাতা : ১৩৫৭ : পৃঃ ৩৪১

৪১ India as known to Panini : V. S. Agrawala : University of Lucknow : 1953 : Page-60.

পরিশিষ্ট-ক

'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধির' সঙ্গে মনুসংহিতার সাদৃশ্য—

১. মনুসংহিতা ঃ তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েনদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্।। (৮/২৩৮)

অনুবাদ : ঐ পরীহার স্থানে বেড়া না দিয়া তৎসমীপে যদি কেহ শস্য বপন করে, আর গবাদি পশু—ঐ শস্য ভক্ষণাদি দ্বারা নষ্ট করে; তজ্জন্য নৃপতি পশুরক্ষকদিগকে দণ্ড করিবেন না।

'খ' পুঁথি: [গ্রামে]র নিকট কৃষি করিয়া যদি বেড়া না দেয় তাহাতে যদি পালকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে গবাদি পশু যায়া শস্য নষ্ট করে তবে পালকের দোষ হয় নাহি জানিব।

২. মনুসংহিতা ঃ ক্ষেত্রেষ্বেন্যেষু তু পশুঃ সপাদং পণমর্হতি।
সর্ব্বত্র তু সদো দেয়ঃ ক্ষেত্রিকস্যেতি ধারণা।। (৮/২৪১)

অনুবাদ : পথ, গ্রামান্ত ও পরীহার ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে তবে পশুপালের বা পশুস্বামীর একপণ পাঁচগণ্ডা দণ্ড হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ক্ষেত্রে স্বামীকে অর্থ দিতে হইবে।

'খ' পুঁথি : এবং গ্রামাদির দূরতরস্থ কৃষিতে কদাচিৎ যায়া যদি গবাদি পশুয়ে পালকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শস্য নষ্ট করে তবে পালকে রাজাতে/৫ পণ দণ্ড দিয়া কৃষকে যদি * * শস্য পুরাইয়া লইতে চায় তবে পুরিয়া দিতে হয়।

৩. দণ্ডবিধি বিষয়ক 'খ' পুঁথিতে 'বাকপারুষ্য' অধ্যায়ের সূচনায় বলা হয়েছে 'অথ বাকপারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা'। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে 'অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বাক্পারুষ্যবিনির্ণয়ম্' (৮/২৬৬)। অর্থাৎ 'অতঃপর বাকপারুষ্য সম্বন্ধে বলিব'।

৪. মনুসংহিতা ঃ শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি।। (৮/২৬৭)

অনুবাদ : ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যের দেড়শত বা দুইশত পণ দণ্ড হইবে। শূদ্রের তাড়নাদি শারীরিক দণ্ড হইবে।

'খ' পুঁথি : ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে উত্তম বাকপারুষ্য করে তবে রাজাতে ৬ ।৹ দণ্ড দিতে হয়। এবং বৈশ্যে করিলে ৯।৵৹ দণ্ড শূদ্র করিলে ৯।৵৹ দণ্ড দিতে হয় এবং বেত্রাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ তাড়নীয় হয়।

৫. মনুসংহিতা ঃ পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধ পঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।। (৮/২৬৮)

অনুবাদ : ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

'খ' পুঁথি : ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিয়কে উত্তম বাকপারুষ্য করে তবে রাজাতে ৩৵৹ তিন কাহণ দুইপণ দণ্ড দিতে হয়। বৈশ্যেতে করিলে ১৹ ॥/৹ দণ্ডঃ। শূদ্রতে করিলে ৸৹ দণ্ড দিতে হয়।

৬. মনুসংহিতা ঃ একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ।। (৮/২৭০)

অনুবাদ : একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, কারণ ইহার জন্ম জঘন্যস্থান হইতে হইয়াছে।

'খ' পুঁথি : আমী ধর্ম্ম কথা বলিতে পারি এবং বেদের উদাহরণকরণেতে সমর্থঃ দর্প করিয়া শূদ্রে যদি এমৎ বলে কিম্বা ব্রাহ্মণকে বৃহৎ পাপের মিথ্যাভিশাপ করে তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিব।। এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্রে ভর্ৎসনা করে এতেহ জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিব।।

৭. মনুসংহিতা ঃ কানং বাপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্।
তথ্যেনাপি ব্রুবন দাপ্যো দণ্ডং কার্যাপণাবরম্।। (৮/২৭৪)

অনুবাদ : সত্য সত্য সেইরূপ হইলেও যদি কেহ কাহাকেও কাণা, খঞ্জ বা কুব্জ প্রভৃতি শব্দে আহ্বান করে, তবে রাজা তাহাকে এক কার্যাপণ দণ্ড করিবেন।

'খ' পুঁথি : কাণ ও নপুংসক ও গুজা ইত্যাদিতে আক্রোশ করিলে। ।৵৹ ছয় পণ দণ্ড হয়।

৮. মনুসংহিতা ঃ এষ দণ্ডবিধিঃ প্রোক্তো বাক্পারুষ্যস্য তত্ত্বতঃ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্য নির্ণয়ম্।। (৮/২৭৮)

অনুবাদ : তত্ত্বত বাক্পারুষ্যের দণ্ডবিধি এই বলা হইল; এক্ষণে দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারি সম্বন্ধে বিধি বলিতেছি।

'খ' পুঁথি : ইতি বাক্পারুষ্য প্রকরণং সমাপ্তং ।। * ।। * ।। অথ দণ্ডপারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা।

৯. মনুসংহিতা ঃ পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি।। (৮/২৮০)

অনুবাদ : শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ করিবেন; আর পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে।

'ক' পুঁথি : ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পাণিং প্রহরন্ শূদ্রঃ পাণিচ্ছেদনদণ্ড্যঃ

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়।

কোপাৎ পাদেন প্রহরন্ পাদচ্ছেদন দণ্ড্যঃ

শূদ্রে যদি ক্রোধত পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তবে তাহার পাদ ছেদন করিতে হয়।

'খ' পুঁথি : শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিব। ক্রোধত পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা।

১০. মনুসংহিতা ঃ সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ।।
(৮/২৮১)

অনুবাদ : শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন।

'ক' পুঁথি : সহাসনে বসন্ শূদ্রঃ কট্যাং কৃতচিহ্নঃ রাজ্যান্নিঃ সার্য্যঃ অথবা (স্য) নিতম্বসমাপমাংস খণ্ডং কর্ত্তয়েৎ

ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈসে তবে তাহার কটিদেশ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে অথবা তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয়।

'খ' পুঁথি : ব্রাহ্মণের একাসনেতে এক কালী যদি শূদ্র বইসে তবে তাকে দাগ দিয়া পূরি হইতে বাহির করিব অথবা নিতম্বদেশ সমীপের মাংসখণ্ড কর্ত্তন করিব।

১১. মনুসংহিতা ঃ অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবনমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্।। (৮/২৮২)

অনুবাদ : দর্প করিয়া যদি শূদ্র, ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন, প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গ ছেদন করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে, গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন।

'ক' পুঁথি : কোপাৎ প্রহারার্থং ভূকুট্যা মুখং বিস্তারয়তঃ শূদ্রস্য দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্তে যদি ভূকুটী মুখ বিস্তার করে তবে তাহার দুইয় ঠুট ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি মূত্রমুৎসৃজতঃ শূদ্রস্য লিঙ্গং ছেদয়েৎ।

শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রস্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি পুরীষোৎসর্গে গুদং ছেদয়েৎ

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠা ক্ষেপণ করে তবে তার গুদ ছেদন করিতে হয়।

খ' পুঁথি : শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্ত যদি ভূকুটি দ্বারা মুখ বিস্তার করে তবে তাহার উভয় ওষ্ঠ ছেদ করিব। শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের

উপর প্রস্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ কর্ত্তন করিব।। যদি বিষ্ঠা প্রক্ষেপ করে তবে তাহার গুদ ছেদ করিব।।

১২. মনুসংহিতা ঃ কেশেষু গৃহ্বতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাড়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণে যু চ।। (৮/২৮৩)

অনুবাদ : শূদ্র অহঙ্কার-পূর্ব্বক যদি হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়িকা, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।

'ক' পুঁথি : ব্রাহ্মণস্য কেশেষু পাদয়োর্দ্বা গ্রীবায়াং বা অণ্ডকোষে বা কৃপাৎ শূদ্রস্য গৃহ্বতঃ হস্তৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে কিম্বা গ্রীবাতে ধরে কিম্বা পায়েতে ধরে কিম্বা অণ্ডকোষেতে ধরে (তবে উহার উভয় হস্ত ছেদন করাব।)

'খ' পুঁথি : শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে ও কিম্বা গ্রীবাতে ধরে ও কিম্বা পায়েতে ধরে ও কিম্বা অণ্ডকোষেতে ধরে তবে তাহার হস্তদ্বয় ছেদ করাব।।

১৩. মনুসংহিতা ঃ ত্বগ্ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু যন্নিষ্কন্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ।। (৮/২৮৪)

অনুবাদ : সমান জাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্মভেদ করে অথবা রক্তদর্শন করে, তবে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে; মাংসভেদকারীর ছয় নিষ্ক দণ্ড হইবে। আর অস্থিভেদে দেশ-নির্ব্বাসন-রূপ দণ্ড হইবে।

'ক' পুঁথি : চর্ম্মভেদে সর্ব্বত্র সাদ্ধাধিশত পণাঃ

সমান ব্যক্তিয়ে মারেপেতে যদি চর্ম্মভেদ হয় তবে রাজাতে ১৫।। ৭পণর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

[মাংস] ভেদে পঞ্চশত পণাঃ

সমান ব্যক্তিয়ে মারেপেতে যদি মাংসভেদ হয় তবে রাজাতে ৩১।/· একত্রিস কাহন চাউর পণ দণ্ড দিতে হয়।

অস্থি ভেদে সহস্রপণাঃ

সমান ব্যক্তিয়ে অস্থিভেদ করিলে ৬২।।· সাড়ে বাষট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

'খ' পুঁথি : মারণেতে যদি চর্ম্ম ভেদ হয় তবে ১৫।। ৭. দণ্ড দিতে হয় যদি মাংস ভেদ হয় তবে ৩১।· দণ্ড দিতে হয় অস্থি ভেদেতে ৬২।।· দণ্ড হয়।

১৪. মনুসংহিতা ঃ ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জা বেণুদলেন বা।।
পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোহন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।। (৮/২৯৯-৩০০)

অনুবাদ : স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জু দ্বারা অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগবে তাড়না করিবে।। কিন্তু রজ্জ্যাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে—কদাপি উত্তমাঙ্গে আঘাত করিবে না। অন্যত্র প্রহার করিলে প্রহর্ত্তা, চোরের ন্যায় অপরাধী হইবেন।

'ক' পুঁথি : ভার্য্যা পুত্রদাসশিষ্যকনিষ্ঠা [দয়শ্চেৎ]

কৃতাপরাধা স্তান * * * রজ্জাবন্ধনে * * * অতিসূক্ষ্ম

* * * খ্যাতেন * * তাদৃশ * * [তাড়]নং কুর্য্যাৎ।

ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস ও শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদর এই সকলে অপরাধ করিলে রজ্জ্যাদি বন্ধন করিয়া বাসের সূক্ষ্ম ২ কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়না করিতে পারে ইহাতে রাজদণ্ড নাই।

শিরসি তাড়নং কদাপি ন কুর্য্যাৎ শিরসি প্রহরন্ চৌরবৎ * * প্রাপ্নোতি।

কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চোরের প্রায় রাজদণ্ড দিতে হয়।

'খ' পুঁথি : ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস শিষ্য ও কনিষ্ঠ সোদর এই সকলে অপরাধ করিলে, রজ্জ্যাদি বন্ধ করিয়া বাসের সূক্ষ্ম কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়ন করিতে পারে জানিব ইহাতে রাজ দণ্ড নাই।। কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চোরের প্রায় দণ্ড্য হয়।

১৫. মনুসংহিতা ঃ পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে।। (৮/৩০২)

অনুবাদ : রাজা চোরের নিগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন, চোরের নিগ্রহ রাজার যশ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়।।

'ক' পুঁথি : চৌরাণাং নিগ্রহে পরমং যত্নং কুর্য্যাৎ। [চৌর] নিগ্রহাদ্ যশো বর্দ্ধতে।

চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করিবেন চোরের নিগ্রহতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব।

'খ' পুঁথি : চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করাবেন্ চোরের নিগ্রহেতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব।

১৬. মনুসংহিতা ঃ ধান্যাং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরতোঽভ্যধিকং বধঃ।
শেষেত্বেপিকাদশগুণং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনম্।।
তথা ধরিমমেয়াণাং শতাদভ্যধিকে বধঃ।
সুবর্ণরজতাদীনাযুতমানাক্ষ বাসসাম্।।
পঞ্চাশতত্ত্বভ্যধিকে হস্তচ্ছেদনমিষ্যতে।
শেষে ত্বেদশগুণং মূল্যাডদণ্ডং প্রকল্পয়েৎ।। (৮/৩২০-৩২২)

অনুবাদ : দুইশত পলে এক দ্রোণ—বিংশতি দ্রোণে এক কুম্ভ—এইরূপ যে দশকুম্ভেরও অধিক ধান্য চুরি করিবে, তাহার শারীরিক দণ্ড হইবে; ইহার কম ধান্য চুরি করিলে একাদশগুণ দণ্ড হইবে এবং ধান্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। তুলা পরিমাণের যোগ্য সুবর্ণরজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম বস্ত্রের একশত পলের অধিক হরণ করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে। পঞ্চাশের অধিক শত পর্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য অপহরণে হস্তচ্ছেদন দণ্ড হইবে; এক হইতে পঞ্চাশৎ পল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যের মূল্যের একাদশগুণ দণ্ড হইবে।

'ক' পুঁথি : বিংশতিদ্রোণন্যূন ধান্যাপহরণে তৎসংখ্যালব্ধং স্বামিনদদ্যাৎ তদেকাদশগুণঞ্চ রাজনি দণ্ডত্বেন দদ্যাচ্চ।

বিংশতি দ্রোণের [পরিমাণ] ধান্যের ন্যূন ধান্য [চোরি করিলে] ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ [ধান্য] দিয়া রাজাতে ঐ ধান্যের [একা] দশ গুণ ধান্যের মূল্য দণ্ড[দিতে] হয়।

ইতোধিকাপহরণে মরণীয় :

বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক ধান্য চোরি করিলে মরণীয় হয়।

সুবর্ণরজতাপহরণে শতপলাধিকে বধঃ

সুবর্ণ ও রজত যদি শত পণের অধিক চোরি করে তবে সে মরণীয় হয়।

[পণেরস্থলে 'পলের' হইবে।]

ন্যূনে কর্ণচ্ছেদঃ

উপরের লিখিত সুবর্ণ ও রজতের ন্যূন চোরি করিলে কর্ণ ছেদন যোগ্য হয়।

স্বল্পসুবর্ণরজতাপহরণে তাড়নং

অল্প সুবর্ণ ও অল্প রজত চোরি করিলে তাড়না করিতে হয়।

'খ' পুঁথি : বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের ন্যূন ধান্য চোরি করিলে ধান্যেরস্বামিকে তাদৃশ ধান্য দিয়া রাজাতে তাহার একাদশ গুণ ধান্য দণ্ড দিতে হয়। * * * এতাদৃশ বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক চোরি করিলে মারণীয়

হয় স্বর্ণ ও রজত যদি শত পলের অধিক চুরি করে তবে বধ্য হয়।। এহার ন্যূন চুরি করিলে কর্ণচ্ছেদ যোগ্য হয়।

১৭. মনুসংহিতা ঃ পরস্ত্রিয়ং যোহিভদেৎ তীর্থরণ্যে বনেহপি বা।
নদীনাং বাপি সন্তেদে স সংগ্রহণমাপ্লুয়াৎ।।
উপচারক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসমাম।
সহ খট্টাসনঞ্চৈব সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।। (৮/৩৫৬, ৩৫৭)

অনুবাদ : তীর্থে, অরণ্যে, নির্জ্জন বনে বা নদী সঙ্গমস্থলে যে পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন করে, তাহার সে দোষ স্ত্রীসংগ্রহরূপে গণ্য হইবে। সুগন্ধি-মাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস ও আলিঙ্গন, অলঙ্কার স্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্রে ভোজন—পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে, স্ত্রী সংগ্রহণরূপে গণ্য হইবে।

'ক' পুঁথি : পরস্ত্রিয়া সহ নির্জ্জনে রাত্রাদৌ প্রতিসন্ধান-পূর্ব্বকমবস্থিতিঃ চিত্তাকর্ষণরূপসম্ভাষণঞ্চ এক * * * * ক্রীড়া চুম্বনালিঙ্গনা দিচ। [পরস্ত্রি]য়া সহ ঈদৃশ মৈথুনানুকূলসম্ভাষণে প্রথম সাহসদণ্ডঃ।

অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতিসন্ধান করিয়া [নির্জ্জন] স্থানেতে গিয়া কিম্বা [রাত্র্যাদি] কালেতে অবস্থিত হইয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ব্যক্তি ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুন করে যে এই ব্যক্তিরা রাজাতে ১৫ ।। ৵. পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

'খ' পুঁথি : অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতিসন্ধান করিয়া নির্জ্জন স্থানেতে কিম্বা রাত্র্যাদি কালেতে অবস্থিত হইয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন ও আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুনের কথা কহে যে এই সব ব্যক্তিয়ে রাজাতে ১৫ ।। ৵. দণ্ড দিতে হয়।

১৮. মনুসংহিতা ঃ ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহু সংস্থিতে।।
পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুঃ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ।। (৮/৩৭১, ৩৭২)

অনুবাদ : "আমি ধনিলোকের কন্যা"—এই দর্পে অথবা আপনার সৌন্দর্য্যদর্পে, যে স্ত্রীলোক নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহুলোক সমাজে লইয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবে; আর সেই পাপকারী জারপুরুষকে তপ্তলৌহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে,—যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, তাবৎ অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে।

'ক' পুঁথি : ধনভ্রাত্রাদি সৌন্দ্যর্ যা * * দর্পণ যা পতিং * * ব্যভিচরতি তাং * *লোকমধ্যে কুক্কুরেণ খাদয়েৎ। ধন ও ভ্রাতাদির ও সৌন্দর্য্য এই সবের গর্ব্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত [ব্যভিচা]র করে যেই স্ত্রীয়ে এতাদৃশ] স্ত্রীকে রাজাযে [লোকমধ্যে]তে আনাইয়া কুকুর দ্বারা খাওয়াইবেক।

অননুরক্তায়াং দর্পণাভ্যস্তারং তপ্তে লৌহময়শায়য়িত্বা দাহয়েৎ।

অননুরক্তা অর্থাৎ মানে না যে স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগমন করে তবে তাহাকে অগ্নিমধ্যেতে লৌহময় পাত্রেতে শয়ন করাইয়া দাহ করাইবেক।

মারণনিযুক্তাঃ পুরুষাস্তত্রকাষ্ঠং ক্ষিপেয়ুঃ

মারণেতে নিযুক্ত যেই ২ পুরুষ সেই সকলে তাহার উপরে কাষ্ঠ ক্ষেপণা করিবেক।

'খ' পুঁথি : ধন ও ভ্রাতাদি ও সৌন্দর্য্য এই সকলের গর্ব্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচার করে যেই স্ত্রীয়ে তাদৃশ স্ত্রীকে রাজাযে লোক মধ্যেতে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেক। অননুরক্তা যেই স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগম করে তবে তাকে অগ্নিমধ্যে লৌহময় পাত্রেতে শআইয়া দাহ করাবেক্। মারণেতে নিযুক্ত যেই যেই পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ ক্ষেপণা করিবেক।

১৯. মনুসংহিতা ঃ শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতংবর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্ব্বস্বৈরগুপ্তং সর্ব্বেণ হীয়তে।। (৮/৩৭৪)

অনুবাদ : যত্নরক্ষাযুক্তাই হউক, বা অরক্ষিতাই থাকুক, শূদ্র দ্বিজাতির স্ত্রীগমন করিলে, অরক্ষিতা গমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্ত্তাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা স্ত্রী গমনে বধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে।

'খ' পুঁথি : শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়ানী ও বেশ্যানী গমন করে তবে বধ্য হয়। গুপ্তা গমনেতে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা। শূদ্রে যদি অগুপ্তা ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ানী ও বৈশ্যানী গমন করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করি সর্ব্বস্বহরণ করিবেক।

২০. মনুসংহিতা ঃ উভাবপি তু তাবের ব্রাহ্মণ্য গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্ধণ্ডৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা।। (৮/৩৭৭)

অনুবাদ : বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি গুণবতী রক্ষণযুক্তা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে; অথবা দর্ভ বা শর দ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে।

'খ' পুঁথি : যদি গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন করে তবে ক্ষত্রিয়কে শর পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিব।। শরপত্র ভুটাসঙ্গর পাতা জানিবা।। যদি বৈশ্যে গুণবতী ব্রাহ্মণী

গমন করে তবে তাকে লৌহময় দন্ত বেষ্টিত করিয়া দাহ করাইবেক লৌহময় দন্ত লৌহের কুশ প্রতিকৃতিঃ।।

২১. মনুসংহিতা সহস্রং ব্রাহ্মণা দণ্ড্যো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদ্রজন।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যাঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ।। (৮/৩৭৮)

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যদি রক্ষাযুক্তা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে, আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে উহার পাঁচশত পণ দণ্ড হইবে।

'খ' পুঁথি : গুপ্তা ব্রাহ্মণীতে যদি বলৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণে গমন করে তবে রাজাতে ৬ ২ ।।. দণ্ড দণ্ড দিতে হয়।। যদি তাদৃ শব্রাহ্মণীর ইচ্ছাত গমন করে তবে ৩ ১ ।. দণ্ড দিতে হয়।

২২. মনুসংহিতা ঃ মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীযতে।
ইতরেষাস্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ।। (৮/৩৭৯)

অনুবাদ : প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন দণ্ড হইবে—ইহাই বিধান, অপরাপর বর্ণের প্রাণান্ত দণ্ড হইতে পারে।

'খ' পুঁথি : যেই যেই অপরাধেতে প্রাণান্তিক দণ্ড লেখা জায় তাহাতেই ব্রাহ্মণের শিরোমুণ্ডন জানিবা ব্রাহ্মণের প্রাণান্তিক দণ্ড নাই।।

ঋণাদানবিধি ও মনুসংহিতার সাদৃশ্য ঃ

১. মনুসংহিতা ঃ বালদায়াদিকং রিকথং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ।। (৮/২৭)

অনুবাদ : পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে তাবৎকাল পর্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে সমাবৃত্ত না হয় অথবা যে পর্যন্ত না সে অতীত শৈশব হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক হইলে বালক অতীত শৈশব হয়—ইহা নারদ বচন।

ঋণাদানবিধি : পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক পিতৃহীন বালকের পাস হেতে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাহি এবং ঐ বালকেতে ঋণাদি দিতে পারে নাহি এবং ঐ বালকেতে ঋণাদি দিতে পারে নাহি এবং ঐ বালক ব্যবহারেতে অযোগ্য প্রযুক্ত পিতৃঋণ দিতে ও লৈতে এবং আপনার কার্য্যাদির অনুপযুক্ত কিন্তু পঞ্চদশবর্ষের পর সর্ব্বকার্য্যের উপযুক্ত। (পৃঃ ১১)

২. মনুসংহিতা ঃ ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ।। (৮/৪৯)

অনুবাদ : ধর্ম্ম অর্থাৎ বান্ধবাদি দ্বারা উপদেশ দিয়া, ব্যবহার অর্থাৎ সাক্ষি লেখ্য দিয়া বা শপথাধি দ্বারাও প্রমাণ করিয়া দিয়া; ছল অর্থাৎ কৌশল দ্বারা, আহরিত অর্থাৎ ঋনিকের গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি ধরিয়া অথবা তাহার যাতায়াতের পথ অবরোধ করিয়া—এই সকল উপায় দ্বারা উত্তমর্ণ আপনার টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন এবং পঞ্চমতঃ বলপ্রয়োগ অর্থাৎ গ্রহরাদ্রিও করিতে পারেন।

ঋণাদানবিধি : সত্য বাক্যাদি দিব্য দ্বারা ও ছল দ্বারা ও ধারণ দ্বারা ও তাড়ন দ্বারা এই সকল দ্বারা ধনিক যে ঋণ দিয়াছে সে ঋণ শাসন করিবেক ধারণাদি করিলেহ যদি ঋণ না পায় তবে শৌণ্ডিকাদি ধনিক হৈলে গৃহেতে আনিয়া কর্ম্মকরাবেক।। (পৃঃ ১৪)

৩. মনুসংহিতা ঃ অর্থোহপব্যয়মানস্তু করনেন বিভাবিতম।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ।। (৮/৫১)

অনুবাদ : "আমি তোমার ধারি নাই," বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন।

ঋণাদানবিধি : ধনিকে ধরিতে যদি ঋণিকে বলে জে আমি তোমার কোন ধন না নিয়াছি তবে যদি পাছে সাক্ষি দ্বারা ঐ ধনের প্রমাণ হয় তবে ঋণের দ্বিগুণ দণ্ড রাজাতে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেক। (পৃঃ ১৬)

৪. মনুসংহিতা ঃ নাতিসাম্বৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টং পুনহিরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কারিকা চ যা।। (৮/১৫৩)

অনুবাদ : একমাস, দুইমাস বা তিনমাস অন্তর একবার সুদ লইব, এই নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর অতীত করিয়া তাহার সুদ একেবার গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নয়। কিম্বা অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণ করাও উচিত নয়। চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূলের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, কারিতা অর্থাৎ অধমর্ণ আপৎকালে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং কারিকা বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি দ্বারা যে বৃদ্ধি—এই চারি প্রকার বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিবে।

ঋণাদানবিধি : অর্থধর্ম্ম্যবৃদ্ধিঃ কোন মতে অন্য মতেহ বৃদ্ধি আছে সেই অনেক বিধা হয় কায়িকা কালিকা চক্রবৃদ্ধিঃ কারিতাবৃদ্ধিঃ শিখাবৃদ্ধিঃ ভোগলাভ যথাক্রমে বিস্তার করিব। (পৃঃ ২)

৫. মনুসংহিতা ঃ প্রতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি।। (৮/১৫৯)

অনুবাদ : দর্শনি প্রতিভূ হেতু ধন দিতে হইলে, ভণ্ড প্রভৃতিকে পরিহাস নিমিত্ত বৃথা দান, দ্যূতক্রীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডনিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষ—পিতৃকুত এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না।

ঋণাদানবিধি : সুরাপান নিমিত্ত জে ঋণ করি থাকেন ও দ্যূতাদি ক্রীড়ার পণরূপ ঋণ অর্থাৎ খেলাতে জে পণ করিয়া থাকেন ও ধর্ম্মার্থ বিনা দানরূপ অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য ব্যতিরেকে যাহা দান করি থাকেন ও কাম ক্রোধ হৈতে যাহা স্বীকার করি থাকেন ও হাজির জামিন বিষয়ক জে দেন ও প্রত্যয় জামিন বিষয়ক জে দেন ও রাজদণ্ড বিষয়ক জে দেন ও ক্রিয়া মাত্রের পণ বিষয়ক অর্থাৎ তুমি যদি এই ক্রিয়া করিতে পার তবে আমি এত টাকা দিব ও লোকব্যবহারাতিলোক কর্ম্ম নিমিত্ত জে দেন অর্থাৎ লোকের বহির্ভূত কর্ম্ম করি যে ঋণ করি থাকেন এই সব পিতৃকৃত ঋণ পুত্রে দিবেক্ নাহি। (পৃঃ ১১-১২)

৬. মনুসংহিতা ঃ কুটুম্বার্থেইপ্যধীনোহপি ব্যবহারং যমাচরেৎ।
স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্নবিচালয়েৎ।। (৮/১৬৭)

অনুবাদ : যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্বার্থ ঋণ করিয়া মরে, তবে অবিভক্ত বা বিভক্ত পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে।। কুটুম্ব ভরণ পোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তবে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাঁহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে।

ঋণাদানবিধি : পিতৃব্য জে ঋণ করিয়াছেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র জে ঋণ করিয়াছেন ও স্ত্রী জে ঋণ করিয়াছেন ভৃত্য জে ঋণ করিয়াছিল ও শিষ্যে জে ঋণ করিয়াছিল সে ঋণ যদি আপনার পরিবার রক্ষার্থ হয় আর যদি ঐ সব আপনার একত্রে থাকেন তবে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক। (পৃঃ ১৩)

৭. মনুসংহিতা ঃ দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াদ্বর্ণনামনুপূর্ব্বশঃ।। (৮/১৪২)

অনুবাদ : উত্তমর্ণ এইরূপে স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়া বর্ণানুপূর্ব্বী ক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুইপণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ, বৈশ্যের নিকট চারিপণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচপণ সুদ প্রতিমাসে লইতে পারেন।

ঋণাদানবিধি : বন্ধক জে ঋণেতে দিয়াছে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ মাস প্রতি ব্রাহ্মণেতে কার্ষাপণ প্রতি ৪ গণ্ডা ক্ষৎিত্রয়েতে ৬ গণ্ডা বৈশ্যেতে ৮ গণ্ডা শূদ্রেতে ১০ গণ্ডা।। জামিন জে ঋণেতে দিয়াছে ব্রাহ্মণেতে ৪ ।। গণ্ডা ক্ষৎিত্রয়েতে ৬ ৸. গণ্ডা বৈশ্যেতে ৯ গণ্ডা শূদ্রেতে ১১ ।. গণ্ডা।। (পৃঃ ১)

৮. মনুসংহিতা ঃ কুলজে বৃত্ত সম্পন্নে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যর্থে নিক্ষেপং নিক্ষেপেদ্বুধঃ।। (৮/১৭৯)

অনুবাদ : সংকুলজাত, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান লোক ধন গচ্ছিত রাখিবেন।

ঋণাদানবিধি : কুলীন, নানা বৃত্তযুক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদি ও বন্ধুযুক্ত ও সাধু ব্যক্তিতে আমানত রাখিবেক।। (পৃঃ ১৭)

পরিশিষ্ট-খ

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত সংস্কার ও মনুস্মৃতির সাদৃশ্য :

১. স্থানীয় সংস্কার : গরু বান্দার দড়ি ডেইত(অ) পারে না।
[গো বন্ধনের রশি উল্লঙ্ঘন করতে নেই।]
জল(অ) নিজর ছায়া দেখত পারে না।
[জলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করতে নেই।]

মনুসংহিতা : ন লঙ্ঘয়েদ্বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।
ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বং রূপমিতি ধারণা।। (৪/৩৮)

অনুবাদ : বৎস-বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না; বারি বর্ষণ কালে দৌড়িয়া যাইবে না এবং জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না—ইহা শাস্ত্রের ধারণা।

২. স্থানীয় সংস্কার : জামাই-বৌয়ে একলগে খাইত পারেন না; খাইলে অলক্ষ্মী লাগে।
[স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে খেতে নেই। একসঙ্গে খেতে বসলে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে।]

মনুসংহিতা : নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্। (৪/৪৩)

অনুবাদ : ভার্য্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না; ভোজন করিতেছে এমন সময় ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না।

৩. স্থানীয় সংস্কার : মাসিকর সময় বৌরে ছুইত পারে না।
[ঋতুকালে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে নেই।]

মনুসংহিতা : নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোহপি স্ত্রিয়মাত্তবদর্শনে।
সমান শয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ।। (৪/৪০)

অনুবাদ : কামোন্মত্ত হইলেও রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে স্ত্রীগমন করিবে না, অথবা তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না।

৪. স্থানীয় সংস্কার : এক কাপুড়ে খাইত পারে না।
[এক বস্ত্র পরে খেতে নেই।]

লেংটা অইয়া হিনান করত পারে না।
[উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে নেই।]

মনুসংহিতা : নাশ্নাদ্যাদেকবাসা ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ। (৪/৪৫)

অনুবাদ : একবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ন ভোজন করিবে না। বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না।

৫. স্থানীয় সংস্কার : দাড়াইয়া মুতত পারে না।
[দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে নেই।]

মনুসংহিতা : ন সসত্ত্বেষূ গর্তেষু ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্ব্বত মস্তকে।। (৪/৪৭)

অনুবাদ : প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে অথবা গমন করিতে করিতে, কিম্বা দণ্ডায়মান থাকিয়া, বা নদীতীর প্রাপ্ত হইয়া, অথবা পর্ব্বতের মস্তকে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

৬. স্থানীয় সংস্কার : ফু দিয়া আগুন জালাইত পারে না।
[ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ।]
আগুন অ পাও লাগাইত পারে না।
[পা দিয়ে আগুন স্পর্শ করতে নেই।]
আগুন ডেইত পারে না।
[আগুন উল্লঙ্ঘন করতে নেই।]

মনুসংহিতা : নাগ্নিং মুখেনোপধমেন্নাগ্নেঙ্কেত চ স্ত্রিয়ম্।
নামেধ্যং প্রক্ষিপেদগ্নৌ ন চ পাদৌ প্রতাপয়েৎ।।
অধস্তান্নোপদধ্যাচ্চ ন চৈনমভি লঙ্ঘয়েৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যান্ন প্রাণবাধ্যমাচরেৎ।। (৪/৫৩, ৫৪)

অনুবাদ : মুখ দ্বারা ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বলাইবে না; পত্নীকে উলঙ্গ দেখিবে না; অগ্নিতে অপবিত্র দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে না এবং অগ্নিতে পা উত্তাপিত করিবে না। শয়নীয়ের অধোদেশে অগ্নিপাত্র রাখিবে না; অগ্নিকে উল্লঙ্ঘন করিবে না; পাদদেশে অগ্নি রাখিবে না' এবং যাহাতে প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়, এমন কোন কর্ম্ম করিবে না।

৭. স্থানীয় সংস্কার : ত্রি সইন্ধ্যার সময় খাইত, ঘুমাইত, বাড়ীর বাইরে যাইত পারে না।

[সন্ধি কালে খাওয়া, ঘুমানো বা শুয়ে থাকা এবং বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ।]

মনুসংহিতা : নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং ন গচ্ছেল্লাপি সংবিশেৎ। (৪/৫৫)

অনুবাদ : সন্ধিবেলায় ভোজন করিবে না, ভ্রমণ করিবে না এবং শয়ন করিবে না।

৮. স্থানীয় সংস্কার : সইন্ধা পতা খাইলে রাইকৃষ্ণর ভোজন অয়।
[সূর্য্যের উদয়-অস্ত সন্ধিকালে কোন খাবার জিনিস খেলে রাক্ষসের ভোজন হয়।]

মনুসংহিতা : নাতি প্রগে নাতি সায়ং ন সায়ং প্রাতিরাশিতঃ।। (৪/৬২)

অনুবাদ : অতি প্রভাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না এবং দিবসে অতি ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া রাত্রিকালে আর ভোজন করিবে না।

৯. স্থানীয় সংস্কার : দাত কড়মড়ি করলে সন্তানর আয়ু কমে।
[দাঁতে দাঁত ঘষে শব্দ করলে সন্তানের আয়ু কমে।]

মনুসংহিতা : না স্ফোটয়েন্ন চ ক্ষ্বেড়েন্ন চ রক্তো বিরাবয়েৎ। (৪/৬৪)

অনুবাদ : দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ করিবে না কিম্বা অনুরাগভরে গর্দভাদির ন্যায় চীৎকার করিবে না।

১০. স্থানীয় সংস্কার : বাসন (অ) পাও লাগাইত পারে না
[বাসনপত্রে পা ছোঁয়াতে নেই।]
ভাঙ্গা বাসন (অ) খাইত পারে না।
[ভাঙ্গা পাত্রে খাওয়া নিষিদ্ধ।]

মনুসংহিতা : ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।
ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত ন ভাবপ্রতিদূষিতে।। (৪/৬৫)

অনুবাদ : কাংস্যপাত্রে কখন পদ-ধাবন করিবে না; ভগ্ন পাত্রে ভোজন করিবে না। অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না।

১১. স্থানীয় সংস্কার : দাত দিয়া নউখ কাটত পারে না।
[দাঁত দিয়ে নখ কাটা নিষিদ্ধ।]

মনুসংহিতা : ন ছিন্দ্যান্ন লোমানি দন্তৈনোৎ পাটুয়েন্নখান্।। (৪/৬৯)

অনুবাদ : আপনা-আপনি নখ ও লোম ছেদন করিবে না, কিম্বা দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটত করিবে না।

১২. স্থানীয় সংস্কার : রাইত কাল (অ) গাছর তল (অ) যাইত পারে না।
[রাত্রিবেলা গাছের নীচে যেতে নেই।]

মনুসংহিতা : রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।। (৪/৭৩)

অনুবাদ : রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমনাগমন করিবে না।

১৩. স্থানীয় সংস্কার : রাইত্ তিল খাইত পারে না।
[রাত্রে তিল খাওয়া নিষিদ্ধ।]
লেংটা অইয়া ঘুমাইত পারে না।
[নগ্ন হয়ে ঘুমানো নিষিদ্ধ।]
সকুড়া মুখে কুনুখান (অ) যাইত পারে না।
[উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যেতে নেই।]

মনুসংহিতা : সর্ব্বঞ্চ তিলসম্বদ্ধং নাদ্যাদস্তমিতে রবৌ।
ন চ নগ্নঃ শয়ীতৈহ ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ ব্রজেৎ।। (৪/৭৫)

অনুবাদ : সূর্য্য অস্ত গেলে পর, তিল সম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না; উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যাইবে না।

১৪. স্থানীয় সংস্কার : গুয়র বায় নজর দিলে চউক্ (অ) নাটুঝিলা উঠে।
[বিষ্ঠার দিকে নজর দিলে চোখে ফোঁড়া (STYE) উঠে।]

মনুসংহিতা : ন বিন্মুত্রমীক্ষেত ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ।। (৪/৭৭)

অনুবাদ : মলমূত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না এবং নদীতে সাঁতার দিবে না।

১৫. স্থানীয় সংস্কার : দুই আতে মাথা খাউজজাইলে পাগল অইন।
[দু হাতে মাথা চুলকালে পাগল হয়।]

মনুসংহিতা : ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডুয়েদাত্মনঃ শিরঃ। (৪/৮২)

অনুবাদ : উভয় হস্ত দ্বারা আপনার মস্তক কণ্ডুয়ন করিবে না।

১৬. স্থানীয় সংস্কার : হিনান্ করিয়া তেল দিত পারে না।
[স্নান করে শরীরে তেল মর্দন করতে নেই।]

মনুসংহিতা : শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।। (৪/৮৩)

অনুবাদ : তৈলাক্ত মস্তকে স্নান করিয়া অপর কোন অঙ্গে তেল স্পর্শ করিবে না।

১৭. স্থানীয় সংস্কার : ভাত্ খাইয়া হিনান্ করলে পিত্ পড়ে।
[ভাত খাবার পর স্নান করলে পিত্ত প্রাবল্য হয়।]

মনুসংহিতা : ন স্নানমাচরেদ্ভুক্তা নাতুরো না মহানিশি। (৪/১২৯)

অনুবাদ : ভোজন করিয়া স্নান করা উচিত নয়; পীড়িত অবস্থায় বা মধ্যরাত্রে স্নান করিতে নাই।

১৮. স্থানীয় সংস্কার : হিনানর জল হুড়ত পারে না।
[স্নানের জল পা দিয়ে মাড়াতে নেই।]

মনুসংহিতা : উর্ধ্বর্তনমপস্নানং বিন্মুত্রে রক্তমেব চ।
শ্লেষ্মনিষ্ঠ্যতবান্তানি নাধিতিষ্ঠেৎ তু কামতঃ।। (৪/১৩২)

অনুবাদ : উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রে হরিদ্রা ও তৈলাদি মর্দন করিলে, যে সকল মলা ভূমিতে পড়ে; স্নানের জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ চর্ব্বিত-পরিত্যক্ত তাম্বুলাদি এবং বমি—এই সকল দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মাড়াইবে না।

১৯. স্থানীয় সংস্কার : ত্রি সইন্ধ্যা, পতাকাল আর দুইপর সময় কুনুখান (অ) যাইত পারে না।
[অতি প্রত্যূষে, সন্ধ্যায় এবং ভর দুপুরে বাইরে যেতে নেই।]

মনুসংহিতা : নাতি কল্যং নাতি সায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।
নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেল্লোকো ন বৃষলৈঃ সহ।। (৪/১৪০)

অনুবাদ : অতি প্রত্যূষে, সন্ধ্যাকালে ও পূর্ণ দুই প্রহরে বা অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত কোথাও যাইবে না, অথবা একাকী কিম্বা নীচ শূদ্রাদি অজ্ঞলোকের সহিত কোথাও যাইবে না।

২০. স্থানীয় সংস্কার : অশুচি অবস্থায় গরু ঘর (অ) যাইত পারে না।
[অশুচি অবস্থায় গরুকে স্পর্শ করা বা গোয়াল ঘরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।]

মনুসংহিতা : ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্র গৌরানলান।
ন চাপি পশ্যেদশুচিঃ সুস্থো জ্যোতিগণাদ্ দিবি।। (৪/১৪২)

অনুবাদ : উচ্ছিষ্ট শরীরে বা অশুচি অবস্থায় হস্তদ্বারা গাভী ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে না এবং অসুস্থ শরীরে বা অশুচি অবস্থায় আকাশস্থ জ্যোতিষ্ককে দেখিতে নাই।

২১. স্থানীয় সংস্কার : বারোটার আগে দেপতা পূজা শেষ করি লওয়া লাগে।
[দুপুর বারোটার আগেই দেবতা পূজা শেষ করে ফেলতে হয়।]

মনুসংহিতা : পূর্ব্বাহ্নে এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্। (৪/১৫২)

অনুবাদ : দেবতাদিগের পূজা পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ রাত্রিশেষ ও দিনের পূর্ব্বভাগের মধ্যে করা উচিত।

২২. স্থানীয় সংস্কার : কুকুর ঘর (অ) ঢুকলে ঘর সাফ করা লাগে। [কুকুর রান্নাঘরে ঢুকলে বাসন পত্র ধুয়ে ঘর পরিষ্কার করতে হয়।]

মনুসংহিতা : ভ্রূণহাবেক্ষিতঞ্চৈব সংপৃষ্ঠঞ্চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণা বলীটুঞ্চ শুনা সংপৃষ্ঠমেব চ।। (৪/২০৮)

অনুবাদ : ভ্রূণঘাতি কর্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ঋতুমতী নারী কর্তৃক সংস্পৃষ্ট অন্ন, পক্ষীগণ কর্তৃক অবলীঢ় অন্ন এবং কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন কখনো ভোজন করিবে না।

২৩. স্থানীয় সংস্কার : উছিৎ পাত (অ) খাইত পারে না।
[উচ্ছিষ্ট খাবার বা অন্যের থালায় বা এঁটো জায়গায় খেতে নেই।]

মনুসংহিতা : শুক্তং পর্য্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ।। (৪/২১১)

অনুবাদ : শুক্ত, পর্য্যুষিত অর্থাৎ রাত্রিবাসিত দ্রব্য; শূদ্রের অন্ন এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইবে না।

২৪. স্থানীয় সংস্কার : বাবনে পিয়াইজ রসুন খাইত পারে না।
[পেঁয়াজ ও রসুন ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য।]

মনুসংহিতা : লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলায়ুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামেধ্য প্রভবাণি চ।। (৫/৫)

অনুবাদ : লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, কবক ও বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত দ্রব্যাদি,- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে।

২৫. স্থানীয় সংস্কার : শবানুগমনের পর স্নান করে অগ্নি স্পর্শ করে গৃহে প্রবেশ করতে হয় এবং ঘি ভাত খেতে হয়।

মনুসংহিতা : অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্টাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি।। (৫/১০৩)

অনুবাদ : জ্ঞাতি হউক বা অন্যই হউক স্নেহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক শবের অনুগমন করিলে, বস্ত্র সমেত স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শ পূর্ব্বক ঘৃতভোজন করিলে বিশুদ্ধ হইবে।

* মনুসংহিতার শ্লোক এবং অনুবাদ অংশ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মনুসংহিতা [সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৯৭] গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

[ক্রীতদাস সংক্রান্ত দলিলের মূল পাঠ]

শ্রীকৃষ্ণরাম দেব চৌধুরী

সাক্ষি
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দেব মজুমদার
সাকীন ফুলবাড়ি

সাক্ষি
শ্রীপ্রেমলুচন দাস ন্য
সাকীন ফুলবাড়ি

ইং শ্রীজিতরাম সর্ম্মা ও শ্রীরতিকান্ত সর্ম্মা অলদে কেবলরাম সর্ম্মা সাকিন পরগনা বিক্রমপুর মৌজে বিহাড়া W দাস এবু লিকিতং শ্রীকৃষ্ণরাম দেব চৌং ওলদে জ্ঞএরাম দেব চৌং সাকীন পরগণে ফুলবাড়ি মৌজে নিজফুলবাড়ি W মনিস্ব বিক্রি কেব..পাটা পত্র মীদং কার্যঞ্চ আগে আমার খরিদা মনিস্ব মছমতে চন্দ্র..নী উমমর আন্দাজি ১৬ সুল বৎর্স্বর ও মছমতে য়মবাদাসী উমমর আ..জি ১২ বার বৎস্বর উহারা দুইজনা কনিজনে তুমার ইথান থাকার রাজি হয়াতে আমার সইছা পূর্ব্বক বিনা জবদস্তিএ ছাবিদ আক্যান তুমার পাস বিক্রি করিলাম ও মছমতে মোজঙ্গবানে যজএ... আমার খরিদাকে যাদা লিক্ষিত মতে মবলগ ৬০৲ সাইট টাকা সীকক্যা তুমার পাস হৈতে নোগদ সমঝি লৈয়া তুমার স্তানে বিক্রি করিলাম মছমতে মজঙ্গবান তুমা.. তুমার আপন খেদমতে হামেসা হাজির..কিআ...মার হুক্কুমতে কর্ম্ম ইঞ্জাম করিবেক উহারার উপর... য় আমা ... সন্তানাদির সত্ব পরিত্বাগ তুমি য় তুমার সন্তানাদির সত্ব করিয়া দিলাম ও মছমতে মজঙ্গবানেরদিগের সন্তানাদির উপর আমী য় আমার সন্তানাদি ক্রমে কেয় দাবি করে দাবি খিলাপ এতে ধর্ম্মে মনিস্ব বিক্রি পাটা ও কবজ উয়াসীন পাত্রা লিক্কিআ দিলাম ইতি সন ১২৩৭ সার্ল বাঙ্গালা

১০ চৈত্র

সাক্ষি
শ্রীমহাদেব শর্ম্মা
সাংবিক্রমপুর

সাক্ষি
শ্রীযুগলকৃষ্ণ শর্ম্মা
সাং তথা মৌজা বিহাড়া

সাক্ষি
শ্রীপরমানন্দ দাস

হরিপদ চক্রবর্তী

ভাটেরা তাম্রশাসন ঃ সাহিত্য-বিচার ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

।। এক ।।

বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বরাক-সুরমা বিধৌত উপত্যকার প্রাচীন নামছিল শ্রীহট্ট মণ্ডল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে শ্রীহট্ট মণ্ডলকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। তবে এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় খৃষ্টীয় একাদশ শতকে শ্রীহট্ট সার্বভৌম রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের পাঁচটি রাজকীয় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পাঁচটি তাম্রশাসন হলো ঃ

(১) কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা প্রদত্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নিধনপুর তাম্রশাসন, আবিষ্কার-কাল ১৯১২ খৃষ্টাব্দ;

(২) সমতটের সামন্তরাজ মরুগুনাথ প্রদত্ত সপ্তম শতাব্দীর কালাপুর তাম্রশাসন, আবিষ্কার-কাল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ;

(৩) বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্র প্রদত্ত দশম শতাব্দীর পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন, আবিষ্কার-কাল ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ;

(৪) শ্রীহট্ট-রাজ গোবিন্দ-কেশবদেব প্রদত্ত ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসন এবং

(৫) গোবিন্দ-কেশবদেবের পুত্র ঈশানদেব প্রদত্ত ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসন। ভাটেরা তাম্রশাসন দুটি একত্র একসঙ্গে আবিষ্কৃত, আবিষ্কার-কাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত পাঁচটি তাম্রশাসনের মধ্যে বর্তমান নিবন্ধে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে শেষোক্ত ভাটেরা তাম্রশাসন দুটির উপর ; কেননা, ভাটেরা তাম্রশাসন দুটি এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস চর্চার যেমন এক অমূল্য সম্পদ, তেমনি এ অঞ্চলের সংস্কৃত সাহিত্যচর্চারও তা এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

শ্রীহট্ট রাজ্যের একছত্র অধিপতি মহারাজ গোবিন্দকেশব ইষ্টদেবতা বটেশ্বর নামধারী শিবের উদ্দেশ্যে ৩৭৫ হাল ভূমি ও নানা জনজাতীয় পরিজন সহ ২৯৬টি বাড়ী উৎসর্গ করেছিলেন। ভাটেরায় আবিষ্কৃত প্রথম তাম্রশাসনটি সেই উৎসর্গীকৃত ভূমির দানপত্র (দলিল)। কেশবদেব প্রদত্ত ভূমি বরাক-সুরমা উপত্যকার ৬৪টি বিভিন্ন গ্রামে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া তাম্রশাসনে বলা হয়েছে কেশবদেব অন্যান্য রাজাদের অপসারণ করে পূর্বদেশীয় রাজাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এতে বুঝা যায়, সমস্ত বরাক-সুরমা উপত্যকা কেশবদেবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গোবিন্দ-কেশব দেবের পুত্র মহারাজ ঈশানদেব এক অভ্রভেদী বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের আক্ষপটলিক (keeper of records or

archives) বৈদ্যবংশীয় বনমালি করের অনুরোধে, কেশবদেবের স্থবির, অপুত্রক জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুমতিক্রমে, এবং কুলপালিকা রাণীমাতা ও তাঁর শিশুপুত্রের সমর্থনে বসত বাড়ী ও ঝরনা শোভিত দুই-হাল ভূমি দান করেছিলেন। ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসন সেই দানকৃত ভূমির দলিল।

দানপত্র রচনাকে কেন্দ্র করে ভাটেরা তাম্রশাসন দুটির রচয়িতারা দেব-রাজবংশের যে প্রশস্তি কীর্তন করেছেন, তা এ অঞ্চলের সংস্কৃত কাব্য অনুশীলনের এক অমূল্য নিদর্শন। অন্যান্য তাম্রশাসনের মতো এখানেও ঐতিহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে কাব্যের সৌন্দর্যছায়ায়। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ড. জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য ঃ

> 'The two inscriptions provide us with some basic information for the purpose of historical research. They no doubt contain a good deal of poetical imagination and attempt at glorifying the reigning monarch and his predecessors, like any ancient text, which should be scrutinised before use.'[১]

ভাটেরা তাম্রশাসনের কাব্যসৌন্দর্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও আজ পর্যন্ত এ দুটি প্রশস্তির কোনো সাহিত্যিক মূল্যায়ন আমাদের চোখে পড়েনি। এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। বরাক-সুরমা উপত্যকায় সে সময়ে সাহিত্য-সৃষ্টির গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের জন্য ভাটেরা তাম্রশাসন দুটির সাহিত্যিক মূল্যায়ন এবং সাহিত্যরচনা ধারায় যে ঐতিহাসিক পরম্পরা প্রতিফলিত হয়েছে তার উদঘাটনই এই নিবন্ধের বিষয়।

।। দুই ।।

গোবিন্দ-কেশবদেব প্রদত্ত ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসনে সর্বমোট ৫৫টি পঙ্ক্তি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পঙক্তি থেকে ২৯ নং পঙক্তি জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ছন্দে লিখিত ২০ টি পদ্য। এই পদ্যাংশে রয়েছে দেব-রাজবংশের রাজাদের প্রশস্তি। ৩০ নং পঙ্ক্তি থেকে ৫৩ নং অর্দ্ধপঙ্ক্তি জুড়ে আছে দানকৃত ভূমির, বাড়ীর ও গৃহের বিবরণ। ৫৩ নং অর্দ্ধপঙ্ক্তি থেকে ৫৫ নং অর্দ্ধপঙ্ক্তি জুড়ে আবার আছে দুটি শ্লোক। এই শ্লোক দুটিতে রয়েছে ভূমিদানের প্রশংসা এবং ভূমির অপহরণকারীর উপর অভিসম্পাত। অন্যান্য তাম্রশাসনের মতো এই শ্লোক দুটি বৃহস্পতি-সংহিতা থেকে উদ্ধৃত। শাসনের পাঠ শেষ হয়েছে শাসন প্রদানের কাল-জ্ঞাপক 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' শব্দের ডানদিকে কালনির্ণায়ক চারটি অঙ্ক দিয়ে। এই অঙ্কগুলি সুস্পষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

ঈশানদেব প্রদত্ত ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনে সর্বমোট ৩১ টি পঙ্ক্তি আছে। এই ৩১টি পঙ্ক্তি জুড়ে রয়েছে ২১ টি পদ্য। এখানেও রয়েছে এই রাজবংশের রাজাদের প্রশস্তি, ভূমিদানের বিষয়, সমর্থকদের বিবরণ এবং ভূমির অপহরণকারীর উপর অভিসম্পাত। তবে এখানে শাসন-রচয়িতা মাধবদাসের নামের উল্লেখ রয়েছে। শাসনের পাঠ শেষ হয়েছে শাসন প্রদানের তারিখ 'সং ১৭ বৈশাখ দিনে ১' দিয়ে।

।। তিন ।।

দীর্ঘদিন ভূগর্ভে থাকার ফলে ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসনের 'পাণ্ডবকুলাদি পালাব্দে'র কালজ্ঞাপক চারটি অঙ্ক অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন পাঠোদ্ধারকারী এই চারটি অঙ্কের বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করেছেন। এইজন্য ভাটেরা তাম্রশাসনের কালনির্ণয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তবে 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' শব্দটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা যায় না। প্রত্যেকেই 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' বলতে যুধিষ্ঠিরাব্দ মনে করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক থেকে এই অব্দের গণনা শুরু হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন যুধিষ্ঠিরাব্দ থেকেই কলি-অব্দের সূচনা। এইজন্য যুধিষ্ঠিরাব্দকে কল্যব্দও বলা হয়ে থাকে। সেই গণনা অনুসারে এখন অর্থাৎ ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে ১০৯৫ কল্যব্দ। কল্যব্দের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য ৩১০০ (১০৯৫—১৯৯৫) বৎসর। অর্থাৎ ৩১০১ খৃষ্টপূর্বাব্দে কল্যব্দের বা যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ।[২]

(১) ভাটেরা তাম্রশাসনের প্রথম পাঠোদ্ধারকারী মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর পাঠ অনুসারে শাসন-প্রদানের কাল ২৯২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ[৩] (অর্থাৎ ৩১০২-২৯২৮=১৭৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ)।

(২) তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পাঠোদ্ধারকারী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাঠ অনুযায়ী শাসন-প্রদানের কাল ৪৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ[৪] (অর্থাৎ ৪৩২৮-৩১০২=১২২৬ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র খৃষ্টাব্দের হিসেবে উল্লিখিত যুধিষ্ঠিরাব্দকে ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫]

(৩) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত রচয়িতা অচ্যুতচরণ চৌধুরীর পাঠ অনুযায়ী শাসন-প্রদানের কাল ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ[৬] (অর্থাৎ ৩১০২-২৩২৮=৭৭৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ)।

(৪) ডঃ কিশোরীমোহন গুপ্তের পাঠ অনুযায়ী শাসন-প্রদানের কাল ৪১৫১ যুধিষ্ঠিরাব্দ[৭] (অর্থাৎ ৪১৫১-৩১০২=১০৪৯ খৃষ্টাব্দ)। ড. গুপ্ত উল্লিখিত যুধিষ্ঠিরাব্দকে ১০৪৯ খৃষ্টাব্দই বলেছেন।[৮]

(৫) 'Copper Plates of Sylhet' গ্রন্থের সম্পাদক কমলাকান্ত গুপ্তের পাঠ অনুযায়ী শাসন-প্রদানের কাল ৪১৫৯ যুধিষ্ঠিরাব্দ[৯] (অর্থাৎ ৪১৫৯-৩১০২=১০৫৭ খৃষ্টাব্দ)। কমলাকান্ত গুপ্ত উল্লিখিত যুধিষ্ঠিরাব্দকে ১০৫৭ খৃষ্টাব্দ বলেই সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন।[১০]

এই মতগুলোর মধ্যে যারা শাসন প্রদানের কালকে প্রাকখৃষ্টীয় বলতে চান, তাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ শাসন রচনার ধরণ, শিল্পরীতি, ভাষা প্রভৃতি দেখে মনে হয় সেটা সুবন্ধু (খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী), বাণভট্ট (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী) প্রভৃতি গদ্যকারদের পরবর্তী। শাসনে খোদিত অক্ষরগুলো দেখে মনে হয় সেগুলো বঙলিপির খুব কাছাকাছি। এইজন্য নগেন্দ্রনাথ বসু শাসনের অক্ষরগুলোকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষরের অনুরূপ মনে করেন।[১১] কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার তাম্রশাসনে খোদিত অক্ষরগুলোর ধরণ দেখে বলতে চান সেগুলো খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরের অনুরূপ।[১২] রাজেন্দ্রলাল মিত্র গোবিন্দকেশব ও শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়গোবিন্দকে এক ব্যক্তি মনে করেন এবং বলেন ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহজালালের শ্রীহট্ট অধিকারের সময় গোবিন্দকেশব শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন এবং তিনি শাহজালালের হাতে পরাস্ত হন।[১৩] তাছাড়া তিনি মনে করেন দেব বংশের রাজারা কাছাড়ের ঘটোৎকচ বংশীয় ছিলেন।[১৪] তবে W.W Hunter-এর মতে শাহজালাল ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে আসেন।[১৫] এবং আধুনিক

ঐতিহাসিকরা এই মত পোষণ করেন যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ে ঘটোৎকচ বংশীয় রাজবংশের অস্তিত্বই ছিল না। ১৬ সুতরাং যে দুটি তথ্যের উপর নির্ভর করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভাটেরা তাম্রশাসনের সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন সেই দুটি তথ্যেরই ভিত্তি দুর্বল থাকায় তাঁর সময় নিরুপণ পণ্ডিতেরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। ১৭ কিশোরীমোহন গুপ্ত ও কমলাকান্ত গুপ্ত প্রদত্ত শাসন-প্রদানের সময়ের মধ্যে তফাৎটা খুব কম, মাত্র ৮ বৎসর। উভয় পণ্ডিতই মনে করেন ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রদান করা হয়েছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও এই মত সমর্থন করেন।[১৮] তাছাড়া, পশ্চিমভাগ শাসনপ্রদাতা শ্রীচন্দ্রের সময় শ্রীহট্ট পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। শ্রীচন্দ্র ৯২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[১৯] সুতরাং আমাদের মনে হয় শ্রীচন্দ্রের রাজত্বের অব্যবহিত পরে নবগীব্বাণের সময় সার্বভৌম রাজ্যরূপে শ্রীহট্টের অভ্যুত্থান ঘটে। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে নবগীব্বাণের রাজত্ব আরম্ভ হয় ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে বা তার সামান্য পরে। নবগীব্বাণ থেকে কেশবদেব পর্যন্ত যদি ৮০/৯০ বৎসর ধরা যায়, তাহলে কেশবদেবের রাজত্ব ১০৫৫ এবং ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়ে যায়। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় ঐ সময়ের মধ্যে শাসন-প্রদান করা হয়েছিল।

ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনের তারিখ দেয়া আছে 'সং ১৭ বৈশাখ দিনে ১'। সং শব্দটিকে সংবৎ মনে করে অনেকে শাসনের কাল নিরুপণ করতে চেষ্টা করেছেন।[২০] পণ্ডিতদের মতে 'সং' শব্দের অর্থ সংবৎসর। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে ঈশানদেব প্রদত্ত ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসন ঈশানদেবের নিজ রাজত্বের ১৭ তম বৎসরের ১লা বৈশাখ প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ কেশবদেবের তাম্রশাসন খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রদান করা হয়েছিল এবং ঈশানদেবের তাম্রশাসন একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রদান করা হয়েছিল।

।। চার ।।

ভাটেরার দুটি তাম্রশাসনই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তবে দু' একটি বানানে আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা বানানে বা উচ্চারণে যেমন বর্গীয় 'ব'-এবং অন্তঃস্থ 'ব'-এর তফাৎ মানা হয় না, তেমনি এখানেও এই দুটি 'ব'-কারের পার্থক্য মানা হয় নি, যেমনটি সংস্কৃতে মানা হয়। রেফের অব্যবহিত পূর্বের বর্ণ প্রায়ই অভ্যস্ত (reduplicated) হয়েছে। যেমন—নবগীর্ব্বাণ, উর্ব্বী, কার্ম্মুক প্রভৃতি। তবে বানানের এই বৈশিষ্ট্য বঙ্গদেশের তাম্রশাসনে, কামরূপের তাম্রশাসনে এমন কি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—উর্ব্বশ্যা, বর্ম্মণঃ (ভোজবর্ম্মার বেলাব-তাম্রশাসন), পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র ইত্যাদি (শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন) অর্কদ্যুতি, সার্বভৌম ইত্যাদি (লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন) নির্জ্জিত, উর্ব্বী ইত্যাদি (রত্নপালের বড়গাঁও তাম্রশাসন) সর্ব্বদক্ষিণাপথ, চন্দ্রবর্ম্মা ইত্যাদি (এলাহাবাদ প্রশস্তি)। 'শ্রীহট্ট' বানানে 'র'-ফলা ও দীর্ঘ ঈকারের পরিবর্তে শুধু 'ঋ'-কার ব্যবহৃত হয়েছে, লেখা হয়েছে 'শৃহট্ট'।

প্রথম তাম্রশাসনে ভূমির বিবরণে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। ভূমির পরিমাপ বোঝাতে ভূহল, হল, ভূকেদার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত হল শব্দের অর্থ লাঙ্গল, যেমন হলধর; কেদার শব্দের অর্থ ক্ষেত্র (কেদারোহি দ্বৌ শিবে ক্ষেত্রে'-মেদিনী-কোষ) যেমন—'দৃশ্যমানবহুব্রীহয়ঃ কেদারাঃ'। বরাক-সুরমা উপত্যকায় ভূমির পরিমাপক সংজ্ঞা হিসেবে হল>হাল, কেদার>কেয়ার শব্দ দুটি এখনো প্রচলিত।

তাম্রশাসনে কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলো সংস্কৃত শব্দ থেকেই এসেছে, যেমন—গোবাট (সংস্কৃত গোপথ)। পাশাপাশি অবশ্য গোপথ শব্দটির ব্যবহারও দেখা যায়। তাছাড়া রয়েছে বন্ধ (বিস্তীর্ণ প্রান্তর), গাঙ্গ (নদী)প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার। সংস্কৃত গাঙ্গ শব্দের অর্থ গঙ্গা থেকে জাত অথবা গঙ্গার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (গাঙ্গস্ত গঙ্গাসম্ভূতে-মেদিনী কোষ, যেমন গাঙ্গেয়)। তবে পাশাপাশি নদী শব্দের প্রয়োগও তাম্রশাসনে দেখা যায়, যেমন—কালিয়ানী নদী, ধামায়ি নদী ইত্যাদি।

অকারান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নরূপে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যেমন—বড়গামে, সিংহডরে ইত্যাদি। কিন্তু অকারান্ত শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নরূপে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যেমন—ইটাখালাকে, আড়ালকান্দিকে, চেঙ্গচ্ছুড়ীকে ইত্যাদি।

শাসনের ৫২ নং পঙ্‌ক্তি ও ৫৩ নং অর্দ্ধপঙ্‌ক্তি ভাষা বুঝা যায় না। কমলাকান্ত গুপ্ত এখানে শ্রীহট্টীয় উপভাষার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে বলে সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন।[২১] বক্তব্যের সপক্ষে তাঁর যুক্তি হলো যে দ্বিতীয় তাম্রশাসন রচয়িতা মাধবদাস ওড়িয়ার ব্রাহ্মণ ছিলেন, মেদিনীপুর ও মেদিনীপুর সংলগ্ন ওড়িয়ায় ব্রাহ্মণদের দাস উপাধি দেখা যায়। দুটি তাম্রশাসনের রচয়িতাই ওড়িয়ার ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে এই দেড় পঙ্‌ক্তিতে ওড়িয়া ভাষার প্রভাব থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখানে শ্রীহট্টের অন্য কোন উপভাষারও প্রভাব থাকতে পারে। তবে বিষয়টি আরো অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

।। পাঁচ ।।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দানপত্র রচনার যে রীতি প্রচলিত ছিল[২২] ভাটেরা তাম্রশাসনের রচয়িতারা সেই রীতিতেই তাম্রশাসন রচনা করেছেন। ভাটেরার দুটি তাম্রশাসনের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) ইষ্টদেবতার বন্দনা ও রাজবংশের আদিপুরুষের বন্দনার মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ,
(২) পৃষ্ঠপোষক রাজা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রশস্তি,
(৩) দানপত্রের মূল বিষয় বর্ণনা এবং
(৪) ভূমিদানের প্রশংসা, ভূমির অপহরণকারীর উপর অভিসম্পাত এবং দানপত্র প্রদানের তারিখ।

ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসন আরম্ভ হয়েছে ইষ্টদেবতা শিবের স্তুতি দিয়ে মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে। তারপর আছে চন্দ্রের বন্দনা। চন্দ্রকে এই রাজবংশের আদিপুরুষ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলাচরণের পর এই রাজবংশের চারজন রাজার বর্ণনা রয়েছে। তাঁরা হলেন

কেশবদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ নবগীব্বাণ, পিতামহ গোবিন্দদেব (অথবা গোকুলদেব), পিতা নারায়ণদেব এবং শাসন প্রদাতা মহারাজ কেশবদেব। এর মধ্যে প্রথম তিনজন রাজার শৌর্য-বীর্য সংক্ষেপে বর্ণনা করে মহারাজ কেশবদেবের শৌর্য-বীর্য ও যশোরাশির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাজাদের প্রশস্তি কীর্তনই তাম্রশাসনে কাব্যাংশের প্রতিপাদ্য বিষয়।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন ভগবান নারায়ণ ও চন্দ্রের বন্দনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এখানেও চন্দ্রকে এই রাজবংশের আদিপুরুষ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তাম্রশাসনেও চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই রাজারা হলেন ঈশানদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারায়ণদেব, পিতামহ গোবিন্দদেব (অথবা গোকুলদেব), পিতা কেশবদেব এবং শাসনপ্রদাতা ঈশানদেব। তবে কেশবদেবের বর্ণনাই তাম্রশাসনে স্থান নিয়েছে বেশী।

।। ছয় ।।

ভাটেরা তাম্রশাসনের কবি যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে এই শাসন রচয়িতাকে যে কোন প্রথম সারির কবির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাম্রশাসনে কাব্যাংশের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুললিত পদবিন্যাসে মাধুর্যময়। কবির রচনাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অযথা দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার নেই, বাক্যের অন্বয়বোধে কষ্টকল্পনা করতে হয় না। আচার্য কুন্তক আদর্শ রচনারীতি (poetic style) বৈচিত্র্যমার্গের যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন,[২৩] যেমন—মাধুর্য, প্রসাদ, লাবণ্য, আভিজাত্য ইত্যাদি তার সব ক'টি পূর্ণমাত্রায় এই কবির রচনায় উপস্থিত। কবি-কল্পনার অভিব্যক্তির মধ্যেই অলংকারের তাৎপর্য নিহিত। তাই তাম্রশাসনে অলংকারের যথার্থ প্রয়োগের মধ্যে কবির শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আরো লক্ষণীয় যে অলংকারের চাপে রচয়িতার বক্তব্য আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি, বরং অলংকরণ বক্তব্যকে আরো সুন্দর ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে।

কবি শব্দালংকার ও অর্থালংকার এই দুই জাতীয় অলংকারকেই সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। শব্দালংকারের প্রয়োগে কাব্যে এসেছে সঙ্গীতধর্মিতা এবং অর্থালংকারের দ্বারা চিত্র ফুটে উঠেছে। শব্দালংকারের দুই একটা উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। যেমন,

অথ বিশ্রুত প্রভাবঃ প্রভাবঃ প্রভবঃ শৃম্পরাজ্যকমলায়াঃ।
সমজনি নবগীব্বাণঃ স্বরবাণঃ ক্ষ্মাভৃজাং শ্রেষ্ঠঃ।। (শ্লোক ৪)

এই পদ্যে সঙ্গীতধর্মিতা এসেছে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে। কখনও বা কবি পদ্যে প্রত্যেক চরণের অন্তমিল দিয়ে কাব্যে ধ্বনিমাধুর্য আনতে চেয়েছেন। যেমন,

ক্ষোণীভুজা যুগপদাহবসঙ্গতেন
তেনোন্নতদ্বয়মনামি গুণদ্বয়েন।
একেন কামুকমসীমমহঃ প্রকর্ষ—
গম্যান বৈরিনিবহঃ সহসাপরেণ।। (শ্লোক ১৫)

তবে এখানে তৃতীয় চরণের শেষে ধ্বনিসাম্য বজায় না থাকায় ছন্দপতন ঘটেছে এবং 'হতবৃত্ততা' নামক কাব্যদোষ ঘটেছে।

কবির বক্তব্য উপমা, রূপক, উল্লেখ, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলংকারের দ্বারা মূর্ত হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত এই অলংকারগুলোর সব ক'টির মূলে রয়েছে এক অভিনব সাদৃশ্যচেতনা। তাই গূঢ়ার্থে এরা উপমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ক্রমবিবর্তনের ফলে উপমা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়ে রূপক, উল্লেখ ইত্যাদি নাম ধারণ করেছে। বক্তব্য উপস্থাপনে উপমা নির্ভরতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তুলনার মাধ্যমে বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার তাগিদেই উপমার উদ্ভব হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. গোণ্ডার অভিমতটি স্মরণ করা যেতে পারে।

> That similer are not late phenomena in the history of human language, we learn from the fact that we are accustomed to look upon abstract ideas as similar to things we perceive with our sense organs, and that it is the first place people who have no trained way of thinking that are accustomed to do so. Naive and 'Primitive' men who are scarcely able to abstract, are inclined to name new things after the familiar and to compare things unknown to well known. By means of a 'simile' they bring the unknown within the sphere of the known.[২৪]

ভাটেরা তাম্রশাসনে কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় অভিনব সাদৃশ্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে উপমান-আহরণে এবং নূতন অপ্রস্তুত যোজনায়। এতে কবির ভাবজগৎ হয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট, মূর্ত এবং ব্যঞ্জনাময়। সাদৃশ্য অবলোকনের মধ্য দিয়ে লেখকের অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের মধ্যে এসেছে এক অভিনব সমীকরণ, সৃষ্টি হয়েছে এক অভিনব সৌন্দর্যলোক।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত এই রাজবংশের প্রথম রাজার নাম নবগীর্ব্বাণ। তিনি ছিলেন—

'প্রভবঃ শৃম্পরাজ্যকমলায়াঃ' (শ্লোক ৪)
[শৃম্পরাজ্য-লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থল]

ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীহট্টরাজ্যের অভেদ কল্পনা করে কবি ব্যঞ্জনার দ্বারা বুঝাতে চাইলেন শ্রীহট্টরাজ্য ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী ছিল এবং মহারাজ নবগীর্ব্বাণ শ্রীহট্টরাজ্যের উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং বলা যায় নবগীর্ব্বাণদেবের সময় শ্রীহট্ট সার্বভৌম রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অলংকার এখানে রূপক।

কবি-ব্যবহৃত উপমাগুলোর অধিকাংশ উপমানই চয়ন করা হয়েছে পুরাণ কাহিনী থেকে। সমুদ্র মন্থনের কাহিনীটি মনে হয় কবির খুব প্রিয়, তা দিয়ে নির্মাণ করলেন একটি সুন্দর উপমা। সেই উপমাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলল দু'টি রূপক। রূপকেও এল সমুদ্র মন্থনের কাহিনী বিষয়ী (উপমান) হয়ে :

তস্মাদমন্দভুজমন্দরমথ্যমান—
প্রত্যর্থিপার্থিবসমুদ্রসমুদ্ধতশ্রীঃ।

নারায়ণোজনি মহীপতিবদ্ধকারী
যেন স্ফুটঃ স ভগবান শ্রিতনন্দাকন ।। (শ্লোক ৬)

[তাঁর (অর্থাৎ গোবিন্দদেব) থেকে নারায়ণের জন্ম হয়েছিল, যিনি সুন্দর ভুজমন্দরদ্বারা প্রতিদ্বন্দী রাজসমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন, যেভাবে ভগবান নারায়ণ মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্রকে মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। প্রজানুরঞ্জক এই নরপতি ভগবান নারায়ণের তুল্য ছিলেন।]

ভগবান নারায়ণের সঙ্গে মহারাজ নারায়ণদেবের তুলনা করা হয়েছে 'শৌর্য-বীর্য-সম্পন্ন' এই সাধারণধর্মের ভিত্তিতে। অর্থাৎ শৌর্য-বীর্যে মহারাজ নারায়ণদেব ছিলেন ভগবান নারায়ণের মতো। তাই সাগরের মতো প্রতিদ্বন্দী রাজারা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লে নারায়ণদেব তাদের পরাস্ত করে লক্ষ্মীকে অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করে প্রজাদের আনন্দবিধান করেছিলেন। মন্দর পর্বতের সঙ্গে বাহুর অভেদ কল্পনা, বিক্ষুব্ধ সাগরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দী রাজাদের অভেদ কল্পনার কারণ। সুতরাং এই পরম্পরিত রূপক অলংকার উপমার দ্যুতিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাছাড়া, এখানে অনুনাসিক **'ম'**বর্ণের একাধিক প্রয়োগ এবং 'মন্দ মন্দ' 'সমু সমু' পদের বৃত্তিতে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে বাক্যে পদলালিত্য এসেছে।

সমুদ্রমন্থনের প্রাচীন বার্তা এনে কবি এটাই বুঝাতে চাইলেন যে নারায়ণদেবের রাজত্বকালে অথবা তাঁর সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পূর্বে বহিঃশত্রুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীহট্টরাজ্য অধিকার করতে চেষ্টা করেছিল অথবা অধিকার করে নিয়েছিল, কিন্তু নারায়ণদেব শত্রুদের প্রতিহত করে রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন।

মহাভারতের শিশুপালবধ ও ভাগবতের কংসবধের কাহিনী নিয়ে কবি আমাদের আরও একটি উপমা উপহার দিলেন :

দুর্দশৈ সমুদ্ধতক্ষিতিভৃতা সংরক্ষ্য গোমণ্ডলং
সদ্ধাবনমাদরেণ বিদধচ্ছন্দকংদৎসবম্।
শ্রীমৎ কেশবদেব এষ নিয়তং চত্রেহবশেষং রুষা
যত্রৈকং শিশুপালমপ্যরিকুলে ক্ষিপ্তারিচক্রো নৃপঃ।। (শ্লোক ৯)

[মহারাজ কেশবদেব শত্রুরাজেদের বিনাশকারী দুর্দান্ত হস্তে পৃথিবী (গো) রক্ষা করে শ্রদ্ধা-সহকারে দীর্ঘকাল বিলুপ্ত বৈষ্ণব উৎসবের পুনরুজ্জীবন বিধান করেন এবং ক্রোধভরে শত্রুমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে শত্রুকুলের মধ্যে একমাত্র শিশুপালকে অবশিষ্ট রেখেছিলেন। (যেভাবে) শ্রীকৃষ্ণ পর্বত (গোবর্ধন পর্বত) উত্তোলনকারী হস্তদ্বারা গো-সমূহকে রক্ষা করে স্নেহবশতঃ বৃন্দাবনকে কংসের উৎসব (অর্থাৎ নিপীড়ন) থেকে মুক্ত করেন এবং ক্রোধভরে চক্র পরিচালনা করে শত্রুকুলের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট শিশুপালকে বধ করেছিলেন।]

অপ্রকরণিক কৃষ্ণের সঙ্গে প্রাকরণিক কেশবদেবের তুলনা শ্লিষ্ট পদাবলীর (pun)মাধ্যমে এসেছে। কিন্তু প্রাকরণিক কেশবদেবের বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। সুতরাং আলংকারিক পরিভাষায় এখানে শব্দশক্তিমূল-উপমাধ্বনি। তাছাড়া, কেশবদেব শৈব হলেও বৈষ্ণবদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

ছিলেন তা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পাচ্ছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনে। সেখানে বলা হয়েছে কেশবদেব কংসনিসূদনের এক অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কেশবদেবের পূর্বে অথবা শ্রীহট্ট সার্বভৌম রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অনুশীলনে সম্ভবত: কিছু ভাটা পড়েছিল। ভাটা পড়াটা স্বাভাবিক, কারণ দেব-রাজবংশ শ্রীহট্টে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। শ্রীহট্ট সম্ভবত: তখন বিক্রমপুরের বৌদ্ধধমাবলম্বী চন্দ্র রাজাদের অধীনে ছিল। কেশবদেবের সিংহাসন আরোহণের পর শ্রীহট্টে আবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন লাভ করে। 'সদ্ধাবনমাদরেণ বিদধদ্ অচ্ছন্দকং সোৎসবম্' বাক্যাংশের দ্বারা সম্ভবত: কবি সেটা বুঝাতে চেয়েছেন।

কবি সমাজে প্রচলিত নানা প্রসিদ্ধি (Poetic convention) অপরিবর্তিত রূপে কবিদের রচনায় স্থান পেয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার কবি প্রসিদ্ধির একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে কবিপ্রসিদ্ধিতে আকাশ ও পাপের রং কালো; যশ, হাসি ও কীর্তির রং সাদা; ক্রোধ ও অনুরাগের রং লাল। সমুদ্র ও নদীতে পদ্ম ও কুমুদ জন্মে;সূর্যোদয়ে পদ্ম ও চন্দ্রোদয়ে কুমুদ বিকশিত হয়। [২৫]

ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসনের রচয়িতা কবিপ্রসিদ্ধি ভিত্তি করে কয়েকটি রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। যেমন,

করোতি ধবলং জগৎ বিনয়তেহরিপদ্মোদ্গমং
তনোতি কুমুদং যশঃ সদৃশমস্য চন্দ্রোজ্জ্বলম্।
সিতং কিমথ রঞ্জকম ভ্রমদনারতং কিং স্থিরং
সকারণমিদঞ্চ সত কিমিব নিত্যমিত্যদ্ভুতম্।। (শ্লোক ১৩)

[তাঁর (কেশবদেবের) চন্দ্রের মত উজ্জ্বল যশ জগৎকে শুভ্র করে শত্রুরূপ পদ্মের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং জগতের আনন্দরূপ কুমুদকে বিকশিত করে। শুভ্র হয়েও সেটা কিভাবে রঞ্জক (অর্থাৎ লাল রং ছড়ায়), অনবরত ভ্রমণ করেও সেটা কিভাবে স্থির, কারণযুক্ত হয়েও সেটা কিভাবে নিত্য (অর্থাৎ শাশ্বত, কারণহীন), এটা আশ্চর্যের (বিষয়)।]

কবি নিরাকার যশকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে মূর্ত করে তুললেন। চন্দ্রোদয়ে পদ্ম মুকুলিত হয়। শত্রুকে পদ্মের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে বলতে চাইলেন রাজার যশোবিস্তারের ফলে তাঁর শত্রুদের বিকাশ বা অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। চন্দ্রোদয়ে কুমুদ বিকশিত হয়। পৃথিবীর (কু) আনন্দকে (মুদ) কুমুদের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে কবি বুঝাতে চাইলেন রাজার যশে পৃথিবীর আনন্দ বর্ধিত হয়। এখানে দুটি রূপক অলংকার উপমার সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। যদিও উপমান আহরণে গতানুগতিকতা রয়েছে, তথাপি কবির মৌলিকতা কোন ভাবেই হ্রাস পায়নি। শ্লোকের শেষের চরণ দুটিতে কবি যখন বলেন—রাজার যশ চন্দ্রের মত শুভ্র হয়েও রক্তিমা ছড়ায়, স্থির হয়েও ভ্রমণ করে, কারণযুক্ত হয়েও সেটা শাশ্বত,তখন আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় কবি পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন। কিন্তু যখন আমাদের মনে আসে 'রঞ্জক' শব্দের দুটি অর্থ—একটি অর্থ রঞ্জিত করা (লাল রং করা) এবং অপর অর্থ অনুরঞ্জিত করা (অনুরাগ উৎপাদন করা), অর্থাৎ রাজার যশ শুভ্র হয়েও প্রজাদের অনুরাগ উৎপন্ন করত। এভাবে যশ স্থির হয়েও অর্থাৎ রাজাতে চিরস্থায়ী হয়েও লোকমুখে চতুর্দিকে বিচরণ করত, তখন

কবির বক্তব্যে আর পরস্পরবিরোধী ভাব থাকে না। এ জাতীয় বাক্যবিন্যাসকে আলংকারিক পরিভাষায় বলা হয় বিরোধাভাস অলংকার।

কাদম্বরী কথা-কাব্যের রচয়িতা বাণভট্ট বিরোধাভাস অলংকারের প্রয়োগে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কাদম্বরীতে বিরোধাভাস অলংকারের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করছি :

> শিশিরসাপি রিপুজনসন্তাপকারিণঃ স্থিরসাপ্যবিরতং ভ্রমতঃ অতিধবলসাপি সর্বজনরাশকারিণো...যশঃ। [২৬]
>
> [তাঁর (তারাপীড়ের) যশ শীতল হওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের সন্তাপ উৎপাদন করত, স্থির থাকা সত্ত্বেও সর্বদা ভ্রমণ করত, অত্যন্ত শুভ্র হয়েও রক্তিমা উৎপাদন করত।]

আমাদের মনে হয় ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসনের কবির উপর বাণভট্টের বিশেষ প্রভাব ছিল। এতে তাম্রশাসন-রচয়িতার কবিপ্রতিভা অবশ্যই ম্লান হয়ে যায় নি। কারণ পূর্বসূরীদের প্রভাব যে উত্তরসূরীদের উপর পড়বে তা স্বাভাবিক। যেমন বাল্মীকির প্রভাব পড়েছিল কালিদাসের উপর, আবার কালিদাস ও সুবন্ধুর প্রভাব পড়েছিল বাণভট্টের উপর।

কেশবদেবের অপরিমেয় গুণরাশির বর্ণনায় কবি উল্লেখ অলংকারের প্রয়োগ করেছেন। যেমন,

> যঃ সীমাভূতঃ পৌরুষস্য যশসাৎ ধামঃ শ্রিয়ামাশ্রয়ো
> বিদ্যানাং বসতির্ন্যস্য নিলয়ো ধাম্মন্তদেকাস্পদম্।
> ত্যাগস্যায়তনং বিলাসভবনং বাচঃ কলানাং নিধিঃ
> সৌজন্যস্য নিকেতনং বিজয়তে মূর্তো গুণানাং গণঃ।। (শ্লোক ৮)
>
> [যিনি শৌর্যের সীমাভূমি, যশের অধিষ্ঠান, সৌন্দর্যের আশ্রয়, সকল বিদ্যার বসতিস্থল, ন্যায়পরায়ণতার নিলয়, বদান্যতার একমাত্র বাসস্থান, ত্যাগের নিকেতন, বাগীতার বিলাসভবন, কলাবিদ্যার আধার, সৌজন্যের নিবাসস্থল, সর্বগুণের আকর—(তাঁর) মূর্তিমান গুণরাশি জয়যুক্ত হোক।]

কবির এ ধরণের বাক্যবিন্যাস আমাদের বাণভট্টের বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহারাজ শূদ্রকের বর্ণনায় বাণভট্ট বলেন :

> 'আদর্শঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্, উৎপত্তিঃ কলানাম্ কুলভবনং
> গুণানাম্, আগমঃ কাব্যামৃতরসানাম্...'[২৭]
>
> [তিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রের দর্পণ, সকল কলাবিদ্যার উৎপত্তিস্থল, গুণগ্রামের কৌলিক গৃহ (ভদ্রাসন), কাব্যসুধারসের উৎস।]

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের ব্যঞ্জনা থাকা সত্ত্বেও কবির কল্পনায় কখনও কখনও উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য (contrast) প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বৈসাদৃশ্যের প্রাধান্য আসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অবস্থিত সাধারণ ধর্মের তারতম্যে, উপমেয়ের উৎকৃষ্টতায় অথবা উপমেয়ের নিকৃষ্টতায়। (অনেকে অবশ্য উপমেয়ের নিকৃষ্টতা সঙ্গত কারণেই স্বীকার

করেন না।) এ প্রকারের বাচ্যবৈচিত্র্যের আলংকারিক নাম ব্যতিরেক অলংকার। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়ের উৎকৃষ্টতা কখনও বাচ্য অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশিত (expressed), আবার কখনও উপমেয়ের উৎকৃষ্টতার উপলব্ধি আসে ব্যঞ্জনায়। ব্যঞ্জনায় এলে সেটাকে বাচ্য অলংকার না বলে, বলা হয় ব্যতিরেক অলংকার-ধ্বনি। অলংকার-ধ্বনি এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করে। তাই অলংকার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আচার্য আনন্দবর্ধন ও তাঁহার অনুসারীরা ধ্বনি-কাব্যকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলেছেন।[২৮] ব্যতিরেক অলংকারধ্বনিরও উদাহরণ পাওয়া যায় ভাটোরার প্রথম তাম্রশাসনে:

কৃপ্তা যেন ভুজৌজসা বসুমতীমেকাতপত্রমিমাং
লোকোহ স্মিন্নভিলষ্যতে বিজয়িনান্যধিক্কারিস্থিতিম্।
পাণিঃ কল্পতরোঃ পদে দিনকৃতঃ ক্বত্যে প্রতাপো যশঃ
শীতাংশোর্বিষয়ে ন্যধায়ি ভুজগাধীবাধিকারো ভুজঃ।। (শ্লোক ১০)

[বাহুবলে পৃথিবীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করে এই বিজয়ী নরপতি এই বিশ্বে অপরের অধিকার স্থাপন ইচ্ছা করলেন না। (এজন্য) কল্পবৃক্ষের স্থানে আপন হস্ত, সূর্যের কার্যে প্রতাপ, চন্দ্রের স্থানে যশ এবং সর্পরাজ বাসুকির কর্তব্যে বাহু প্রসারিত করলেন।]

এখানে হস্ত, প্রতাপ, যশ ও বাহু এই উপমেয়গুলোর উপমান যথাক্রমে কল্পবৃক্ষ, সূর্য, চন্দ্র ও বাসুকি; এবং এগুলোর সাধারণধর্ম যথাক্রমে দানশীলতা, তেজস্বিতা, ঔজ্জ্বল্য এবং ভারবহণের ক্ষমতা। উপমান ও উপমেয়গুলোর মধ্যে সাদৃশ্যের ব্যঞ্জনা এসেছে সাধারণধর্মের ভিত্তিতে। যেহেতু এই বিশ্বে অপরের অধিকার রাজার ঈপ্সিত নয়, কাজেই ব্যঞ্জনায় এটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে রাজা দানশীলতায় কল্পবৃক্ষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তেজস্বিতায় সূর্যের চেয়ে বেশী প্রখর, যশে চন্দ্রের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল এবং ভারবহণে (রাজ্যভার বহণে) তার বাহু বাসুকির ফণার চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী। উপমেয়গুলোর উৎকৃষ্টতা স্পষ্টভাবে না বলে, বলা হয়েছে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। এই কবিতাটি কালিদাসের একটি কবিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন,

দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে।।

[দক্ষিণদিকে (অর্থাৎ দক্ষিণায়নে) সূর্যের তেজ মন্দীভূত হয়; কিন্তু দক্ষিণদিকেই পাণ্ড্যদেশীয় রাজারা রঘুর প্রতাপ সহ্য করতে পারলেন না।]

কারণের মধ্যে যে গুণ থাকে কার্যের মধ্যে সেই গুণই থাকে—এটাই প্রসিদ্ধি। কিন্তু কবিতাপ্রতিভা 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা' বিধাতার দেয়া নিয়ম সে মেনে চলে না। এইজন্য অনেক সময় কার্য-কারণের গুণে বৈষম্য দেখা যায় কবির বাগ্‌বিন্যাসে। আলংকারিকরা এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাসের নাম দিয়েছেন বিষমালংকার। ভাটোরার প্রথম তাম্রশাসনে বিষমালংকারের প্রয়োগ দেখা যায় কেশবদেবের শৌর্য-বীর্য বর্ণনায় :

বাষ্পৈরুল্কীপতীনাং যদয়মনুমিতো মূর্চ্ছিতো যদ্রিপুণাং
কীলালৈর্যত্তনোতি দ্বিষদবনিভুজং জাড্যমচ্ছিবিতানৈঃ।
কাষ্ঠানাং যদ্যতীত্য প্রকরমুপযযাবম্বরং লেলিহান—

স্তেনাশচর্যৈকসীমা জয়তি নরপতেঃ কোহপি তেজঃ কৃশানুঃ।
(শ্লোক ১৪)

[নরপতি (কেশবদেবের) তেজাগ্নির জয় (অর্থাৎ জয়যুক্ত হোক) যে তেজাগ্নি ভূপতিদের বাষ্পের (অর্থাৎ চোখের জলে) দ্বারা অনুমিত হয়, শত্রুদের শোণিতপ্রবাহে বর্দ্ধিত হয়, শিখাবিস্তারের দ্বারা শত্রুরাজাদের জড়তা বিস্তীর্ণ করে, কাষ্ঠের সম্ভার ছাড়াই (সোজা হয়ে) আকাশে উঠে লেলিহান জিহ্বাবিস্তার করে।]

কবি অমৃত তেজকে অগ্নির সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে মূর্ত করে তুলেছেন। অলংকার হল রূপক। অগ্নি কখনও বাষ্পের দ্বারা অনুমিত হয় না, সাধারণতঃ ধুয়ার দ্বারা অনুমিত হয়, কিন্তু রাজার তেজাগ্নি বাষ্পের দ্বারা অর্থাৎ শত্রুরাজাদের চোখের জলের দ্বারা অনুমিত হয়, কারণ শত্রুরাজারা তাঁর ভয়ে অশ্রুপাত করেন। অগ্নি কখনও জলীয়পদার্থ রক্তের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় না, বরং নিভে যায়, কিন্তু রাজার তেজাগ্নি শত্রুরাজাদের রক্তপ্রবাহে বর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ যুদ্ধে তিনি শত্রুদের বধ করেন। অগ্নি সাধারণতঃ জড়তা দূর করে, কিন্তু রাজার তেজাগ্নি শত্রুরাজাদের জড়তা বর্দ্ধিত করে অর্থাৎ শত্রুরাজাদের হতবুদ্ধি করে দেয়। অগ্নি সাধারণতঃ কাষ্ঠসম্ভার ছাড়া নিভে যায়, বিস্তার লাভ করতে পারে না, কিন্তু রাজার তেজাগ্নি কাষ্ঠসম্ভার ছাড়াই আকাশে উঠে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে, অর্থাৎ সকল দিক অতিক্রম করে আকাশকেও লেহন করতে প্রবৃত্ত হয়।

ভাটোরার প্রথম তাম্রশাসনে পরিসংখ্যান অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে কবি যেমন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি একটি ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন। এই অলংকারে দুইটি যুগপৎ সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করে তার সদৃশ অন্যটিকে বর্জন করা হয়। বর্জনের কারণটি ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করা হয়ে থাকে। যেমন,

যস্মিন্ শাসতি নিখিলামাদিমহীপালদীক্ষয়া ক্ষোণীম্।
শ্রুতিপথলঙ্ঘনসাহসমাসীত্ কান্তাদৃশামেব।। (শ্লোক ১১)

[প্রথম মহীপালের (অর্থাৎ মনুর) উপদেশ অনুসারে এই নরপতি (কেশবদেব) পৃথিবী শাসন করার সময় সুন্দরীদের চক্ষুসমূহেরই শ্রুতিপথ (কর্ণ) লঙ্ঘন করার সাহস ছিল।]

শ্রুতিপথ শব্দটি শ্লিষ্ট (দ্ব্যর্থক)। এর একটি অর্থ হলো 'কর্ণ' এবং অন্য অর্থটি হলো 'বেদ' বা 'বেদের বিধান'। সুতরাং অর্থটি দাঁড়াচ্ছে—সুন্দরীদের দীর্ঘ চক্ষু (যা সৌন্দর্যের প্রতীক)[৩০] কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু প্রজাদের বেদের বিধান লঙ্ঘন করার সাহস ছিল না। কারণ বেদের বিধান মতে রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই শ্লোকে কবি এটাই বলতে চাইছেন যে কেশবদেব মনুর বিধান অনুসরণ করে রাজ্য-শাসন করতেন। মনুর বিধানই বেদের বিধান। কারণ মনুস্মৃতিতে বেদের অর্থই উপনিবদ্ধ হয়েছে। এজন্য বৃহস্পতি-সংহিতা বলেন :

বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

কেশবদেবের সময় শ্রীহট্টরাজ্যে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল সেটার ইঙ্গিত এই শ্লোকে রয়েছে।

পরিসংখ্যা অলংকারের প্রয়োগে সুবন্ধু ও বাণভট্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এবার সুবন্ধু ও বাণভট্টের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে তাম্রশাসনের কবি কিভাবে সুবন্ধু ও বাণভট্টের দ্বারা প্রভাবিত। আমরা প্রথমে সুবন্ধুর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'যত্র চ শাসতি ধরণীমণ্ডলং ছলনিগ্রহ—
প্রয়োগো বাদ্যেষু, নাস্তিকতা চার্বাকেষু....'[৩২]

[তিনি (চিন্তামণি) যখন পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তখন শুধুমাত্র শাস্ত্রবিচারেই ছিল 'ছল', কথার মারপ্যাঁচ, এবং 'নিগ্রহ' পরপক্ষের খণ্ডন (এছাড়া কোথাও ছলনা ও অত্যাচার ছিল না); নাস্তিকতা ছিল শুধু চার্বাকের মতবাদে (সমাজ নাস্তিকতা অর্থাৎ নির্ধনতা ছিল না।)]

রাজা শূদ্রকের বর্ণনায় বাণভট্ট বলেন :

'যস্মিন্শ্চ রাজন জগতজগতি পরিপালয়তি মহীং
চিত্রকর্মসু বর্ণসঙ্করো কাব্যেষু দৃঢ়বন্ধা....'[৩৩]

[ভূমণ্ডলবিজয়ী এই রাজার পৃথিবী প্রতিপালনকালে চিত্ররচনাতে শুধু ছিল বর্ণসঙ্কর (অর্থাৎ নীল-পীত প্রভৃতি বর্ণের সংমিশ্রণ, কিন্তু সমাজে বর্ণসঙ্কর ছিল না); কাব্যেই শুধু ছিল দৃঢ়বন্ধন (প্রগাঢ় রচনা, কিন্তু কারাগারে দৃঢ় বন্ধন ছিল না)।]

দুটি উদাহরণের মধ্যেই রাজার সুশাসনের ইঙ্গিত রয়েছে এবং কবি সমাজের চিত্রটি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সংস্কৃত ছন্দের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেখানে হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা-ভেদে ধ্বনির উত্থান-পতনে যতির তালে তালে পদ্যে আসে এক সঙ্গীতের মাধুর্য। পদ্যের অর্থ বুঝা না গেলেও সংস্কৃত ছন্দে এক অনির্বচনীয় স্পন্দন জাগিয়ে তুলে আমাদের হৃদয়ে। ভাটোরার প্রথম তাম্রশাসনের কবি হ্রস্ব দীর্ঘ বিভিন্ন প্রকারের নয়টি ছন্দ নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেছেন। এই নয়টি ছন্দ হলো :

(১) আর্যা (শ্লোক সংখ্যা ৩, ৪, ১১, ১৮)

(২) অনুষ্টুপ (শ্লোক সংখ্যা ১৯, ২০)

(৩) উপজাতি (শ্লোক সংখ্যা ৫, ১৬)

(৪) বংশস্থবিল (শ্লোক সংখ্যা ১২, ১৭)

(৫) বসন্ততিলক (শ্লোক সংখ্যা ৬, ৭, ১৫)

(৬) পৃথ্বী (শ্লোক সংখ্যা ১৩)

(৭) পুষ্পিতাগ্রা (শ্লোক সংখ্যা ২)

(৮) স্রগ্ধরা (শ্লোক সংখ্যা ১৪)

(৯) শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক সংখ্যা ১, ৮, ৯, ১০)

ছন্দের কলা-কৌশল সম্পর্কেও কবি অবহিত ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পদ্যে যথার্থ স্থানে মাত্রা ও যতির প্রয়োগ। যেমন,

—বাষ্পৈবুক্কীপতীনাং \ যদয়মনুমিতো \ মূর্চ্ছিতো যদ্রিপুণাং \
কীলালৈর্যত্তনোতি \ দ্বিষদবনিভুজং \ জাড্যমচ্ছিবিতানৈঃ \
কাষ্ঠানাং যদ্যতীত্য \ প্রকরমুপযযা \ বম্বরং লেলিহান \
স্তেনাশচর্যৈকসীমা \ জয়তি নরপতেঃ \ কোহপি তেজঃকৃশানুঃ \

এখানে স্রগ্ধরা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। স্রগ্ধরা ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো তার চরণে ম, র, ভ, ন, য, য, য, এই সাতটি গণ বা একুশটি বর্ণ থাকে। প্রথম চারটি বর্ণে ও ষষ্ঠ, সপ্তম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং বিংশতিতম বর্ণে থাকে দীর্ঘমাত্রা, বাকীগুলোতে থাকে হ্রস্ব মাত্রা। প্রতি চরণে সপ্তম বর্ণের পর থাকে যতি বা বিরাম (metrical pause)। সুবৃত্ততিলকের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র বলেন সাধারণতঃ বায়ু অগ্নি প্রভৃতির বেগবর্ণনায় এই ছন্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। 'সবেগ পবনাদীনাং বর্ণনে স্রগ্ধরা মতা'।[৩৪]

ভাটোরার প্রথম তাম্রশাসনের কবি তেজাগ্নির বর্ণনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। মাত্রা ও যতি এখানে নিখুঁতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

কালিদাসের কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন :

> কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মতো সবজি দিয়া চলে না; তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত; একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরক-খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরক হারের ন্যায় সুন্দর।[৩৫]

আমাদের মনে হয় এই মন্তব্যটি সমানভাবে ভাটোরার প্রথম তাম্রশাসনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

।। সাত ।।

ভাটোরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনের রচয়িতা মাধবদাস মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে তিনি রাজাদের প্রশস্তি কীর্তন করেছেন এবং যতদিন এ পৃথিবীতে সমুদ্র ও পর্বত থাকবে ততদিন জগতে এই প্রশস্তি স্থায়ী হবে।

এতান্ প্রশস্তিিং বিদধে বিবেকী
শ্রীমাধবো দাসকুলাবতংসঃ।
যাবৎ সমুদ্রা গিরয়শ্চ যাবজ্
জীয়াৎ ক্ষিতৌ তাবদিয়ঞ্চ শশ্বৎ।। (শ্লোক ২১)

একে তুলনা করা চলে রামায়ণের বক্তব্যের সঙ্গে :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচারিষ্যতি।।[৩৬]

[পৃথিবীতে যতদিন পর্বতসমূহ ও নদীসমূহ থাকবে ততদিন লোকমধ্যে রামায়ণ প্রচারিত থাকবে।]

মাধবদাসের ভাষাও প্রাঞ্জল, মাধুর্যপূর্ণ এবং লালিত্যময়। তাঁর রচনায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অল্প। কবি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে অলংকার ব্যবহার করেছেন। শব্দালংকারের প্রয়োগকে কবি সীমিত রেখেছেন অনুপ্রাসের মধ্যে। দুই একটি উদাহরণ দিলেই কবির অলংকার প্রয়োগের দক্ষতা প্রকাশ পাবে। যেমন,

'রথোত্তরঙ্গৈরভিসন্তপন্তিঃ সন্তাপশান্তিঃ সতরামলম্বি।' (শ্লোক ১৪)

কোমল বর্ণবিন্যাসে 'সন্ত' পদযুগলের অনুপ্রাসে শ্লোকটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অথবা

'গুণৈর্যদীয়ৈঃ শ্রবণাবিরামৈরাকৃষ্যমানা গুণিনস্ সমন্তাৎ।' (শ্লোক ৭)

পদলালিত্য ও সঙ্গীতধর্মের মধ্য দিয়া কেশবদেবের গুণের শব্দময় রূপ ফুটে উঠেছে। কাব্যার্থে বিভক্ত হয়েছে রসানুকূল বর্ণবিন্যাসে ছন্দের তালে তালে। ধ্বনিবিন্যাসের উপর নির্ভর করছে শ্লোকের কাব্যসৌন্দর্য।

মাধবদাসের রচনায় চিত্রধর্মিতা এসেছে মাত্র কয়েকটি অলংকারের মাধ্যমে। তাঁর রচনায় উপমা, রূপক, উল্লেখ, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা — এই কয়েকটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের প্রয়োগে ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রশস্তির প্রথম শ্লোকেই কবি একটি চিত্র তুলে ধরলেন। যেমন,

মহানীলমণিশ্যামঃ সুবর্ণরুচিরাম্বরঃ।
পাতু বঃ কমলাকান্তঃ সবিদ্যুদিব বারিদঃ।। (শ্লোক ১)

[প্রসিদ্ধ নীলকান্ত মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুবর্ণোজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত (অতএব) বিদ্যুৎযুক্ত কৃষ্ণমেঘ সদৃশ কমলাকান্ত (লক্ষ্মীপতি নারায়ণ) আপনাদের রক্ষা করুন।]

বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ আমাদের চিরপরিচিত। মেঘের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনার মাধ্যমে বর্ণনীয় নারায়ণের মূর্তিতি যেমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি কবির অভীপ্সিত ভাবও আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মেঘের সঙ্গে নারায়ণের সাদৃশ্য কল্পনার মাধ্যমে কবি ব্যঞ্জনায় আমাদের জানিয়ে দিলেন যে মেঘের মতো নারায়ণ জগতের সফল ঐশ্বর্যের কারণ। অলংকার এখানে উপমা।

কবি আর একটি মনোরম চিত্র তুলে ধরলেন মহারাজ নারায়ণদেবের বর্ণনার মাধ্যমে

তস্যাত্মজঃ শক্রজুতাং বিশিষ্টঃ
সংরাত্তশস্ত্রার্ণবমন্দরাদ্রিঃ।
শ্রিয়া হৃদা সগতমঞ্জুমূর্তি-
র্বভুব নারায়ণদেব এষঃ।। (শ্লোক ৪)

[ক্ষুব্ধ শস্ত্রসাগরে মন্দর পর্বতের সদৃশ, লক্ষ্মীর বক্ষপীড়নে (আলিঙ্গনে) ক্ষতচিহ্নযুক্ত নারায়ণের ন্যায় সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট, শস্ত্রধারীদের মধ্যে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী নারায়ণদেব ছিলেন তাঁর (গোকুল দেবের) পুত্র।]

নারায়ণদেব রণনিপুণ ছিলেন এই কথাটি পরিবেশন করলেন কবি সহজ সুন্দর ভাষায়। সাগরের বিক্ষুব্ধতা সর্বজন-বিদিত। সাগরের সঙ্গে শস্ত্রের অর্থাৎ শস্ত্রধারী যোদ্ধাদের অভেদকল্পনার মাধ্যমে কবি বুঝাতে চাইলেন প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের প্রতাপ। কিন্তু মন্দর পর্বত যেমন সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্রকে আলোড়িত করে গবোরন্নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি নারায়ণদেব প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের আলোড়িত করে গর্বভরে উন্নত হয়ে রইলেন। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নারায়ণদেবের উপর মন্দর পর্বতের অভেদারোপ শস্ত্রধারীদের উপর অর্ণবের অভেদারোপের কারণ হওয়ায় অলংকার এখানে পরম্পরিত রূপক। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে নারায়ণদেবের শরীরে অনেক ক্ষতচিহ্ন ছিল, তাতে তাঁর অঙ্গলাবণ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করে কবি রাজার দেহলাবণ্য সুস্পষ্ট করে তুললেন। অস্ত্রাঘাতে শরীরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এই কথাটি হরিষেণ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন। তুলনীয় :

'অনেক-প্রহরণবিরূপিতাকুল-ব্রণশতাক্ষোভা—
সমুদয়োপচিত-কান্ততরবর্ণণঃ.....'[৩৭]

[বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে তাঁর সর্বাঙ্গে শত শত ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে দেহটিকে অধিকতর সুন্দর ও কমনীয় করেছে।]

যশের বর্ণ শুভ্র। এই কবিপ্রসিদ্ধির মাধ্যমে কবি যশের একটি চিত্র অঙ্কন করলেন।

স রাজরাজঃ কুমুদাবদাতৈর্যশোভির্বীং বিমলীচকার। (শ্লোক ৯)

[সেই রাজাধিরাজ (কেশবদেব) কুমুদের ন্যায় শুভ্র যশের দ্বারা পৃথিবী নির্মল করেছিলেন।]

কবি নিরাকার যশকে মূর্ত করে তুললেন শ্বেতবর্ণ কুমুদের সঙ্গে তুলনা করে। অলংকার এখানে উপমা।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কবির কল্পনার মাত্রা উপমাকে ছাড়িয়ে যায়। কবির কল্পনায় অবাস্তব বাস্তব হয়ে ওঠে, অসত্য সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। এজন্য আলংকারিকরা উৎপ্রেক্ষা অলংকারকে শ্রেষ্ঠ অলংকার মনে করেন এবং নববধূর হাসির সঙ্গে তুলনা করেন। তুলনীয় :

সবলিঙ্কারসর্বস্বং কবিকীর্তিবিবোধিনী।
উৎপ্রেক্ষা হরতি স্বান্তমচিরোঢ়াস্মিতাদিব।।[৩৮]

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উন্মীলিত প্রেক্ষণে মাধবদাস অনন্য। কেশবদেব নির্মিত বিষ্ণুমন্দিরের বর্ণনায় কবি বলেন :

স মন্দিরং কংসনিসূদনস্য
শিলাভিরুচ্চৈর্বিদধে মহৌজাঃ।
যতুঙ্গ শৃঙ্গস্থিতচক্রধারা—
ক্ষতাঃ ক্ষরন্ত্যম্বুঘনা দিবস্তঃ।। (শ্লোক ১০)

[প্রতাপশালী নরপতি প্রস্তর দ্বারা কংসনিসূদনের (জন্য) সুউচ্চ এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যার উচ্চ চূড়াস্থিত চক্রধারার আঘাতে আকাশস্থ শিলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ভূতলে বর্ষিত হত (অর্থাৎ শিলাবৃষ্টি হত)।]

মেঘ ঘন হয়ে প্রাকৃতিক কারণেই শিলাবৃষ্টি ঘটায়। কিন্তু কবি বলছেন শিলাবৃষ্টির কারণ মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত চক্রের ধার। অবাস্তবকে বাস্তবরূপে কল্পনা করা হয়েছে। মন্দিরের উচ্চতা বুঝাতেই কবিকে এই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। উৎপ্রেক্ষা অলংকারের আরও একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ঈশানদেবের রণতরীর দাঁড়ের আঘাতে উত্থিত জলরাশির বর্ণনায় :

যদীয়-নৌবাটককেনিপাত—
ঘাতোচ্ছলদ্বারিভিরুগ্ররশ্মেঃ।
রথোত্তরঙ্গৈরভিসন্তপন্তিঃ
সন্তাপশান্তিঃ সতরামলম্বি।। (শ্লোক ১৪)

[তাঁর রণতরীর দাঁড়ের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি সূর্যের রথসংযুক্ত অশ্বদের সন্তাপ দূর করত।]

দাঁড়ের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জলরাশির পক্ষে সূর্যের রথসংযুক্ত অশ্বদের সন্তাপ দূর করা সম্ভব নয়। এইজন্য 'সন্তাপ যেন দূর করত' বুঝতে হবে। কবি কল্পনায় এক অভিনব রূপ-সৃষ্টি করলেন। অবাস্তব হয়ে উঠল বাস্তবের চেয়ে আকর্ষণীয়। সূর্য প্রতিদিন সাতটি অশ্বচালিত রথে আরোহণ করে পূর্বাচল থেকে পশ্চিমাচলে যান—এই পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে বাণভট্ট একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন :

'যস্যামুতুঙ্গ-সৌধোৎসঙ্গ-সঙ্গীতসঙ্গিনীনামতি—
মধুরেণ গীতরবেণাকৃষ্যমাণোন্মুখ-রথতুরঙ্গঃ পুরঃ
পর্যন্তরথপতাকাপটিং কৃতমহাকাল প্রণাম ইব
প্রতিদিনং লক্ষ্যতে গচ্ছন্ দিবসরকরঃ।'[৩৯]

[যেখানে (উজ্জয়িনী নগরীতে) অতি উচ্চ প্রাসাদের উপর তলায় গীতচর্চায় রত রমণীদের অতি মধুর গীতধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে সূর্যের রথের অশ্বগুলো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে, অমনি রথের পতাকা সামনে ঝুলে পড়ে, প্রতিদিন মনে হয় সূর্য অস্তাচলের দিকে যেতে যেতে মহাকালকে প্রণাম করে যাচ্ছেন।]

একুশটি শ্লোকে রচিত ভাটোরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনে তিনটি ছন্দের সুন্দর প্রয়োগ, ভাব ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি সহকারে বিন্যস্ত। এই তিনটি ছন্দ হলো :

(১) অনুষ্টুপ (শ্লোক সংখ্যা - ১, ২, ১১, ১৬, ১৮, ২০)

(২) ইন্দ্রবজ্রা (শ্লোক সংখ্যা - ৪, ৬, ১২, ২১)

(৩) উপজাতি (শ্লোক সংখ্যা - ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৯)

কবির ছন্দ প্রয়োগে দোষ নেই, নেই বর্ণবিন্যাসে শ্রুতিকাঠিন্য। ছন্দ যেন ছায়ার মতো ভাবের অনুগমন করেছে।

ভাটোরা তাম্রশাসন দুটি এই অঞ্চলের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শাসন রচনা করতে গিয়ে রচয়িতারা সর্বভারতীয় ধারাটিকেই বজায় রেখেছেন। স্পষ্টতঃই তাঁরা ভারতের অন্যান্য স্থানে লিখিত শাসনের রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

তাম্রশাসনের রচনাগাম্ভীর্য, শব্দবিন্যাসের নৈপুণ্য, অলংকার ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োগদক্ষতা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনুশীলন না থাকলে এরকম উচ্চাঙ্গের কাব্যরচনা সম্ভব নয়। তাই শ্রীহট্টমণ্ডলে একাদশ শতকের বহু পূর্ব থেকে সাহিত্য অনুশীলনের যে একটি উন্নত পরম্পরা গড়ে উঠেছিল তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

তাম্রশাসন রচয়িতারা বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের কাব্য-শৈলীতে এ সকল গ্রন্থের প্রভাব রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে এ অঞ্চলে এ সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন অব্যাহত ছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহু পূর্বেই এ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

নির্দেশপঞ্জি ও টীকা

১ Jayanta Bhusan Bhattacharjee, 'An Early State in Srihattadesha : Content Analysis of the Bhatera Copper-Plates', in 'Proceedings of the NEIHA', Fifth Session, Aizawl, 1984, p.17.

২ Kamala Kanta Gupta, Copper-Plates of Sylhet, Vol. I, 1967. p.194, fn.

৩ অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২২ এবং ৩১; Copper-Plates of Sylhet, p.194, fn.

৪ Rajendralal Mitra, 'Copper-Plate Inscriptions of Sylhet' in 'Proceedings of the Asiatic Society of Bengal', No.VIII, August 1880, p.141-43; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩১; Copper-Plates of Sylhet, p.193, fn.

৫ ঐ

৬ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৩

৭ K. M. Gupta, "Bhatera Copper-Plates", in 'Epigraphia Indica', Vol. IX. p.356, Copper-Plates of Sylhet, p.194.

৮ Ibid

৯ Copper-Plates of Sylhet, p.194.

১০ Ibid

১১ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৭

১২ R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971, p.278.

১৩ Rajendralal Mitra, Op. Cit., p.142.

১৪ Rajendralal Mitra, Op. Cit.; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পৃঃ ৩৮ পাদটীকা।

১৫ W. W. Hunter, A Statistical Account of Assam, (reprinted) 1990, p.260.

১৬ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, অসম প্রকাশন পরিষদ, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৭১, পৃঃ ১১

১৭ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৮-৩৯।

১৮ J. B. Bhattacharjee, "The Ancient Political Structure of the Barak Valley", in NEHU Journal, Vol. X. No.2. 1992, p.26

১৯ R. R. Mukherjee and S. K. Maity, Corpus of Bengal Inscriptions, Calcutta, 1967, Introduction, p.23.

২০ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৩।

২১ Copper-Plates of Sylhet, pp. 202-03.

২২ A. B. Keith, 'History of Sanskrit Literature', Oxford University Press, London, 1961, p.149.

২৩ বক্রোক্তিজীবিত, কলিকাতা সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ ৫৬-৬৯।

২৪ J. Gonda, "Remarks on Similes in Sanskrit Literature, Utrecht, Laiden, E. J. Brill, 1949, Introduction, p.11.

২৫ মালিনাং ব্যোনি পাপে যলসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্যোঃ।
রক্তৌ চ ক্রোধরাগৌ সরিদুদধিগতং পঙ্কজেন্দীবরাদি।।
অহাস্যভোজং নিশায়াং বিকসতি কুমুদং চন্দিকা শুক্লপক্ষে।

সাহিত্যদর্পণ - ৭/২৩

২৬ কাদম্বরী, কলিকাতা সং, পৃঃ ১৯০।

২৭ ঐ, পৃঃ ১৩।

২৮ ইদমুক্তমমতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনিবুধৈঃ কথিতঃ।

কাব্যপ্রকাশ ১/৪

২৯ রঘুবংশ ৪/৪৯

৩০ তুলনীয়ঃ কামং কপদবিশ্রান্তে বিশালে তস্য লোচনে। রঘু ৪/১৩

৩১ অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মনুসংহিতা ভূমিকা, পৃঃ ৫

৩২ বাসবদত্তা, নবপত্র (কলিকাতা) সং, পৃঃ ৬৮।

৩৩ কাদম্বরী, পৃঃ ১৩।

৩৪ সুবৃত্ততিলক, কাশী সং, পৃঃ ৩৫।

৩৫ রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিকী সং, পৃঃ ৬৬২ (৩২)

৩৬ রামায়ণ ১/২/৩৬

৩৭ এলাহাবাদ শিলালেখ, পঙ্‌ক্তি ১৮।

৩৮ অলংকারশেখর, 'কাশী সং' পৃঃ ৩৬।

৩৯ কাদম্বরী, পৃঃ ১৮৪।

।। বঙ্গানুবাদ ।।

ভাটৌরা প্রথম তাম্রশাসন

শিবকে নমস্কার।

যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি-কর্তা, যিনি পৃথিবী প্রভৃতি শরীরের (অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের) দ্বারা এই বিশ্বকে ধারণ করেন, যিনি ঈশ্বর নামে খ্যাত, যিনি অনন্য কিন্তু গুণত্রয়ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে অভিহিত—তাঁকে নমস্কার ।। ১ ।।

ত্রিপুরারির মস্তকচূড়ার রত্ন, কামদেবপত্নীর (অর্থাৎ রতির) স্নানের (জন্য ব্যবহৃত) রৌপ্যকুণ্ড, পুষ্পধন্বা কামদেবের বাণের (শান দেবার) চক্রাকার শানপাথর, নিশার অলংকার শীতাংশুর জয় (অর্থাৎ নমস্কার করি) ।। ২ ।।

ঐ (অর্থাৎ চন্দ্রের) প্রসিদ্ধ বংশে অসীম পরাক্রমশালী ভূপতিদের জন্ম হয়। পৃথিবীতে যাঁদের যশঃপ্রশস্তি মহাভারতে বর্ণিত রয়েছে ।। ৩ ।।

সেই বংশে অত্যন্ত পরাক্রমশালী, শ্রীহট্টরাজলক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থল, তীক্ষ্ণ-বাণনিক্ষেপে দক্ষ, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবগীবণের জন্ম হয় ।। ৪ ।।

তাঁর পুত্র গোঙ্গণদেব (গোকুলদেব) ছিলেন বর্তমান নরপতির (অর্থাৎ কেশবদেবের) পিতামহ। আশ্চর্যের বিষয়, সূর্যতেজের মতো তাঁর প্রতাপ শত্রুরাজাদের জড়তা উৎপন্ন করেছিল ।। ৫ ।।

তাঁর (অর্থাৎ গোঙ্গণদেব) থেকে নারায়ণের জন্ম হয়েছিল, যিনি সুন্দর ভুজমন্দরের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজসমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন, যেভাবে ভগবান নারায়ণ মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্রকে মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন। (জনগণের) আনন্দ উৎপাদনকারী এই নরপতি ভগবান নারায়ণের তুল্য ছিলেন ।। ৬ ।।

তাঁর পুত্র শ্রীমান কেশবদেব ছিলেন রাজাদের অলংকার, যাঁর অপর নাম ছিল 'রিপুরাজ গোপী-গোবিন্দ; অসীম গুণোৎকর্ষের জন্য তাঁর যশোরাশি চতুর্দিকে লোকমুখে গীত হত এবং তাঁর পাদপীঠ অন্য রাজাদের মস্তকস্থিত মুকুটমণির দ্বারা অলঙ্কৃত হত ।। ৭ ।।

যিনি শৌর্যের সীমাভূমি, যশের অধিষ্ঠান, সৌন্দর্যের আশ্রয়, সকলবিদ্যার বসতিস্থল, ন্যায়পরায়ণতার নিলয়, বদান্যতার একমাত্র বাসস্থান, ত্যাগের নিকেতন, বাগীশ্বরীর বিলাসভবন, কলাবিদ্যার আধার, সৌজন্যের নিবাসস্থল, সর্বগুণের আকর--(তাঁর) মূর্তiman গুণরাশি জয়যুক্ত হোক ।। ৮ ।।

মহারাজ কেশবদেব শত্রুরাজাদের বিনাশকারী দুর্দান্ত হস্তে পৃথিবী (গো) রক্ষা করে শ্রদ্ধাসহকারে দীর্ঘকাল বিলুপ্ত বৈষ্ণব উৎসবের পুনরুজ্জীবন বিধান করেন এবং ক্রোধভরে শত্রুমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে শত্রুকুলের মধ্যে একমাত্র শিশুপালককে অবশিষ্ট রেখেছিলেন। (যেভাবে) শ্রীকৃষ্ণ পর্বত (গোবর্ধন পর্বত) উত্তোলনকারী হস্তদ্বারা গোসমূহকে রক্ষা করে স্নেহবশতঃ বৃন্দাবনকে কংসের উৎসব (অর্থাৎ নিপীড়ন) থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং

ক্রোধভরে চক্র পরিচালনা করে শত্রুকুলের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট শিশুপালকে বধ করেছিলেন ।। ৯ ।।

বাহুবলে পৃথিবীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করে এই বিজয়ী সর্পপতি এই বিশ্বে অপরের ধিকার স্থাপন ইচ্ছা করলেন না। (এইজন্য) কল্পবৃক্ষের স্থানে আপন হস্ত, সূর্যের কার্যে প্রতাপ, চন্দ্রের নে যশ এবং সর্পরাজ বাসুকির কর্তব্যে বাহু প্রসারিত করলেন ।। ১০ ।।

প্রথম মহীপালের (অর্থাৎ মনুর) উপদেশ অনুসারে এই নরপতি পৃথিবী শাসন করার সময় সুন্দরীদের চক্ষুরই শুধু শ্রুতিপথ (কর্ণ) লঙ্ঘন করার সাহস ছিল ।। ১১ ।।

উনি (কেশবদেব) তরবারি-চালনে দিঙ্মণ্ডলের প্রসন্নতা উৎপাদিত করে সুহৃদ-মণ্ডলীর প্রীতিবিধান করতেন এবং শত্রুমণ্ডলকে সুদূরে অপসারিত করে পূর্বদেশীয় রাজাদের শিরোমণির মত দীপ্তিমান হয়েছিলেন ।। ১২ ।।

তাঁর চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল যশ জগৎকে শুভ্র করে, শত্রুরূপ পদ্মের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং জগতের আনন্দরূপ কুমুদকে বিকশিত করে। শুভ্র হয়েও সেটা কিভাবে রঞ্জক (অর্থাৎ লাল রং ছড়ায়) অনবরত ভ্রমণ করেও সেটা কিভাবে স্থির, কারণযুক্ত হয়েও সেটা কিভাবে নিত্য (অর্থাৎ কারণহীন, শাশ্বত) এটা আশ্চর্যের বিষয় ।। ১৩ ।।

নরপতির তেজাগ্নির জয় (অর্থাৎ জয়যুক্ত হোক), যে তেজাগ্নি ভূপতিদের বাষ্পের (অর্থাৎ চোখের জলের) দ্বারা অনুমিত হয়, শত্রুদের শোণিতপ্রবাহে বর্ধিত হয়, শিখাবিস্তারের দ্বারা শত্রুরাজাদের জড়তা বিস্তীর্ণ করে, কাষ্ঠের সম্ভার ছাড়াই (সোজা হয়ে) আকাশে উঠে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে ।। ১৪ ।।

যুদ্ধরত এই অবনিপতি গুণদ্বয়ের দ্বারা উন্নতদ্বয়কে একসঙ্গে নত করতেন; একটি গুণের দ্বারা (অর্থাৎ ধনুতে গুণযোজনার দ্বারা) ধনুকে এবং অসীম তেজপ্রকর্ষতায় ব্যক্ত অপর গুণের দ্বারা (অর্থাৎ শৌর্যের দ্বারা) শত্রুকুলকে নত (অর্থাৎ বশীভূত) করতেন ।। ১৫ ।।

উজ্জ্বল তরবারি-হস্তে এই ভূপতি যেমন অমিতবিক্রমে পৃথিবী লঙ্ঘন করতেন, তেমনি চন্দ্রকিরণতুল্য তাঁর যশও সমগ্র পৃথিবী লঙ্ঘন করেছিল (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল) ।। ১৬ ।।

অনাদি অথচ জগতের আদিপুরুষ ত্রিলোকনাথ ভগবান বটেশ্বর কৈলাস বাসের প্রীতি পরিত্যাগ করে এই ভট্টপাটকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।। ১৭ ।।

নৃপতিদের শিরোমণির দ্বারা যাঁর চরণ কম্পিত হত এবং রাজমণ্ডলের মধ্যে যিনি প্রধান সেই শিবভক্ত শ্রীহট্টনাথ (কেশবদেব*) শশিশেখর শিবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে নানা জনজাতীয় পরিজন সহ ২৭৫ ভূহল ভূমি ও ৩৯৫টি বাড়ী দান করেন ।। ১৮, ১৯, ২০ ।।

* কমলাকান্ত গুপ্তের পাঠ অনুসারে শ্রীহট্টনাথোহয়ং শব্দে প্রথমা বিভক্তি থাকায় কেশবদেবেরই বিশেষণ। পাঠান্তরে শ্রীহট্টনাথায় শব্দে চতুর্থী বিভক্তি থাকায় শিবের বিশেষণ।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন

নারায়ণকে নমস্কার।

প্রসিদ্ধ নীলকান্ত মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুবর্ণোজ্জ্বল বস্ত্রপরিহিত, (অতএব) মেঘসদৃশ লক্ষ্মীকান্ত (নারায়ণ) আপনাদের রক্ষা করুন ।। ১ ।।

উচ্চতম শিখরে হস্তিযূথের বিনাশকারী মৃগরাজের (সিংহের) ন্যায়, অন্ধকার-সমূহের বিনাশক মহেশের অমৃতোজ্জ্বল শিরোরত্নের (অর্থাৎ চন্দ্রের) জয় (অর্থাৎ নমস্কার করি)* ।। ২ ।।

সেই চন্দ্রের বংশে, জন্ম থেকেই উজ্জ্বল কীর্তিমান জগতের অলঙ্কার, শস্ত্রধারী কৃপাপ্রার্থী রাজাদের (কাছে) কল্পবৃক্ষস্বরূপ গোস্তণদেবের (গোকুলদেবের) জন্ম হয় ।। ৩ ।।

ক্ষুব্ধ শস্ত্রসাগরে মন্দরপর্বত সদৃশ, লক্ষ্মীর (দ্বারা) বক্ষপীড়নে (অর্থাৎ আলিঙ্গনে) ক্ষতচিহ্নযুক্ত নারায়ণের ন্যায় সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট, শস্ত্রধারীদের মধ্যে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী নারায়ণদেব ছিলেন গোস্তণদেবের পুত্র ।। ৪ ।।

তিনি ছিলেন (নৃত্যগীতাদি) কলাবিদ্যার আধার, গুণের আবাসস্থল, শৌর্যের রাশি, বিনয়ের নিবাসস্থল, সৌজন্যের সাগর, সৌন্দর্যের আধার, প্রখ্যাত কীর্তিমান ও পৃথিবীর অলঙ্কার ।। ৫ ।।

তাঁর পুত্র কেশবদেব ছিলেন অতি তেজস্বী, তাঁর অপর নাম ছিল রিপুরাজ গোপীগোবিন্দ ভ্রুমনাস, (অন্যান্য) ভূপতিদের চূড়ামণির দ্বারা তাঁর পদযুগল অলঙ্কৃত হত ।। ৬ ।।

যার শ্রবণসুখকর গুণকীর্তি শ্রবণে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্বান ব্রাহ্মণরা চতুর্দিক থেকে এখানে (তাঁর রাজ্যে বা রাজধানীতে) আসতেন এবং তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে আপন জন্মস্থানের কথা ভুলে যেতেন ।। ৭ ।।

তাঁর পৃথিবী শাসন কালে অন্যান্য রাজারা কি সম্পদ্ উপহার দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এই চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন ।। ৮ ।।

অসংখ্য রণতরী, পদাতিক, অশ্বারোহী ও রণহস্তীর অধিপতি এই নরপতি কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র যশের দ্বারা পৃথিবী নির্মল করেছিলেন ।। ৯ ।।

এই প্রতাপশালী নরপতি প্রস্তর দ্বারা কংসনিসূদনের জন্য এক সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যার উচ্চ চূড়াস্থিত চক্রধারার আঘাতে আকাশস্থ শিলা বিদীর্ণ হয়ে ভূতলে বর্ষিত হত ।। ১০ ।।

তাঁর তুলাপুরুষ দানে দ্বিজরা প্রভূত ধন লাভ করে সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করেছিলেন (শোভা পেয়েছিলেন) ।। ১১ ।।

* 'জয়তি' অর্থাৎ জয় শব্দের দ্বারা নমস্কার বুঝায়। তুলনীয়ঃ 'জয়ত্যর্থেন চ নমস্কার আক্ষিপ্যতে'—কাব্যপ্রকাশ ১/১ বৃত্তি।

মহেশ থেকে যেমন কার্তিকের এবং চন্দ্র থেকে যেমন বুধের জন্ম, তেমনি তাঁর (কেশবদেব) থেকে ঈশানদেবের জন্ম হয়। তিনি (ঈশানদেব) ছিলেন নির্মল কীর্তিমান এবং মহীপতিদের ছত্রস্বরূপ ।। ১২ ।।
অভিযানের সময় তাঁর চলমান পদাতিক, তুরঙ্গবল, রণমাতঙ্গ (রণহস্তী) প্রভৃতির দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি সূর্যরশ্মিকে আচ্ছাদিত করে তাঁর (সূর্যের) প্রতাপ ম্লান করে দিত ।। ১৩ ।।

তাঁর রণতরীর দাঁড়ের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি সূর্যের রথসংযুক্ত অশ্বদের সন্তাপ দূর করত ।। ১৪ ।।

এই পরাক্রমশালী (কেশবদেব) মধুকৈটভারির (নারায়ণের) জন্য এক অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যার উচ্চ শৃঙ্গে কম্পমান পতাকা স্বর্গের (পারিজাত) বৃক্ষের মঞ্জরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হত ।। ১৫ ।।

বৈদ্যবংশের প্রদীপ যশস্বী বনমালিকার এই মহীপতির আক্ষপালিক (শাসন রক্ষক) ছিলেন ।। ১৬ ।।

তাঁর অনুরোধে রাজা এই শাসন দান করেন এবং স্থবির, অপুত্রক রাজপুত্র (সম্ভবতঃ কেশবদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র) বসতবাড়ী ও ঝরনা-শোভিত দুই হাল ভূমিস্ব হস্তে দান করেন ।। ১৭ ।।

মৃত রাজপুত্রের (সম্ভবতঃ কেশবদেবের দ্বিতীয় পুত্র) কুলপালিকা পত্নী ও তাঁর নাবালক পুত্র তা অনুমোদন করেন ।। ১৮ ।।

এই আদেশ ঘোষণা করেন প্রতাপশালী, সমরকুশল প্রধান সেনাপতি বীরদত্ত, যাঁর যশঃপ্রশস্তি দিগন্ত পর্যন্ত গীত হয়ে থাকে ।। ১৯ ।।

নিজ-প্রদত্ত অথবা পর-প্রদত্ত ভূমি যে হরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হয়ে পিতৃগণের সঙ্গে পচে থাকে ।। ২০ ।।

দাস বংশের অলঙ্কার বিবেকবান মাধবদাস এই প্রশস্তি রচনা করেছেন এবং যতদিন পৃথিবীতে সমুদ্র ও পর্বত অবস্থান করবে, ততদিন এই প্রশস্তি স্থায়ী হবে ।। ২১ ।।

সুজিৎ চৌধুরী

সুলতানী আমলের একটি অনালোচিত লিপি

সত্তরের দশকে প্রায়ই আমরা ছুটির দিনে আশপাশের গ্রামগুলোতে বেড়াতে যেতাম। এমনিভাবে ১৯৭৫ সালের এক শীতের সকালে আমরা নামলাম ধর্মনগর লাইনের করিমগঞ্জের পরবর্তী প্রথম স্টেশন সুপ্রাকান্দিতে। আমরা মানে আমার সঙ্গে দুজন সঙ্গী — একজন করিমগঞ্জ কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক সুকেশ বিশ্বাস, এবং অপরজন ঐ কলেজেরই দর্শনের অধ্যাপক বিজয়মাধব ভট্টাচার্য — যাঁর অকালপ্রয়াণ এখনও বুকে মোচড় মারে। যাই হোক, আমার আগ্রহের বিষয় ছিল লোকধর্ম—সুপ্রাকান্দি স্টেশনে নেমে জানলাম যে পাশের গ্রাম পীন্নগরে একটি কালীমন্দির রয়েছে। অতএব আমরা কালীমন্দিরের সন্ধানে যাত্রা করলাম।

মন্দির খুঁজে পেতে দেরি হল না। রক্ষাকালীর মন্দির, রক্ষাকালীর মূর্তিটি দিব্যি সুন্দর, তার পাশে একটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ। হিন্দুগ্রাম, বাসিন্দাদের মধ্যে নমঃশুদ্ররা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পুরোহিতের নাম শ্রীভূপতি চক্রবর্ত্তী—খুবই অমায়িক মিশুক মানুষ। কথায় কথায় তিনিই জানালেন যে তাঁর মন্দিরে একটি প্রাচীন শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে, মুসলমানী লিপি—ভাষা না জানায় ওঁরা তা পড়তে পারেন নি। এমনতরো প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, বিপুল উৎসাহ নিয়ে আমরা তা দেখতে চাইলুম। তিনি বললেন, 'চলুন-বাদশার থানে রেখেছি ওটা'।

এবারে বাদশার থান সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলা দরকার। করিমগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি কালীবাড়িতে একটি করে বাদশার থান রয়েছে। কালীবাড়ির চত্বরের মধ্যেই কোনো একটা জায়গায় বাদশার থানটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। থানের সাজসজ্জা একটু অন্যরকম, যথার্থ হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুসলমান পীর বা ফকিরের মাজার বা কবরস্থান যে-রকম থাকে, বাদশার থানকে সে-ভাবেই সাজানো হয়। অর্থাৎ একটা উচু জায়গা বেছে নেওয়া হয়, না হলে মাটি দিয়ে একটা জায়গাকে উচু করে দেওয়া হবে। কাঠের পাটাতন পেতে তার উপর সাদা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হবে, সেটা হল বাদশার শয্যা। উপরে টাঙ্গানো হবে চাঁদোয়া। কোনো কোনো সময়ে বাদশার শয্যার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় একটা লাঠি। বাদশাকে সন্ধেবেলা মোমবাতি দেওয়া হয়, যাঁরা মানত করে, তাঁরাও মোমবাতি দেয়। তাছাড়া গাভীর প্রথম প্রসবের পর তার দুধ, গাছের প্রথম ফল বা মাঠের প্রথম ফসল ইত্যাদি বাদশার প্রাপ্য বলে ধরা হয়। গ্রামবাসীরা বলেন এই বাদশা শিবেরই আরেক রূপ, যদিও আমার ধারণা তিনি দেবায়িত কোনো মুসলমান সন্ত। এ-বিষয়ে অন্যত্র আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি,[১] এখানে এ-প্রসঙ্গটি আর বিস্তৃত করছি না।

পীন্নগর কালীবাড়ির বাদশার থানটির আরেকটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেখানে বাদশার অধিষ্ঠান, সেখানে ভাঙ্গা পুরানো ইঁটের স্তূপ, সেই ইঁটের একাংশ পড়েছে পাশের পুকুরে। এবং সেই ইট দিয়েই তৈরি হয়েছে একটি ছোট্ট ঘরের মতো কাঠামো। পুরোহিতমশাই আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে যে পাটাতন দিয়ে বাদশার শয্যা তৈরি হয়েছে, তার উপর বিছানো সাদা চাদরটি

সরিয়ে ফেললেন। অতঃপর পাটাতনটি তুলে ধরতেই দেখা গেল এটা কাঠের পাটাতন নয়, মূলতঃ এটি কালো পাথরের একটি ফলক। তার একপার্শ্ব ফাঁকা, কিন্তু অপরদিকে সুদৃশ্য ফার্সি (আরবি) লিপিতে উৎকীর্ণ দীর্ঘ বয়ান রয়েছে। আশেপাশে ছড়ানো ইঁটগুলি আকারে ক্ষুদ্র, তিন-চারশ বছর আগে এমনি ইঁট ব্যবহৃত হত। তাতে অনুমান হল শিলালিপিটি প্রাচীনই হবে। কিন্তু ওটার পাঠোদ্ধার আমাদের সাধ্যাতীত। সঙ্গে ক্যামেরা নিই নি, তাই ছবি তোলাও তখন হয় নি। পুরোহিতমশাইকে লিপিটি যথাস্থানে রেখে দিতে বলে আমরা চলে আসি। লিপিটির ছবি নেওয়ার জন্য কিছুদিন পর আবার যাই পীন্নগরে। তখন আমার সঙ্গী ছিলেন পাবলিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (করিমগঞ্জ) অধ্যক্ষ প্রয়াত মতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। এখানে যে ছবিগুলি ছাপা হল সেগুলো তাঁরই তোলা।

লিপিটির পাঠোদ্ধারের জন্য দিই গৌহাটি কটন কলেজের আরবি ভাষার অধ্যাপক ইয়াহিয়া তামিজিকে। তিনি পাঠোদ্ধার করে লিপিটির বয়ানের একটি ইংরেজি অনুবাদ আমাকে দিয়েছেন। বয়ানটি নিম্নরূপ :

> The Prophet (May blessing and peace of Allah be upon him) said, "He who builds a mosque for the sake of Allah, Allah will build for him a house in paradise."
>
> The mosque has been built during the rule of the great and honoured king assisted by Allah, the Sultan, son of Sultan, the helper of matters worldly and religious, Abul Muzaffir Mahmud Shah Sultan, son of Hussain Shah, son of Sayyid Ashraful Hussain, let Allah make his kingdom and sovereignty everliving.
>
> This has been founded by Muqarrib Khan, may his elevation continue, in the year nine hundred forty one (i.e. 941 A.H.)

অর্থাৎ লিপিটির প্রথম অংশে রয়েছে কোরাণের একটি বাণী, যার অর্থ হচ্ছে মর্ত্যে যে ব্যক্তি একটি মসজিদ তৈরি করে, বেহেস্তে তার জন্য তৈরি হয় একটি রাজপ্রাসাদ। দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য হচ্ছে এটি একটি মসজিদ স্থাপনের স্মারক, বাংলার সুলতান হোসেন শাহের পুত্র মহম্মদ শাহের আমলে এটি তৈরি হয়েছিল, তৈরি করিয়েছিলেন জনৈক মুকারিব খান, যাঁর অন্য কোনো পরিচিতি লিপিটিতে নেই। মসজিদ স্থাপনের তারিখ হচ্ছে ৯৪১ হিজরি অর্থাৎ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দ।

যেকোনো প্রাচীন লিপিরই কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ শ্রীহট্ট জয় করেছিলেন আমরা জানি, তাঁর আমলে নির্মিত একটি মসজিদ ছিল করিমগঞ্জ জেলার কালীগঞ্জে, তার শিলালিপিটিও আবিষ্কৃত হয়েছে। লিপিটি দীর্ঘদিন করিমগঞ্জের মহকুমা শাসকের দপ্তরে ছিল, সেখানে এর অযত্ন দেখে কালীগঞ্জের অধিবাসীরা তা নিয়ে যান। এখন সম্ভবতঃ এটি রয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত মৌলনা আব্দুল মুনিম চৌধুরীর বাড়িতে। যাই হোক, হোসেন শাহের আমলে শ্রীহট্টের শাসনকার্য কীভাবে চলত তার কিছু বিবরণ অচ্যুৎচরণ চৌধুরীর 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রয়েছে।' মুহম্মদ শাহের আমলের কোনো বিবরণ নেই। হোসেন শাহের আমলেই দরবেশ শাহজলালের অনুগামীদের বংশধরদের হাত থেকে শ্রীহট্টের শাসনভার চলে যায় গৌড়

থেকে নিয়োজিত পাঠান রাজকর্মচারীদের হাতে বলে অচ্যুৎচরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি এ আমলের শ্রীহট্টের ক'জন শাসকের নামও দিয়েছেন, যাঁরা হোসেন শাহ বা তাঁর পুত্র কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিলেন, এর মধ্যে আমাদের আলোচ্য লিপির প্রদাতা সুকারিব খানের নাম নেই। হয়তো তিনি শ্রীহট্টের পুরো অঞ্চলের শাসক ছিলেন না-করিমগঞ্জ অঞ্চলের স্থানীয় শাসক হিসাবে শ্রীহট্ট থেকেই নিয়োজিত হয়েছিলেন। হোসেন শাহ মারা যান ১৫২০ খৃষ্টাব্দে, আর বঙ্গের উপর তাঁর বংশের আধিপত্য শেষ হয় ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে। মহম্মদ শাহের আমলের ঐ শিলালিপি প্রমাণ করছে যে হোসেনশাহী বংশ মোটামুটি ঐ পুরো সময়টাই শ্রীহট্টের উপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

দুই

রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পীন্নগরের ঐ শিলালিপি যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের ধারণা সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে এর গুরুত্ব আরো বহুগুণ বেশি। নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু এই লিপিটি যে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিচিত্র ও বিস্ময়কর পর্যায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে-সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম।

প্রথমেই ধরা যাক গ্রামের নাম রয়েছে পীন্নগর। ওটা যে পীরনগরের স্থানীয় রূপ, তা নিশ্চিত। অর্থাৎ কোনো পীরের সঙ্গে গ্রামটি সংশ্লিষ্ট ছিল এককালে। সেই পীরের সূত্রেই যে মসজিদটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাও অনুমান করা চলে। পুরোহিতমশাই বলেছেন যে শিলালিপিটি তাঁরা পেয়েছেন মন্দির সন্নিহিত পুকুরে। ঐ পুকুরেও ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ রয়েছে, তা আগে বলেছি। পুকুরেরই সংলগ্ন ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপে তৈরি করা হয়েছে বাদশার থান। ঐ সমস্ত ইঁটের স্তূপ নিশ্চিতই ঐ মসজিদেরই ধ্বংসাবশেষ এবং তার মধ্যেই পাওয়া গেছে শিলালিপিটি। তাই হওয়া স্বাভাবিক।

এখন ঐ চত্বরটাতে রয়েছে একটা কালীমন্দির, বাদশার থান, পুকুর, ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ-সবই ঐ কালীমন্দিরের মধ্যে। পীরের স্মৃতি ধারণ করছে যে গ্রামনাম, তার অধিবাসীরাও সবাই হিন্দু। অনিবার্যভাবেই যে প্রশ্নটা মনে জাগে তা হল তবে কী কোনো মুসলমান গ্রামই পরিণত হয়েছে হিন্দুগ্রামে এবং মসজিদ রূপান্তরিত হয়েছে মন্দিরে! কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু এমনতরো সরল সমাধানের পথে কিছু যুক্তিগত বাধা রয়েছে।

প্রথমতঃ স্থানীয় মুসলিম সমাজ বা লোকায়ত ধারণায় এ-ধরণের পটপরিবর্তনের কোনো স্মৃতি টিঁকে নেই। অন্ততঃ মসজিদ যদি মন্দিরে পরিণত হত কোনো সংঘাতের মাধ্যমে, তবে তার স্মৃতি একেবারেই মুছে যাওয়ার কথা নয়, অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট সংঘাতের একটা অনুরণন বহমান থাকত। দ্বিতীয়তঃ কোনো মসজিদকে বলপূর্বক মন্দিরে রূপান্তরিত করতে হলে তার পেছনে রাজশক্তির সাহায্য একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত। কোনো পরাক্রমশালী ধর্মান্ধ হিন্দু রাজার আমলেই এমনটি ঘটা সম্ভব। অথচ ইতিহাসে আমরা তেমন কোনো হিন্দু রাজশক্তির এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের বিবরণ পাই না। হোসেন শাহের পর শের শাহ, তারপর মোগলরা ধারাভাহিকবাবেই এই অঞ্চল শাসন করে গেছেন একেবারে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের আগে অবধি। অতএব

সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এমনটি ঘটেছে এ-সম্ভাবনা বিচার করার পক্ষে তেমন কোনো জোরদার বস্তুভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাহলে অন্যতর সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে হয়। বস্তুতঃ সেই ধরণের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই আলোচনার অবতারণা। বাংলার লোকায়ত সমাজে পীর-ফকিররা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, এমনতরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় ধর্মীয় সহাবস্থান, সমন্বয় ও সহমর্মিতার একটা পরিবেশই তাঁরা তৈরি করেছিলেন। এই সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবার তাঁরা দেবায়িত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ, উত্তরবঙ্গের সোনা রায় বা সোনাগাজি এবং আমাদের বাদশা তার দৃষ্টান্ত। আমাদের বরাক উপত্যকায় পীরের থান, মাজার বা মসজিদের পাশাপাশি মন্দিরের সহাবস্থানের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে দেবস্থানকে যে মোকাম বলা হয়, তার মধ্যেও এই সহাবস্থানের ইঙ্গিত রয়েছে। এই খোলামেলা লেনদেনের পরিবেশ ঠিক কী প্রক্রিয়ায় কোন কোন উপাদানের সংযোগে ঘটেছিল, তার পূর্বস্বরূপটি আজও উদ্ঘাটিত হয় নি। তা না হলে পীন্নগরের শিলালিপির সামাজিক পশ্চাদপটও স্পষ্ট হবে না। আমার ধারণা বরাক উপত্যকার লোকায়ত সমাজে এখন সমস্ত ধ্যানধারণা ও ধর্মাচারের অবশেষ বর্তমান, যার সাহায্যে এই স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা সম্ভব। তরুণ গবেষকরা যদি গ্রামে-গ্রামান্তরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো লোকায়ত উপাদান ব্যবহার করে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিস্মৃত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উন্মোচিত করেন, তবে তাঁরা শুধু ঐতিহাসিক হিসাবে নয়, সামাজিক মানুষ হিসাবেও একটা অতি জরুরি কর্তব্য সম্পাদন করবেন। উল্লেখ্য যে এই লিপিটি নিয়ে আগে কোনো আলোচনা করিনি, বা এটি এর আগে কোথায়ও প্রকাশও করিনি। বহুদিন আগে শুধু এই লিপি আবিষ্কারের সংবাদটি কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

টীকা ও সূত্র :

১ আমার Folk Lore and History: A study of the Hindu Folk Cults of the Barak Valley বই-এ বাদশার উপাসনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে বাদশা বা সাহিজা বাদশা মূলতঃ দরবেশ শাহজালালের সঙ্গে আগত আউলিয়াদের একজন। তাঁর নাম ছিল শহীদ হামজা, যা স্থানীয় ভাষা 'সহিজা'তে পরিণত হয়েছে। লোকশ্রুতি অনুসারে শহীদ হামজা বাঘের উপর, সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। বাদশার বাহনও বাঘ। আমি আরো দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এই অঞ্চলের আদিম ব্যাঘ্রদেবতা বাঘাই বাদশার সঙ্গে মিশে গেছেন। আমাদের এই অঞ্চল বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়গুলোর অন্যতম ছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে মৃত শ্রমণের সমাধিপূজার প্রচলন ছিল। যেহেতু এ-অঞ্চলের ধর্মান্তর-প্রক্রিয়া বৌদ্ধদের মধ্যেই বেশি কার্যকর হয়েছিল, অতএব নব্য মুসলমানদের পক্ষে পীর-ফকিরদের কবর বা মাজার উপাসনা অনায়াসে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় নি। আর তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও অধিকাংশই তৎকালে ছিলেন বৌদ্ধধমাশ্রিত, মুসলিম পীর-ফকিররা বনজঙ্গলে বসতি বিস্তার করার ও কৃষি সম্প্রসারণের ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এই হিন্দুরাও তার সুফল ভোগ করেছিলেন। ফলে তাঁদের পক্ষেও 'মাজার' উপাসনায় শরিক হতে অসুবিধা হয় নি। সম্ভবতঃ এই প্রক্রিয়াই মুসলিম পীর হিন্দু দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে কালীবাড়িতে স্থান করে নিয়েছেন। আমার বইটির ছাপার কাজ চলছে। এর মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

২ অচ্যুৎচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৫৪-৫৬।

৩ অধ্যক্ষ ডঃ কামালুদ্দিন আহমেদ এ-ধরণের কয়েকটি সহাবস্থানের দৃষ্টান্তের কথা আমাকে বলেছেন।

চিত্র পরিচয় :

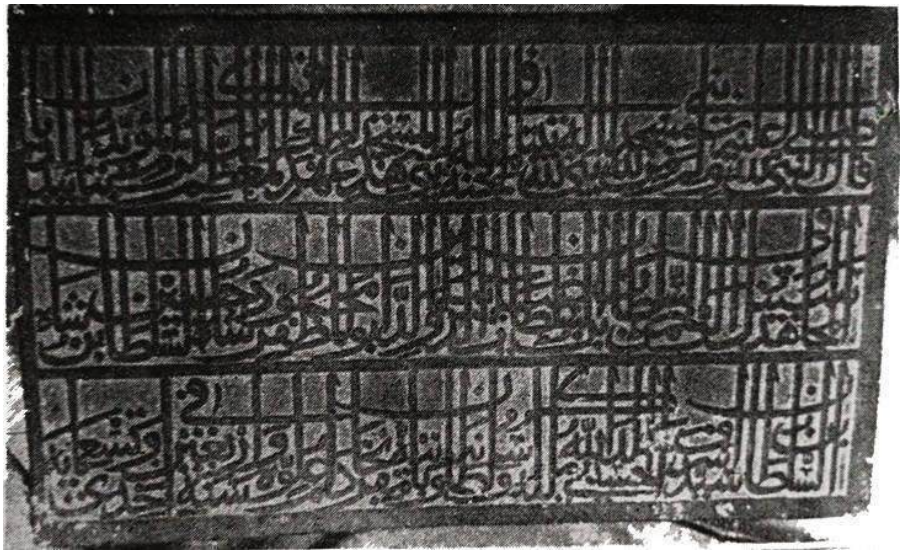

১) পীন্নগরে প্রাপ্ত শিলালিপি

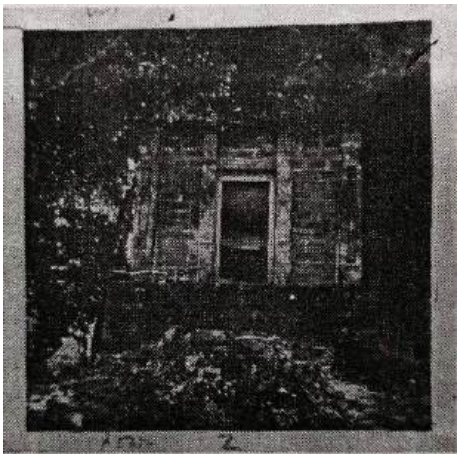

২) পীন্নগর কালীবাড়ীর মধ্যে অবস্থিত বাদশার থান, শিলালিপিটি ওখানে রক্ষিত।

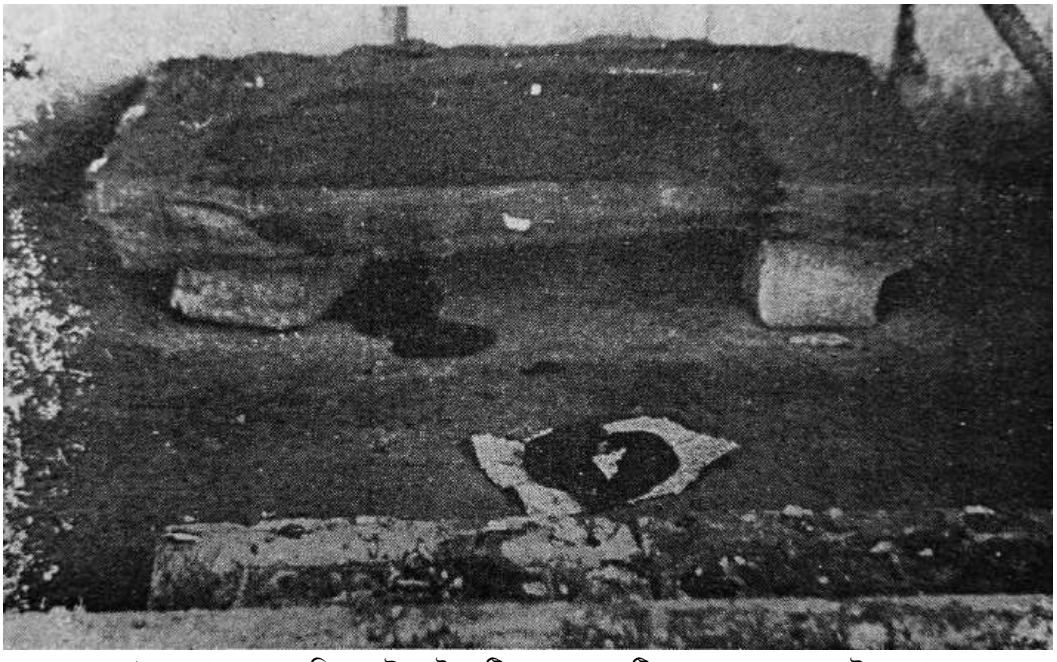

৩) বাদশার থানে রক্ষিত এই পাটাতনটি আসলে একটি প্রস্তর ফলক। এর উপর সাদা চাদর বিছিয়ে বাদশার শয্যা তৈরি করা হয়। চাদর সরিয়ে ছবি নেওয়া হয়েছে। এই ফলকের নীচের অংশে লিপিটি উৎকীর্ণ।

দেবব্রত দত্ত

কাছাড়ে চা-শিল্পের আদিপর্ব : অপ্রকাশিত কয়েকটি সরকারি পত্র

শিলচর গুরুচরণ কলেজে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে আমার কর্মজীবনের সূচনা পর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ডঃ এন. কে. সিংহের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। পড়াশুনা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্র ধরে ডঃ সিংহ আমাকে বলেছিলেন, একজন শিক্ষক যদি গবেষণামূলক কাজকর্ম না করেন তাহলে কিছুদিন পরেই পড়ানো ব্যাপারটা একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে। কি ধরনের প্রকল্প নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করব—আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ডঃ সিংহ আমাকে কাছাড় জেলার পুরনো নথিপত্র নিয়ে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন; বিশেষতঃ তিনি সরকারি নথি সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠটি (District Record Room) ঘেঁটে দেখতে বললেন। ডঃ সিংহের এই নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে শিলচরে ফিরে এসেই প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে নথিপত্রগুলো ঘেঁটে দেখতে শুরু করি। ব্রিটিশ যুগকেই আমি আমার অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। ব্রিটিশ রাজশক্তি কাছাড় অধিগ্রহণ করে ১৮৩২ খ্রীঃ। কিন্তু আমাকে কাজ শুরু করতে হয় ১৮৩৪ খ্রীঃ থেকে; কারণ প্রথম দুই বছরের অর্থাৎ ১৮৩২ থেকে ১৮৩৪ খ্রীঃ কোন নথিপত্র রেকর্ডরুমে নেই। কারণ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ঐ সময়কালের নথিপত্রগুলো পুড়ে গেছে। পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখার সময় এ সম্পর্কিত একটা নোট পেয়েছিলাম; ডেপুটি কমিশনারের কাছে লেখা নোটটিতে 'রেকর্ড কীপার' জানিয়েছেন, পুরনো নথিপত্র তিনি পাঠাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু প্রথম দু-বছরের কোন নথিপত্র তিনি পাঠাতে পারছেন না, কারণ পূর্বতন ডেপুটি কমিশনার মিঃ বার্নস-এর বাংলো যখন পুড়ে যায় তখন ঐ বাংলোতে রক্ষিত প্রথম দু-বছরের নথিপত্রগুলোও ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই দুর্ঘটনায় ইতিহাসচর্চার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কারণ ইংরাজ অধিগ্রহণের সূচনালগ্নের বহু মূল্যবান তথ্যই চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলতেই হয়, নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রশাসকেরা অনেক বেশি যত্নশীল ছিলেন। কলকাতার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারদের প্রত্যেক মাসে চিঠি লিখে জানাতে হত নথি সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠের নথিগুলো অটুট আছে কিনা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে বাধ্য হচ্ছি, স্বাধীনতা উত্তরকালে অত্যন্ত দ্রুত নথি সংরক্ষণের পন্থা পদ্ধতির অবনতি ঘটে। আমি যখন নথিপত্র নিয়ে কাজ করেছি তখন বলা মাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্মীরা প্রয়োজনীয় ফাইলটি এনে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই কর্মদক্ষতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই ক্রমাবনতির জন্য আমাদের ইতিহাস-বিমুখ মানসিকতাও দায়ী। স্বাধীনতা উত্তরকালে নথি সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠটির যেমন কোন উন্নতি হয়নি, তেমনি নথি সংরক্ষণের কোন বৈজ্ঞানিক পন্থাপদ্ধতিও অনুসৃত হয়নি। ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান এসব নথিপত্র সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্য যে কি শোচনীয় মাত্রায় পৌঁছেছে এসম্পর্কিত একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। নথিপত্র নিয়ে কাজ করার সময় প্রকোষ্ঠটির দুরবস্থার প্রতি আমি তৎকালীন ডেপুটি কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেছিলেন, 'ইংরেজরা তো চলে গিয়েছে, এখন ওদের আমলের রেকর্ড দিয়ে কি হবে?' কয়েকবছর আগে নয়াদিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানা থেকে

একজন বিশেষজ্ঞ এখানে এসেছিলেন। নথি সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠটি দেখে তাঁর মন্তব্য ছিল, একমাত্র ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমাই এখন নথি সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠটিকে রক্ষা করতে পারে। আমার নির্দেশমত কয়েকজন গবেষকও স্থানীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহী হয়ে নথি সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই হতাশ হয়েছেন। এই নৈরাশ্যের মধ্যেও একটা আশার আলোও অবশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেবেন এবং মূল্যবান নথিপত্রগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে।

আমার অধ্যয়নের পরিধির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত নথিপত্রগুলো আমি ঘেঁটে দেখেছি এবং এই অনুসন্ধানের অংশ বিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। * বাকী অংশ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই রয়ে গেছে।

নথিপত্রগুলো ঘেঁটে দেখবার সময় কাছাড়ের চা-বাগান সম্বন্ধে কতগুলো মূল্যবান চিঠি পাই। এই চিঠিগুলোতে কাছাড়ে কিভাবে চা-বাগান পত্তন হয়েছিল তার একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আছে। এই চিঠিগুলোকে ভিত্তি করে 'Beginning of Tea Industry in Cachar' নামে একটি নিবন্ধ লিখি; নিবন্ধটি গুরুচরণ কলেজ (শিলচর)-এর মুখপত্র 'পূর্বশ্রী'তে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধ প্রকাশের কয়েকদিন পরেই আমি লণ্ডন থেকে গ্রিফিথস্ সাহেবের একটা চিঠি পাই; তিনি লিখেছিলেন, উক্ত নিবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যগুলো আমি কোথায় পেয়েছি—কোন সাধারণ পাঠাগারে না কি কোন ব্যক্তিগত সংগ্রহে? সবশেষে তিনি তাঁর THE HISTORY OF THE INDIAN TEA INDUSTRY (author—Sir Percival Griffiths, London, 1967) নামক গ্রন্থে আমার নিবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি চেয়েছিলেন। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এবং আনুষঙ্গিক তথ্য উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে আমার অধ্যয়নের ক্ষেত্র আমি আরও বিস্তৃত করেছিলাম এবং বরাক উপত্যকার পুরনো বাড়ীগুলোতেও আমি নথিপত্র অনুসন্ধান করেছি। নন্দমোহন বর্মণ নামে আমার এক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে বর্মণ অধ্যুষিত গ্রামগুলো পরিক্রমা করার সময় বহু হাতে লেখা পুঁথি আমার নজরে পড়েছে। তবে এসবই মূলত: গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ। এসব পুঁথিগুলোতে সংশ্লিষ্ট জনমানসের ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইতিহাসের মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সে রকম কোন পুঁথি অন্ততঃ আমি পাইনি। শহরের বিভিন্ন বাড়ীর নথিপত্রও আমি দেখেছি—তবে মূল্যবান কাগজপত্র পেয়েছি একমাত্র চন্দ বাড়ীতে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনে হয়েছে এখনও অজস্র নথিপত্র বিভিন্ন পারিবারিক সংগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ রয়ে গেছে। গবেষকদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যাওয়ায় এসব নথিপত্রকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় একদিকে গবেষকদের উদ্যোগী হয়ে নথিপত্রের সন্ধান করতে হবে, অন্যদিকে নথি সংরক্ষণ ও সংগ্রহের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এজন্য প্রথমেই একটি অনুসন্ধান প্রকল্প

---

* Datta, D., ed. *The Cachar District Records*, Silchar, 1969.

হাতে নেয়া দরকার, কারণ, বরাক উপত্যকায় আজ পর্যন্ত কোন প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় নথিপত্র অনুসন্ধানের কাজ হয়নি; স্বল্প সংখ্যক যে কয়েকটি নথিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত নথিপত্রের একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রণয়ন করা দরকার যা নূতন প্রজন্মের গবেষকদের তথ্য সন্ধানের সহায়ক হবে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। District Records Room-এ নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময়ে কাছাড়ের চা-শিল্পের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত যে চিঠিগুলো আমার হাতে এসেছিল, তার বেশির ভাগই এখনো প্রকাশিত হয় নি। অথচ, চিঠিগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এ সব কিছু বিবেচনা করেই চিঠিগুলোকে মুখ্যতঃ তরুণ গবেষকদের সুবিধার্থে এখানে উপস্থাপন করছি। বলে রাখা ভাল, বহু চিঠিই আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। অনেক চিঠিই আজ নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে উপস্থাপিত চিঠিগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতায় প্রায়শঃই ছেদ পড়েছে। এতৎসত্ত্বেও নিম্নে উপস্থাপিত চিঠিগুলো অন্বেষুজনের কাজে লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পত্র—১

No. 180 of 1855

To
W. Grey, Esqr.
Secretary to the Govt. of Bengal.
Fort Willam, Dated,

Cachar 10th July, 1855.

Sir,

As no doubt it will prove interesting to this Honour the Lieutenant Governor of Bengal I have the honour to state for his information that I have ascertained that the real tea plant is indigenous to this province, it growing wild in the jungles.

I submitted specimens of the plant to Dr. Thomas, Supdt. of the Govt. Botanic Garden, Calcutta, and to others, and all agree in considering them identical with the tea plant of Assam. Dr. Thomson, in a letter received from him two days since says, “The specimens forwarded by you are beyond any reasonable doubt the true tea plant (Assam Valley). The capsules are those of the Thea and not like those of any Caseicllia with which I am acquainted.

Amongst other I sent some specimens to a Mr. Williamson, who has a Tea Plantation at Jorhat in Assam, and who is most anxious to embark in an enterprise at once and says that if sanctioned by Govt. he would be prepared to take up lands to the extent of 500 acres and to commence active experiment in the coming cold season, but he first wishes to know on what terms he could obtain a grant of land.

On my first ascertaining that the plant discovered was the genuine tea plant, I sent people in several directions into the jungles to look for it, and wherever I sent, the plant was found, more or less abundant, and no doubt on search being made, it will be found in the jungles wherever there are low hills. In one place there are several acres of land covered with the plant, and where, were the jungle plants removed, there would be a tea plantation already to commence with.

If I might be permitted to make a recommendation it would be that an experimental tea plantation should be sanctioned by Govt. to be commenced upon at once, were it even on a small scale. If successful it might turn out very advantageous to my district, and tend to develop quickly the resources of it. For Cachar being easy of access at all times of the year, either by land or water, and labour being to be had in abundance there is no doubt but that before long the demand for tea lands would become very great, and large tracts of waste jungles lands might be reclaimed and be brought under cultivation. And should the above meet well with the appreciation of His Honour the Lieutenant Governor, I would be most happy to do everything in my power towards superintending the plantation.

When in the Mofassil last February the first specimens I saw of the Cachar plant, were brought to me by an individual who had been employed in a Tea plantation in Assam, and who recognised the plant, and as an inducement to others, to bring to my notice any discoveries they may make I beg to suggest that he be given a present of some thirty or forty rupees, or any sum which may be considered sufficient. Further I beg to state for the information of His Honour that I have reported regarding the above discovery to C.T. Davidson Esq. Commissioner of Revenue of the Dacca Division.

Further I beg to be excused taking advantage of this opportunity of requesting to be permitted to offer a reward of Rs. 100/- to any person who will point out to me in Cachar where good coal or lime stone is to be procured near water caiirage for if either are discovered great advantages might ensue to the province.

I have etc.
G. Verner.

পত্র—২

To
Parbutty Churn Bunnoorjee,
Banker & Agent, Sylhet.

Dated, Cachar 23rd July, 1855

Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your letter, dated 18th instant, requesting to be informed, if I can grant you any lands in Cachar by way of Zumeendarree, and if so, on what term etc.

In reply I beg to inform you that there are large tracts of lands available in the province for the purpose you require, high and low lands, good and bad, and where all the articles you mention would no doubt be cultivated with great advantages.

The real tea plant I have ascertained is indigenous to Cachar, and is to be found growing wild in the jungles in almost all directions, and might be cultivated with very great advantages. Coffee also thrives well in Cachar, Cotton is cultivated by the Hill tribes, Kookies, Cacharies and Nagahs to a very considereble extent, the Cachar 'Goor' is, I have been told, by those who have cultivated the sugar-cane, in the upper provinces of India, of a very superior description, and well adopted for the manufacture of sugar cinnaman and Cafsia are I fancy to be found growing all over the mountains.

In Cachar there have not been as yet any hill or mountain lands leased; they are all the property of Govt. and as no applications have ever been made for lands of the kind I cannot at present inform you on what terms you could obtain, the highest rates at present demanded by Govt. for lands leased are Rs. 3/- per koobla or about 10 annas per acre per annum.

Should you wish to obtain a Zumeendarree in my district I would strongly recommend that in the first instance you should come up here yourself in order to fix upon a suitable locality, and determine what quantity of land you might require after which arrangement might be made, and I shall have much pleasure in giving you all and every information in my power. I trust therefore you will come up and see for yourself.

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—৩

No. 211 of 1855

To

R. Houstonn Esqr.

Dated, Cachar 4th Sept. 1855

Sir,

The day before yesterday I had the pleasure of receiving your letter dated 24th ultimo, making enquiries regarding tea and other lands in the provices of Cachar, also regarding the amount of labour procurable—wages etc., and the routes to Cachar from Calcutta etc. In reply I beg to inform you that you can obtain any quantity of land in Cachar that you may require, fit and suitable, either for the cultivation of tea, cotton, rice, sugarcane, mustard seed, and if I am not very much mistaken, on which Indigo would also thirve well.

I have some of the finest lands in my district waste, and available for any party wishing to obtain a Zummundaree, and which were formerly, many years since, under cultivation, but which were deserted owing to the incursions of Kookies, long before Cachar became part of the Company's territories, and have not since been resumed. With regard to tea lands, it is only a couple of months since I ascertained that the real tea plant is indigenous to this province and that it is growing wild in the jungles, not in a small patches only, but also in large, and as far as I have been able to ascertain in that short period, extending over a considerable quantity of land with room sufficient for several plantations of say one thousand acres each. As yet I have only caused search to be made for the tea plant in the likely jungles nearest to this station and the searcher has been most successful, for here, them and everywhere within a certain distance and on a particular description of land the tea plant has been found growing in abundance, of course in some places the number of plants is much greater than in others. Tea is found practically growing on very low hill lands that are above inundation in a rich, rather reddish soil in some places extending over some thirty, forty acres or more, no measurements have been made. Some fifty sixty large tea trees have been found in different localities all bearing seed and on one of them at Barrahangun, where the first party has commenced clearing away the jungles for a tea plantation. The Overseer told me, that in one acre there might be some tree, four hundred or more young tea plants, on one hill, containing 50 to 100 acres, and of the same description of land any quantity may be had, not in one place but in several places with a number of old tea trees, some of them three, four or even more fact in girth, here and there, and where they are, many young plants are to be found, but to obtain a regular tea plantation of say 1000 acres it would be of course

necessary to sow seed, and as seed trees have been found in all directions, each party obtaining a grant of land might collect a sufficient quantity of seed from his own trees. The seed is now ripening, and any person who has made up his mind to embark in the enterprise, and try tea planting in Cachar I recommend strongly his not losing one day, but that he should set people to work at once to clear away the jungles. About the old tea trees so as to be able to collect the seed or it will be lost, as will also another year.

As yet the tea plant has only been discovered to the south and southwest of Silchar my sudder station on the hills low hills in east and west of the Chatla Howhar distance from this 12 miles or so. To one of two places you can go by land all the year round, to those places in the Chatla Howhar, during the rains, you can only to by water, in the cold whether by land. The Chatla Howhar is an immense plain, inundated during the rains, but with ranges of hills in all directions, and which hills are almost all fit for the cultivation and available. The names of the Principal places, where I have ascertained that the tea plant is growing in greatest abundance, and at each of which, there might be sufficient room for two plantation, are on the Bargoongoor Hills, four miles south of this, in the Chatla Howhar at Baokara and Nawowalla near the Gagera river at Barrahangun near Hylaka-ndy, where a gentleman in Assam a tea planter, has commenced and at Infang east of Rajnuggur Pargunnah no measurement have been made of the hills so I cannot tell you of what extent they are, but threre can be no want of land, fit for tea cultivation in Cachar, there being low hills in all derections, and on which no doubt before long tea will be found now that the inhabitants many of them know the plant. With regard to labour I do not anticipate that there will be any great difficulty in obtaining the quantity which may be required, if not in Cachar, in the neighbouring districts of Sylhet the inhabitants of which district and of district and of Jynteah come very willingly to Cachar and settle down in it.

The pay of labourers in the station is Rs. 2/8 per mensem, but at a distance from their homes they would require higher pay. I would always pay them in cash, and if employed on a tea plantation at a distance from a bazar I would have a godown where they would get all necessary supplied. Many are anxiously looking out plantations to be commenced upon, and very few days pass, that some people do not ask me about it. The plan would be to entertain Daffadars and Sirdars who would engage to keep up a certain number of coolies always at work and if well-treated the coolies would remain and work as long as they are paid and the numbers of them would gradually increase according to the demand.

There is no difficulty in reaching Cachar from Calcutta at any time of the year, by water in two or three and twenty days, or in a quick boat in half that time. In the dry weather, from the Megna into the Soorma river, via Ozmureegunge, Soonamgunge, Chatuck and Sylhet, on to the Barak river to this. In the rains the more direct route would be from the Megna, to the

Kooseearash or Barak and up at via Hubbigunge and Nubbigunge to this and without touching at Sylhet. Except in the cold weather, it would not be possible to reach Cachar, through the district of Sylhet in any other way, but by water.

Any person intending to cultivate tea in Cachar should employ some person at once to look out the best locality and to collect the seed. I have already received four or five applications for tea lands from parties willing to embark in the enterprise on a larger scale and besides the half dozen applications you tell me I may calculate on receiving, I have also heard of some half a dozen more persons who purpose applying, but I am anxious to see work commenced. I have just received a letter from Assam from C. L. Jarkins, who appears to think that if I can find the tea plants growing on the high mountains, that the chances are it would be very superior to the tea of the low lands. I have not caused any search to be made there yet, but I will do so during the cold weather and also in other directions where I have no doubt but that the plant will be found. I trust that the above contains all the information you require.

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—৪

To
Alfred P. Sandeman Esqr.
Calcutta.

Dated, Cachar 25th October 1855

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter dated 9th instant soliciting a grant of 500 acres of Tea Land in my district to be pointed out by your agent, and in reply beg to inform you, that I shall have much pleasure in letting you have the land, and cause your application to be registered. The terms on which grants will be made have not yet been determined on by Govt.

I have the etc.

G. Verner.

Cecil Huttman of 28 Tank Square, Calcutta asked for 500 acres (No. 234, 55 dt. 25th Oct.)

George Cowan of 3 Council House Street, Calcutta for 500 acres (235 dated 25th Oct.)
Thomas Barry 3 Council House Street—a grant of land—acres not mentioned.
W. Spink of 6 Govt. Place for 700 acres, 20th Oct.
Thomas Hewitt of 3 Council House Street, for 600 acres—dated 5th Nov. (238)
M. Herring, Silchar for 5 to 700 acres in Serrispor purgana (253) 25th Nov.
I. Mackintosh Esq. 14, Strand Street, Calcutta—quantity not mentioned.
Mr. Sweettand to select land (263 of 1855, 8th Dec.) ref. very satisfactory.
Lt. Vincent 30th Agent N.I. Cachar applied for 1000 acres for his brother (2 of 1856, 4th January).

পত্র—৫

No. 256 of 1855

To

J.B. Barry Esqr.

3, Council House Street, Calcutta.

Dated, Cachar, 26th Nov. /55.

Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your letter dated 11th instant informing me of your having engaged Mr. Shuttleworth as your special agent for the management of the lands you have applied to obtain as grant in this province and that you had also given him permission to act for several other gentlemen during the absence of other Agents who also purpose cultivating the tea plant.

In reply I beg to say that I am very glad indeed, that you have sent an Agent and that your purpose carrying on operations on a large scale. No difficulties shall be thrown in the way of your agent, that can possibly be avoided; on the contrary I shall have much pleasure in giving him every assistance in my power and I trust he will be able to find eligible sites containing the quantity of land you are likely to require.

3rd para....

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—৬

No. 271 of 1855
J.B. Shadwell Esq.
Cherra Poonjie.

Dated, Cachar 27th Dec. /55

Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your letter dated 17th inst. applying for a lease of one thousand acres of Tea Land in my district and in reply beg to infrom you that I have caused your name to be registered as an applicant for the same. At the same time I beg to bring to your notice that in order to bring a thousand acres of land under tea cultivation it is calculated that it would entail an outlay of at least one lac of Rupees, at the rate of rupees one hundred per acre.

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—৭

No. 75 of 1856
To
Sergeant Fitzgerald, Cachar

Dated, Cachar, Camp Hurreteekar 3rd Feb. '56

Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your letter dated 31st ultimo making an application for a grant of jungle lands of 500 acres in Purganna Huleakandy for the cultivation of tea, and in reply beg you will inform me, if the grant is for yourself and if so, if you have the means of bringing such a large grant under cultivation, which I have been given to understand, would require an outlay of half a lac of Rupees.

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—৮

No. 95 of 1856

To
Sergeon C.R. Chalmers,
Care of Messor Gillanders, Arbuthnot. Calcutta.

Dated, Cachar 5th May 1856

Sir,

In reply to your letter of the 15th ultimo I beg to inform you that your name has been registered as an applicant for a grant of one thousand acres of tea lands in this district.

2nd. Some three or four parties have commenced work, and from all accounts they appear to be very well satisfied with their prospects, and entertain the hopes of making large sums of money by the cultivation and manufacture of tea in Cachar and in which I trust they will all be eminently successful.....

3rd.....

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—৯

No. 234 of 1856

To
W. Grey, Secretary to the Govt. of Bengal
Fort Willam.

Dated, Cachar 17th Nov. 1856.

Sir,

.....

2nd .....

3rd ..... The demand for 1855/56 Rs. 96,641-12-1, Rs. 31714-3-5 in excess of the demand in 1852/53 which amounted to Rs. 64,927-8-8, the year to which Mr. Mill's report referred an increase in three years of almost

one half, and the demand for the current year, all sources of revenue included, will exceed Rs. 104,000 which I trust will be considered satisfactory, and prove that the province of Cachar is thriving.

4th. The population is also increasing rapidly in 1852 it was estimated at Rs. 85,552, but from returns just completed, which were made with great care, I estimate the number of inhabitants at 125405 also an increase of almost one half, and now that several parties have commenced the cultivation of tea in this district, no doubt the demand for labour, and the great expenditure for many which must consequently take place, will cause many persons and families of the labouring classes to settle down here which will cause an increase to the population and eventually to the revenue also.

I have the etc.

G. Verner.

পত্র—১০

No. 65 of 1858

To
The Commissioner of Revenue,
Cherrah.

Dated, Cachar 19th April, 1858

Sir,

I have the honour to forward for confirmation the map and papers relative to the grant for waste lands applied for by Mr. G. Williamson for the purpose of Tea Cultivation.

2nd. Mr. G. William was the first gentleman who applied for lands after the discovery of the Tea plants in the district and in consideration of his energy in this respect Govt. order that he should obtain the tea lands rent free for one year longer than the period mentioned in the Assam rules.

3rd. Mr. Williamson has commenced the cultivation of tea with great spirit and his garden is further advanced than that of any other in Cachar. His application is a very moderate one amounting to only 500 acres as surveyed and there is every probability of his being able to meet the Govt. demands and requirements upon it. Mr. Williamson having already a large and flourishing tea plantation in Assam.

I have etc,

R. Stewart.

Off. Supdt.

পত্র—১১

No. 88 of 1858

To
The Commissioner of Revenue,
Cherra.

Dated, Cachar the 26th May, 1858

Sir,

.....

2nd. You will perceive that only one of the grants has as yet been regularly settled. The others have mostly all been surveyed and some of them partially mapped, but in the latter part of them work consists the great difficulty as there is only one competent draughtsman in Cachar.

3rd. The delay in the final settlement of these grants has not in the least retarded the progress of the cultivation, all the applicants who have felt so inclined have commenced operations. Some three or four thousand acres must already be cleared, and the yield of tea during the present year, may be estimated at not less than two or three hundred maunds gathered almost entirely from the indigenous trees.

4th. In my opinion a Govt. experimental plantation is quite necessary as most of the parties engaged have entered into the concerns with spirit and are most sanguinely alive to its profits, which are expected to be enormous.

I have etc,
R. Stewart.
Off. Supdt.

পত্র—১২

To
The Sanderman Esquire,
Cachar, Goongoor Hill.

Dated, Cachar 13th May/58.

Sir,

In answer to your letter of to-day's date with reference to the importation of labour into Cachar. I have the honour to state that I am of opinion it would be a measure attended with much benefit to the country and to the tea planting interest.

2nd. The climate of Cachar is a healthy one and I think it very probable that if coolies were imported they would settle here for food, and form a permanent population. Every facility should therefore be given them for prosecuting a cultivation of their own as well as labouring for the tea gardens. Once settled on a piece of land which they had cleared themselves and which they call their own, I do not think that it is at all probable that men who are so badly off as to be obliged to shift themselves off to Mauritius and the West Indies for subsistence would ever think of quitting and you would thus have a lasting supply of labour settled on your grants.

3rd. The coolies on first coming up to Cachar, that is before leaving Calcutta should be bound down by an agreement to serve for a certain number of years, a breach of this agreement, if the documents were regularly and fairly drawn out, would subject the delinquent to one month's imprisonment, and then if he still refused to fulfil his contract to another month in addition, but no more, and any advances that had been made to him would be recoverable through the civil courts.

I have etc,
R. Stewart.
Off. Supdt.

পত্র—১৩

To
I. Sandeman Esqr.

Dated, Cachar 25th May/59

Sir,

Wishing to move the Govt. of Bengal to facilitate the immigration of coolies into Cachar to supply labour for the cultivation of tea I have the honour to request that you will be so good as to fill up the accompanying form with respect to the coolies now labouring on your grant.

I have etc,
R. Stewart.
Supdt.

পত্র—১৪

No. 30 of 1860

To
James Abernutly Esqr.
Monacherra.

Dated, Cachar the 23rd July, '60

Sir,

I have to acknowledge the receipt yesterday of your official communication dated the 17th inst. requesting me to punish the Head Surder of your Calcutta Coolies sent in by you for certain mischief committed by him.

You must be aware that I cannot deal with the case until the charge you wish to prefer is duly gone into, and proved on oath by the testimony of yourself and such witnesses as you may wish to produce. I beg therefore that you will arrange to appear in person and substantiate your charge in the usual manner.

The man tells me that you have already given him a good chastisement for his alleged misconduct. Should such be the case, and you thus primarily taken the law into your own hands you must not be surprised if the case in coming duly before me is at once thrown out.

I have etc.
Sd/- I. F. Sherer
Off. Supdt.

পত্র—১৫

No. 32 of 1860

To
A. I. Tydd Esqr.
Buggliat Ghat
Beglaghat.

Dated 23 August, 1860.

Sir,

On the 9th August you instituted a case in this court. No. 280 of 1860 against one Ioomun Mea, Jamadar, charging him with having by his bad devices corrupted the minds of certain of your Tea Coolies induced them to break this contract and abscond bodily from your plantation, the Jamadar himself accompanying them.

The above being a grave and serious charge I have to request your personal attendance in this court within 4 days from the purpose of proving and satisfactorily establishing the charge preferred by you.

I have etc.

Sd/- I. F. Sherer

Off. Supdt.

পত্র—১৬

To
A. L. Webster, Esqr.
Cachar.

Dated, Cachar the 4th Dec. 1860.

Sir,

In reply to your letter of this date I beg to state that you do not mention the names of the coolies who have absconded, and that as they have been off two whole days before information was lodged, it is not likely that they are any longer in Cachar.

It will therefore be difficult to find them, I have, however set the police on this track.

I have etc,

Sd/- R. Stewart.

Supdt.

পত্র—১৭

No. 46 of 1860

To
Captain F. O. Scott.
2nd in Command S. L. I. Cachar.

Dated, Cachar 22nd Feb. '60

Sir,

With reference to your letter No. 59 dated the 21st inst. I have the honour to state that ..... I cannot furnish you with any fixed rates for labour in Cachar as these rates are not at present in any way determined in the district itself for free labour of any kind, but are on a point of transition

from what was an exceedingly low rate to what premises to be a very high one indeed perhaps exceeding that of any other part of India ..... *

Sd/- R. Stewart.

* Because of tea plantation.

পত্র—১৮

No. 296 of 1860

To
Messrs F. Harley & Co.
Calcutta.

Dated, Cachar, the 28th Dec. 1860.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 15 dated the 19th inst. asking me for my opinion as to the success a steamer would meet with on the line between Calcutta and Cachar, via Chattuck and Sylhet. In reply I beg to state that I have always thought that a steamer was much needed on this line, and I have no doubt whatever of its ultimate success.

The traffic between Calcutta and Dacca is immense and will require many steamers to accommodate it before long. The traffic between Dacca and the marts of Ajmeereegange, Soonamgunge, Chattack, Sylhet, Banga and Cachar is also considerable, and more than sufficient to fill a steamer a month. But it will be sometime see all the traffic is diverted from its present channel of conveyances into a newly established steamer. Between Dacca and Calcutta steamers are well known, and I should say there would be little difficulty in getting cargoes of native products, but beyond Dacca of steamer is looked upon much in the same light as a great sea serpent would be if it made its appearance in the Thames, and consequently will require some time to establish confidence in the native mind. It will not do therefore to feel disappointed and drawback even after the partial failure of the first few trial trips; entire success cannot be expected for some time after the running has commenced.

The above is with respect to the natives alone. On the other hand there are large societies of Europeans to whom the steamer would at once be an advantage, and who would gladly avail themselves of it. The Churr, Sylhet and Cachar messboats would no longer exist, and all the supplies consumed by the Europeans in these stations, and by the Eurasians at Sylhet, together with all the manufacturing and agricultural stores needed by the Tea Planters at Sylhet and Cachar, would at once become freight for your steamer on its upwards voyage, Tea being your cargo downwards together with the usual passenger traffic.

In conclusion I have only to add that I wish you every success in your enterprise and that I shall be most happy to do all in my power consistent with my duty towards fostering and encouraging it.

I have etc,

Sd/- R. Stewart.

Supdt.

N.B. Your steamer ought not to draw more than 2 ½ to 3 feet when laden. It will then be able to come up to Cachar at all seasons except the very driest. Coal is easily and cheaply procurable at Sylhet and from them Depots could be formed at Dacca and Cachar.

Sd/- R. Stewart.

Supdt.

পরিশিষ্ট

পূবশ্রী-তে (১৯৬৩ : শিলচর গুরুচরণ কলেজ মুখপাত্র : পৃঃ ১-৪)
প্রকাশিত চা-শিল্প বিষয়ক লেখকের মূল নিবন্ধ।

Beginning of the Tea Industry in Cachar

In 1788 Sir Joseph Bankes (then Director of the Royal Botanical Gardens, Kew) suggested to the Directors of the East India Company that efforts should be made to cultivate tea in India. But little or nothing of a practical nature was accomplished till 1834, when Lord William Bentinck appointed a committee to investigate the question of establishing a tea-growing industry. It is something strange that the said committee was ignorant of the discovery of indigenous tea in Assam by Mr. Robert Bruce in 1821 and by Mr. Scott in 1824. In Assam in the early years of tea cultivation many mistakes were made which caused disappointment and loss. The real progress of tea planting in Assam began in about 1851.

In Cachar indigenous tea was discovered first in 1855. But speculations regarding the possibility of tea cultivation in this district began soon after its annexation to the British territory in 1832. In February 1834 Captain Fisher, the Superintendent to whose charge the administration of the district was placed after annexation, received a letter from Mr. Gordon, Secretary Tea Culture Committee. Mr. Gordon requested Fisher to contact people coming from the province of Yunun of China, learn from them the conditions as regards soil, rainfall, climate etc. requited for the cultivation of tea, and then to report if Carchar fulfilled such conditions. Fisher could contact very few people coming from Yunun, as because of the disturbed condition of

the N.E. Frontier peoples' movement in that region was very limited. Anyway, from the information gathered he submitted a report in which he dealt with every point as regard soil, climate, rainfall etc. and concluded with his opinion that Cachar would be suitable for the plantation of tea. The discovery of tea plants in Cachar in 1855 was not the result of any conscious effort on the part of any person. About this discovery R. Stewart, the then Superintendent, wrote in his letter dated 10th July 1855 : "When in Moffasil last February the first specimens I saw of the Cachar plant were brought to me by an individual who had been employed in a tea plantation in Assam, and who recognized the plant, and as an inducement to others to bring to my notice any discoveries they may make I beg to suggest that he be given a present of thirty or forty rupees or any sum which may be considered sufficient." Immediately after the discovery Stewart submitted the specimen of the plant to Dr. Thomas, Superintendent of the Govt. Botanic Garden, Calcutta and to others, and all agreed considering them indentical with the tea plant of Assam. Dr. Thomas in a letter said, "The specimens forwarded by you are beyond any reasonable doubt the true tea plant (Assam variety)."

When Sterart was convinced that the plant discovered was the genuine tea plant he sent people to different directions into the jungles to look for it, and wherever he sent, the plant was found more or less abundant. It is evident from a letter dated 4th Sept. that as a result of the first search tea plant was discovered to the south and south-east of Silchar, the Sudder station. The principal places where tea plants were growing in abundance were the Bargoongoor hills in the Chatla Howher, Baokara and Nawowalla near the Gagra river, Barrahangun near Hyleakandy, and Infang in the east of Rajnuggur pargannah. From the same letter we know that Barrahangun was the first place where plantation work was commenced by a planter from Assam.

After the discovery wide publicity was given inviting people to come to Cachar and undertake the work of tea cultivation receiving grants of land from the government. Stewart received many applications, and all these from the Europeans. Their demand for grant of land varied from 500 acres to 1000 acres. One Bengalee gentleman named Purbutty Churn Bunnoorjee, Banker and Agent. Sythet, had correspondence with Stewart but we do not know if he actually came to Cachar for plantation purpose. Fisher himself was very enthusiastic about the cultivation of tea in Cachar. To one R. Houston he wrote '..... any person who has made up his mind to embark in the enterprise and try tea planting in Cachar I recommend strongly his not losing one day but that he should set people to work at once to clear away the jungles.'

From a letter dated 5th May, 1855 we learn "some three or four parties have commenced work, and from all accounts they appear to be well satisfied with the prospects, and entertain the hopes of making large sum of money by the cultivation and manufacture of tea in Cachar."

In a letter dated 30th August, 1856 addressed to the Tea planters of Cachar we get the names of the pioneers in the field of tea industry. They were A. Tydd of Wise & Co., Dacca, Baokara gardens; I. Davidson of Cachar Tea Company, Adelaide gardens; and M. Herring of Chundeepoor.

By 1860 plantation had vastly increased and so we then meet W.H. McArthur of Seerespur, James Abernutty of Monacharra, W. McArthur of Luckinugger, H.C. Gibson of Mohunpur, Webster (garden not mentioned) and Sandeman of Rosecandy.

As numerous applications were pouring in asking for grants of land, the Govt. became apprehensive of over speculation. Some of the letters betray this apprehension. In a letter addressed to one J.B. Shadwell who applied for 1000 acres of land the Superintendent wrote : "At the same time I beg to bring to your notice that in order to bring a thousand acres of land under tea cultivation it is calculated that it would entail an outlay of at least one lac of rupees, at the rate of rupees one hundred per acre." To another applicant Mr. Hogg the Superintendent wrote that he must have the money required in hand, and not depend on the money he might have from others.

Thus began the tea plantation which within a short time brought magical change in every sphere of life—economic, social, educational etc. —of Cachar. It would not be wrong to say that the present district of Cachar is the gift of the Tea Industry. The impact of tea on Cachar is a different story, and it is left for some future issue of our College magazine. So is the story of Tea labour. The first Superintendent Captain Fisher and Lieutenant R. Stewart, the Superintendent, during whose tenure of office tea was first discovered, proved to be prophets as regards their prediction on the prospect of tea plantation in Cachar. But both cherished wrong ideas about tea labour. In his letter of 4th September 1855 R. Stewart wrote : "With regard to labour I do not anticipate there will be any great difficulty in obtaining the quantity which may be required, if not in Cachar, in the neighbouring district of Sylhet the inhabitants of which district and of Jynteah come very willingly to Cachar and settle down in it." But here Stewart was mistaken. By 1858 planters began to feel difficulties as local labour was found unsuitable for plantation purpose. Hence the question of importation of labour arose. The letter dated 13th May, 1858 addressed to Mr. Sanderman of Goongoor Hill is revealing on this issue. The Superintendent wrote to Mr. Sanderman :

Sir,

In answer to your letter of today's date with reference to the importation of labour into Cachar, I have the honour to state that I am of opinion it would be a measure attended with much benefit to the country, and to the tea planting interest.

The climate of Cachar is a healthy one and I think it very porbable that if coolies were imported they would settle here for food, and form a permanent population. Every facility should therefore be given them for

prosecuting a cultivation of their own as well as labouring for the tea gardens. Once settled on a piece of land which they had cleared themselves and which they could call their now, I do not think that it is at all probable that men who are so badly off as to be obliged to ship themselves off to Mauritius and the West Indies for subsistence would ever think of quitting and you would thus have a lasting supply of labour settled on your grants.

The coolies on first coming-up to Cachar, that is before leaving Calcutta, should be bound down by an agreement to serve for a certain number of years, a breach of this agreement, if the documents were regularly and fairly drawn out, would subject the delinquent to one month's imprisonment and then if he still refused to fulfil his contract ot another month in addition, but no more, and any advances that had been made to him would be recoverable through the civil courts.

I have etc.

R. Stewart,

Offg. Superintendent.

That the matter relating to the importation of labour had by 1859 advanced is evident from the letter addressed to the same Mr. Sanderman on the 25th May, 1859. Mr. Stewart wrote : 'Wishing to move the Govt. of Bengal to facilitate the immigration of Coolies into Cachar to supply labour for the cultivation of tea I have the honour to request that you will be so good as to fill up the accompanying form with respect to the coolies now labouring on your grant." But the problem of tea labour, as has been said above, is a different story and let me keep it in reserve as I will have to oblige many more editors of the College Magazine in future.

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

বরাকের উপন্যাস ও 'অশ্রুমালিনী'

বরাক উপত্যকার উপন্যাস শাখায় প্রবাদি নাম রামকুমার নন্দী মজুমদার (১৮৩১-১৯০৪)। তাঁর লেখা 'মালিনীর উপাখ্যান' বরাক উপত্যকার প্রথম উপন্যাস। রচনার বহুদিন পর শিলচর থেকে প্রকাশিত 'বিজয়িনী' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩৪৭) 'মালিনীর উপাখ্যান' ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। কিন্তু 'বিজয়িনী'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়নি। উপন্যাসটি খুব সম্ভব ১৮৯২-এর কাছাকাছি সময়ে লেখা। 'মালিনীর উপাখ্যান' সম্পর্কে রামকুমারের জীবনীকার লিখেছেন : 'ইহাতে গল্পচ্ছলে পতি কর্তৃক মুখরা ও অশিক্ষিতা পত্নীর চরিত্র সংশোধন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কবি যাহা কিছু গদ্য রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে এখানই উৎকৃষ্ট।' প্রসঙ্গত শিলচরের 'শিক্ষা-সেবক' ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের 'আমার দেখা মানুষ' রচনা থেকে জানা যায়, শ্রীহট্টের স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল 'হরিদাস ভারতী' ছদ্মনামে তাঁর বড় মেয়ের নাম অনুসারে 'শোভনা' উপন্যাস লেখেন। এটি সম্ভবত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

লাবণ্যকুমার চক্রবর্তীর উপন্যাস 'মহারাণী ইন্দুপ্রভা' করিমগঞ্জের মাসিক 'শ্রীভূমি' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২২–) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মণিপুরের রাজকন্যা ইন্দুপ্রভার বিয়ে হয় কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইন্দুপ্রভা গোবিন্দচন্দ্রকে বিয়ে করেন। শোনা যায় ইন্দুপ্রভার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। লাবণ্যকুমার চক্রবর্তীর ভাষাভঙ্গি সুন্দর। 'শ্রীভূমি' পত্রিকার অনেকগুলো সংখ্যাই অধুনা দুষ্প্রাপ্য। তাই এটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস 'স্নেহের বাঁধন' ও পরের বছর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' রচিত হয়। করিমগঞ্জের সুরেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের প্রথম উপন্যাস 'ব্রাহ্মস্পর্শ'। উপন্যাসটির পরিবর্তিত নাম 'তিথির ফল'। 'প্রবাসী' (১৩৩৪ বাংলা) বইটির প্রশংসা করেছিলেন। মুসলমান সমাজের পটভূমিকায় তাঁর 'মতিয়া' উপন্যাস ১৩৩৭ বাংলায় প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস — 'পুরাণবাড়ী' ও 'পরাজয়'। রামেন্দ্র দেশমুখ্য সম্ভবত দুটি উপন্যাস লেখেন — 'ইরাক্কায়ি' ও 'মরসুমী ফুল'। প্রথমটি জাপানের ব্রহ্মদেশ আক্রমণের সময় ভারতে শরণার্থী জীবনের কথা, দ্বিতীয়টি নানা ব্যবসায়ী সংস্থার আসামে কর্মরত সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভদের দুঃখ-সুখের কাহিনী। এটি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। সাগরিকা শ্যামের উপন্যাস 'বিগত বসন্ত' কলকাতার হোস্টেলবাসিনী কয়েকটি বিগতযৌবনা নারীর মনোবিশ্লেষণাত্মক কাহিনী।

করিমগঞ্জের বিপ্ররাজ দাসের 'মেঘ ভাঙা রোদ' ১৩৭০ বাংলায় প্রকাশিত হয়। করিমগঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশে কারখানার পটভূমিকায় এটি রচিত। আসামের চা-বাগানের পটভূমিকায় লেখা তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ঝরণা পাহাড় প্রান্তর' পরের বছর প্রকাশ পায়। করিমগঞ্জ কলেজের

পটভূমিকায় মিলন দত্তের লেখা 'মীরগঞ্জ গার্লস কলেজ' ১৩৭১ বাংলায় প্রকাশিত হয়। করিমগঞ্জের সুনীল চৌধুরী লিখেছেন দুটি উপন্যাস — 'বর্ণালী' ও 'নরনারী'।

গণেশ দে-র দুটি উপন্যাসের একটি 'কলঙ্গার কূলে' ও অন্যটি 'কুসুম ছেঁড়া কাহিনী'। প্রথমটি ডিমাসা রাজত্বের সময়কার ইতিহাসকে ভিত্তি করে রচিত শারদীয়া 'সোনার কাছাড়ে' (১৯৮০) প্রকাশিত। 'কুসুম ছেঁড়া কাহিনী' শারদীয় 'শঙ্খধ্বনি'তে প্রকাশিত (১৩৯০)। ডি. এম. নুরুল ইসলাম লিখেছেন 'বিদায় প্রিয়া' উপন্যাস। আব্দুল খালেক বাঙ্গাল-এর 'কালাছড়ায় হলুদ স্রোত' উপন্যাসটি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্যামল নন্দীর 'নেপথ্য সঙ্গীত' উপন্যাস ১৩৮৮তে এবং মিহিরকান্তি রায়ের উপন্যাস 'দিনান্তের রঙ ধূসর' ১৯৮২তে প্রকাশিত। প্রফুল্ল কুমার দেবের দুটি উপন্যাস — 'নীরব বিধাতা' ও 'ভালোবাসার বিবর্ণ দলিল'। কামাল উদ্দিন আহমেদের 'অতিলান্ত' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৯৬ বাংলায়। বদরুজ্জামানের তিনটি উপন্যাস — 'ঘর্ষণ', 'এই অন্ধকারে' ও 'রশীদপুরের পাঁচালী'। 'ঘর্ষণ' বদরপুরের দিদারুল ইসলাম সম্পাদিত 'প্রয়াস'-এ (কার্তিক ১৩৯৩) এবং 'রশীদপুরের পাঁচালী' শিলচরের 'প্রতিস্রোত'-এর ১ম বর্ষ বর্ষপূর্তি সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৯৮৫) প্রকাশিত। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের একমাত্র উপন্যাস 'পদছাপ' (১৯৯০) প্রকাশিত হয় 'শঙ্খধ্বনি' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়।

ক. এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত উপরোক্ত অসম্পূর্ণ তালিকাটি থেকে সত্তর বছর আগে লেখা 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসখানি আলোচনার জন্য তুলে নিচ্ছি। কারণ প্রথম পর্বের উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে 'মালিনীর উপাখ্যান' বা 'ইন্দুপ্রভা' ইত্যাদির সম্পূর্ণ মুদ্রিত সংস্করণ আমাদের হাতে আসেনি।

'অশ্রুমালিনী'র লেখক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯৩৯) ছিলেন শিলচর নরসিংহ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্নেহের বাঁধন' (১৯২৪) জর্জ ইলিয়টের 'সাইলাস মার্নার'-এর ছায়া অবলম্বনে লেখা। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী'ই আমাদের আলোচ্য। সুরেন্দ্রকুমারের জন্মশতবর্ষে শিলচরের 'ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতি' 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাস (অতঃপর শুধু 'অশ্রুমালিনী'ই বলা হবে) পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। গ্রন্থ সম্পাদনার ভার পড়ে ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের ওপর। তাঁর সুসম্পাদিত সংস্করণ আমি আমার আলোচনায় ব্যবহার করেছি। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বাংলায়। ওটি আমার কাছে নেই।

খ. 'অশ্রুমালিনী' তেইশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই উপন্যাসে ঘটনার গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে একটা নির্দিষ্ট পথরেখা আবিষ্কার করা মোটেই কঠিন নয় :

পরিচ্ছেদ এক :

এক প্রাচীন জমিদার বংশের একমাত্র 'কুলপ্রদীপ' প্রাণধন গুপ্ত আষাঢ় সন্ধ্যার প্রবল ঝড়-জল মাথায় করে গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন। সারাটা বাড়ি নিঝুম, অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন তাঁর যুবতী গিন্নী ভুবনেশ্বরী। বাড়ি ঢুকে স্বামী দুর্যোগ সম্পর্কে এটা ওটা বলে যাচ্ছেন, গিন্নী নিরুত্তর। পা ধোয়ার জল দেয়া থেকে শুরু করে প্রাথমিক সমস্ত যত্নই করলেন ঝি। এই ঝি আসলে প্রাণধনের ধাইমা। প্রাণধন যখন তিনবছরের, মহামারীতে গাঁ উজাড় হয়ে গেল। গুপ্ত বংশের একমাত্র শিশু সন্তানকে ধাইমার হাতে সঁপে দিলেন তার মা-বাপ। তারপর

তারাও মহামারীর শিকার হলেন। প্রাণধন সেই থেকে ধাইমার কাছে মানুষ। ছোট্ট এই সংসারের চাবিটি রয়েছে ধাইমার হাতে। বিপত্তি ওইখানেই।

ভুবনেশ্বরীর কাছে ধাইমা ঝি-মাত্র। আষাঢ়-সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে কলহে মত্ত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'যদি ঝি চাকর নিয়াই চিরদিন ঘরকন্না চলে, তবে লোকে বিয়ে করে কেন?' অথবা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'থাক্ থাক্ তোমার বক্তৃতা শুনতে বসি নাই। আমারও বাপের বাড়ী দাসী বাঁদী আছে; দাসী দাসীর মতোই আছে;—গৃহিনী হইয়া নয়।'

গৃহিনীর কথা আর থামে না। পাশের ঘরের থেকে ধাইমা সবই শুনতে পান। পরদিন ভোরবেলা এক দুঃস্বপ্নের গল্প রচে ধাইমা হাটখোলার এক কাল্পনিক ভাইপোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে। পুকুরপাড়ে গিয়ে চাবির গোছা প্রাণধনের হাতে তুলে দিয়ে বৌমাকে দিতে বলেন। প্রাণধন গিন্নীর সামনে চাবির গোছা ছুড়ে ফেলে দিতেই প্রফুল্ল ভুবনেশ্বরী ওটি তুলে শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিলেন।

সেই ভুবনেশ্বরী বহুকাল পরে (হয়তো বিশ বছর) এখন রাধানগর গ্রামের মহিলাকুলের মাথা। ব্যাপার উৎসবে, আচার-অনুষ্ঠানে তার ব্যবস্থাই সকলের শিরোধার্য। দেমাকে মাটিতে তাঁর পা পড়ে না।

পরিচ্ছেদ দুই :

রাধানগরের প্রাণধন গুপ্ত শ্যামনগরের জমিদার কালীচরণ রায়ের কাছে তাঁর এন্ট্রান্স পাশ পুত্র পরেশের জন্য জমিদার কন্যা যোগরাণীর বিবাহ সম্বন্ধ প্রার্থনা করলেন। অন্তঃপুরে ঠিক ওই সময় জমিদার গিন্নী মন্দাকিনী ও কন্যা যোগরাণীর আলাপ আলোচনা থেকে কন্যাটির সেবাপরায়ণা রূপটি সম্পর্কে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। জমিদার গিন্নীর কথা থেকে জানা যায় তাদেরই আশ্রিত একটি ছেলে নাম তার নীরদ—একদা তাকে মৃত্যু শয্যা থেকে ফিরিয়ে এনেছিল তার সেবাগুণে। মায়ের ধারণা, তার সেই অপরিশোধ্য ঋণের বোঝা একমাত্র যোগরাণীই পারে লঘু করতে। মায়ের ইচ্ছা যোগরাণীর শিরোধার্য, তার ওপর সে নীরদকে চেনে ঘনিষ্ঠভাবে, নীরদ তাকে পড়াশুনাও সাহায্য করে। ওই মুহূর্তেই কালীচরণ অন্তঃপুরে ঢুকে গিন্নীকে সম্বোধন করে জানালেন—'শুনেছ, এতদিনে আজ তোমার যোগরাণীর একটা উপযুক্ত বর জুটেছে।'

পরিচ্ছেদ তিন :

কালীচরণের কথাগুলো নীরদ পাশের ঘর থেকে শুনতে পায়। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার যুক্তি খোঁজে, যুক্তি খুঁজে পায় এবং সরাসরি মন্দাকিনীর কাছে উপস্থিত হয়ে পরেশ ও পরেশের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। চিত্তের চঞ্চলতা দমন করে সে বিয়ের উদ্যোগে প্রবলভাবে মেতে উঠল।

পরিচ্ছেদ চার :

নীরদ মোক্ষদা ঝির হাত দিয়ে রাধানগরে যোগরাণীর কাছে চিঠি পাঠায় নিঃস্বার্থ পরোপকার ও নারীর কর্তব্যের উপদেশ দিয়ে। মোক্ষদার কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করলে জানতে পারে ব্যস্ততায় রাণী চিঠি লিখে উঠতে পারে নি, মুখে জানিয়েছে। নীরদ বুঝতে পারল সে ভুল

করেছে। তার চিত্তজয় সম্পূর্ণ হয় নি। চিত্তজয়ের সংকল্প করে সে তার সাধের পোষা ময়নাটাকে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দিল।

পরিচ্ছেদ পাঁচ :

নীরদের মনের অবস্থা মন্দাকিনীর তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। তিনি প্রস্তাব করেন—নীরদ কিছুদিনের জন্য জয়ন্তপুর গ্রামে গিয়ে জমিদারী ঝামেলাটা মিটিয়ে আসুক। চল্লিশ মাইল দূর জয়ন্তপুরে ঢোকার মুখেই নীরদ মৃত্যুপথযাত্রী এক বালিকাকে তার আশ্চর্য শুশ্রূষার গুণে বাঁচিয়ে তুলল। সারাটা গ্রাম নীরদের নানা সদগুণের প্রশংসায় মুখর।

পরিচ্ছেদ ছয় :

'কি যেন এক মোহের ঘোরে (জয়ন্তপুর গ্রামে) নীরদের দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে।' এ গ্রামে পৌষমাসে নীরদ এসেছিল, এখন ফাল্গুন মাসের শেষ। হৃদয়গুণে সে উদ্ধত গ্রামবাসীকে জমিদার কালীচরণ রায়ের অনুগত করেছে। জমিদারী পরিদর্শন করতে এলেন কালীচরণ; নীরদ তার মাকে দেখে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে।

পরিচ্ছেদ সাত :

প্রথম অংশটি নেপথ্যবিধান পদ্ধতিতে রচিত। [প্রাণধন গুপ্তের বাড়ি। ধাইমা চলে যাবার পর প্রাণধন 'ভগ্নহৃদয়'। প্রতাপান্বিতা ভুবনেশ্বরীর হাতেই সংসারের দায়িত্ব। একবার শ্যামগ্রাম বেড়াতে গিয়ে বন্ধু কালীচরণের গুণবতী বালিকা কন্যাকে দেখে প্রাণধন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। 'সেই মুহূর্তেই সংকল্প করিলেন যে, যেরূপই হউক এই লক্ষ্মী মেয়েটি পুত্রবধূরূপে তাহার শূন্য গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সে হারানো সুখ ফিরিয়া পাইতে হইবে।'

গুপ্তমশাই গৃহসুখের কল্পনা করছিলেন, গিন্নী দেখছিলেন 'পণ, তত্ত্ব ও যৌতুকাদির মধুর স্বপ্ন।' বাবার কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশ সেদিন বিনাপণে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। রোজগেরে পুত্রের বিরোধিতা করলেন না মা, অভিমানটা জমিয়ে রাখলেন। নতুন বৌ যেদিন বাড়িতে এল সেদিন থেকেই সে ও তার বাপের বাড়ি শাশুড়ীর অভদ্র আক্রমণের লক্ষ্য হল।]

শ্বশুরবাড়ির মর্মান্তিক যন্ত্রণার মাঝখানে শ্বশুরমশাই একমাত্র স্নেহমমতার অকপট চরিত্র রূপে যোগরাণীকে আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু তার এই পক্ষপাত থেকে মাঝে মাঝেই পরিবারে দাবানল জ্বলে উঠতে লাগল।

পরিচ্ছেদ আট :

ভুবনেশ্বরী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলেন যাতে 'তাহার পরেশ স্ত্রীভক্ত না হইয়া যায়।' যোগরাণীর আচরণে তিনি 'বশীকরণে'র চেষ্টা লক্ষ্য করলেন। ভুবনেশ্বরী নিজের মেয়েকে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, বধূ যেন দিনের বেলা 'শয়নগৃহে' আনাগোনা না করে, কারণ এদেশের 'ভদ্রঘরের বউঝিদের পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জাহীনতার পরিচায়ক।'

পরেশও মায়ের নির্দেশ মেনে ছুটির সময় যখনই আসত 'বহিবাটি'তে বিশ্রাম করত। যোগরাণীর মন বিদ্রোহ করলেও 'ত্যাগের মধ্যে ভোগকে ডুবাইয়া দিয়া পরের প্রীতির উদ্দেশ্যে আত্মসুখ বলিদান করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই যোগরাণী যোগিনী সাজিয়া বসিল।'

ভুবনেশ্বরী ভাইঝির বিয়েতে বাপের বাড়ি যাবেন। যে পরিমাণ অর্থ চাইলেন প্রাণধন গুপ্ত তার হাতে সে পরিমাণ অর্থ দিতে অক্ষম। এই অবস্থায় যোগরাণী নিজের ট্রাঙ্ক খুলে তার সঞ্চিত নোট ক'খানা জোর করে শ্বশুরের হাতে দিল।

পরিচ্ছেদ নয় :

নীরদের মা এসে যোগরাণীকে দিন চারেকের জন্যে তাদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। তার কন্যা নিরুপমা ও জামাতা চারদিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। তার স্বামীর সোহাগের কথা নিরুপমা অনর্গল বলে যায় যোগরাণীর কাছে। যোগরাণীর মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে বারবার কারণ তার সুখের ভাণ্ডার যে শূন্য। গভীর রাত অবধি দাওয়ায় বসে বিষাদে ও চিন্তায় সে ঢাকা পড়ে যায়। বাদুড়ের ডানার শব্দে হঠাৎ তার চিন্তার ঘোর ছুটে যায়। 'চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এই নিশাতাগেও সে বাহিরে একা! ভয়কম্পিত পদে তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করতঃ সে ধীরে ধীরে সুপ্তিমগ্না বিধবার (নীরদের মা) একপাশে শুইয়া পড়িল।'

পরিচ্ছেদ দশ :

শ্বশুর প্রাণধন গুপ্ত 'দিব্যচক্ষে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার লক্ষ্মী রূপিণী, অন্নপূর্ণা—তাহার আদরিণী পুত্রবধূ আজ ক্ষুধিত, পিপাসিত।' তিনি পরসহ পরেশের কাছে লোক পাঠালেন। পরেশ এল, কিন্তু নিরুত্তাপ।

গ্রীষ্মের দুপুরে রান্নাঘরের পেছনের দাওয়ায় আঁচল পেতে যোগরাণী কাঠাল পাখির ডাক শোনে। পাখির অবিশ্রান্ত বিলাপধ্বনি অভাগা এক নারীর বাপের বাড়ি যাবার ব্যর্থ ব্যথার স্মৃতি বহন করে আনে। কাঠাল পাখির ডাক যোগরাণীর মন আকুল করে তোলে। বাড়ির ঠিক পেছনে জল ভরা খালের ওপর দিয়ে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে কোনো এক গ্রামের বধূ। তার কারুণ্য তরঙ্গিত হয়ে যোগরাণীকে ব্যাকুল করে তুলতে থাকে। পরেশ ঠিক ওই সময়টাতে বাড়ির বাইরে পাথরের বেদিতে বসে বই পড়ে। একদা মা বারণ করেছিলেন, মাতৃভক্ত পরেশ এখনো মায়ের অবর্তমানেও সেই আজ্ঞা পালন করে চলেছে।

পরিচ্ছেদ এগারো :

পরদিন কাজের মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে প্রাণধন বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। তার অসাক্ষাতে ও পুত্র ও পুত্রবধূ তাদের পরস্পরের কাছে আসুক। বলে গেলেন, 'এই রান্নাঘরে একা বসে থাকবে না; খাওয়া লওয়া শেষ করে বিছানাতে যাবে; অন্যথায় ভাল হবে না কিন্তু।' যোগরাণী ঠিকই শোবার ঘরে ঢুকল, পরেশ চমকে ফিরে তাকালো। দু'একটা সরল প্রশ্নের কঠিন জবাব দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনাত্তরে পরেশ বলেই ফেলল—'আগেই তো জানি আমায় নিয়ে তুমি সুখী হবে না। নীরদই তোমার উপযুক্ত স্বামী হইত—তাকে পেলেই তুমি সুখী হইতে।'

ভয়ংকর কথাগুলি বজ্রপাতের মতো মনে হল যোগরাণীর। 'সে কি শুনিতে আসিয়া কি শুনিল! একি পরেশচন্দ্র? তুমিই না তাহার স্বামী? তুমি স্বামী হইয়াও কি বুঝিলে না যে, নারী সংসারের আর সমস্ত নিষ্ঠুর অশ্রাঘাতই সহ্য করিতে পারে,—কেবল এই মর্মভেদী খেলাঘাতটিই সহ্য করিতে পারে না;—এইটিই—এই অবিশ্বাস বাক্যই নারীর মরণ!'

'যোগরাণী ঘরের বাহির হইল; বাহির হইয়া চাহিয়া দেখিল সব শূন্য—উপরে শূন্য, নিম্নে শূন্য, সম্মুখে পশ্চাতে সকলই শূন্য; এই বিরাট শূন্যপুরী যেন মহাশূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শূন্য চক্ষে যেন শূন্য ধরাতল উলটিয়া যাইতেছে!—টলিতে টলিতে গিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়াই সে ধরাতলে লুটিয়া পড়িল।'

সন্ধের পর শ্বশুর ফিরলেন। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার, তুলসীতলায়ও বাতি নাই। বারবার ডাকার পর প্রদীপের ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন 'রুক্ষকেশী, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুন্তলা; অনবগুণ্ঠা, অশ্রুম্লানবদনা, ধুলামলিনবসনা—এমনই দীনাহীনা বেশে, কৃষ্ণ চতুর্দশীর ঘোর তমসাবেষ্টিত রজনীতে ক্ষীণা শশীকলার ন্যায়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারই আদরিণী পুত্রবধূ।'

ক্রুদ্ধ শ্বশুরের রোষকে সহ্য করার চেষ্টা করল যোগরাণী, কারণ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তার পড়া ছিল। পরেশ এই দুঃসময়ে জননীর অনুপস্থিতির জন্য মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগল। মায়ের অসুখের খবর নিয়ে আসা চিঠি হাতে করে যোগরাণী শ্বশুরের কাছে মাকে দেখতে যাওয়ার কাতর প্রার্থনা জানাল। শ্বশুর সম্মতি দিলেন।

পরিচ্ছেদ বারো :

বিশাল রায়ভবন আজ নীরব, নিস্তব্ধ। যোগরাণী এসে শুশ্রূষার পুরো দায়িত্ব নিল নির্মল নামের এক সেবাপরায়ণ বালকের হাত থেকে। নীরদের মতো নির্মলও এই বাড়ির আশ্রিত। চল্লিশ দিন যমে-মানুষে লড়াই চলল, তারপর মন্দাকিনীর মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে মন্দাকিনী যোগরাণীকে কাছে ডেকে বল্লেন—'শোন, আমি মরলেও যেন আমার এই আনন্দবাজার না ভাঙ্গে; দ্বিতীয় কথা—নীরদ বুদ্ধি সামলাতে পারল না—তাকে দেখবে।'

যোগরাণী নিজেকে নতুন দায়িত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেবার সংকল্প করল। সকলের সেবা ও সকলের মধ্যে আনন্দ বিতরণই তার ধর্ম মনে করে মোক্ষদাকে আদেশ দিল—'মোক্ষদা, ও সব ঘর অন্ধকার কেন? বাড়ী এত নীরব কেন?—মার আদেশ তাঁর আনন্দবাজার যেন না ভাঙ্গে—।'

পরিচ্ছেদ তেরো :

মাকে দেখতে যাবার অনুমতি নিয়ে নীরদ নির্জনবাসের উদ্দেশ্যে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনে চেপে দীর্ঘযাত্রার পর বদরপুর জংশনে এসে নামল। কিছুক্ষণ পর গাড়ি বদল করে সে চলল পার্বত্যপথে। দুপুরে ট্রেন পৌঁছল হাফেলং ষ্টেশনে। আকস্মিকভাবে জুটলো এক নতুন বন্ধু—ক্ষীরোদ। সন্ধ্যের দিকে ওরা পৌঁছল লামডিং। উঠল ক্ষীরোদের মেসে—ওর সুপারিশেই রেল কোম্পানীতে টিকিট চেকারের চাকরী হয়ে গেল নীরদের।

পরিচ্ছেদ চৌদ্দ :

যোগরাণী তার মাকে দেখতে চলে যাবার পরের দিনই প্রাণধন গুপ্ত তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে আনতে লোক পাঠালেন। স্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন এবং এসে অবধি সমানে বৌ ও বৌ-এর বাড়ির লোকজনদের শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন। মা ও তার 'আদুর গোপাল' পরেশচন্দ্র দুয়েরই মনে প্রতিশোধের চিন্তা কাজ করছিল। পরেশ মাকে বল্ল—'আগেই তো জান মা এত বড়ঘরের মেয়ে আমাদের ঘরে সাজে না;—কথায় কথায় আদ্ধার অভিমান এত কাহার সহ্য হয়!' মা সকলকে শুনিয়ে বলেন, 'আমার পরেশের জন্য ছেলের বউএর অভাব হবে

না'। রুগ্না বেয়ানকে দেখার অনুরোধ এলে ভুবনেশ্বরী পত্রবাহকের কাছে বেয়াইকে 'ইতর ছোটমানুষ' বলতেও দ্বিধা করেন না। প্রতিশোধস্পৃহায় ছেলেকে আবার বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করলেন। ছেলের জন্য বৌ খুঁজতে কোন আত্মীয়ই রাজি হচ্ছে না দেখে তাঁর আক্রোশ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। দেরি না করে এক আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে পরেশকে আবার বিয়ে দিলেন।

মন্দাকিনীর মৃত্যুসংবাদ ও তার শ্রাদ্ধোৎসবের নিমন্ত্রণপত্রের উত্তরে ভুবনেশ্বরী ইতরের মত ভাষা প্রয়োগ করে জানিয়ে দিলেন—'এমন স্বাধীনচেতা মেয়ের স্থান আমার গৃহে নাই। প্রজাপতির আশীর্বাদে সে স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।'

যোগরাণীর দুর্ভাগ্য চরমে পৌঁছল।

পরিচ্ছেদ পনেরো :

কালীচরণ পত্নীর মৃত্যুর পর পুত্র ডেপুটি কিরণবাবুর কর্মস্থলে গেলেন। সেখানে কিরণের শ্বশুরবাড়ির দিকের এক সুন্দরী সুনিপুণা পনেরো বছরের পিতৃমাতৃহীন বালিকাকে দেখতে পেলেন। বৌমার সম্মতি নিয়ে একে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ি। যোগরাণীর হাতে তার শিক্ষার ভার পড়ল।

পরিচ্ছেদ ষোলো :

নীরদের সঙ্গে লামডিং জংশনে আকস্মিকভাবে কালীচরণ রায়ের ছেলে ডেপুটি কিরণের দেখা। কিরণের মুখে মন্দাকিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনে নীরদের অবস্থা বজ্রাহতের মতো। সুস্থ হয়েই সে শ্যামগ্রামের উদ্দেশে রওনা হল। ক্ষীরোদ বদরপুর পর্যন্ত নীরদের সঙ্গে গেল, তারপর তাকে বিদায় দিল।

পরিচ্ছেদ সতেরো :

প্রবাস থেকে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার মতো নীরদ শ্যামগ্রামে রায়ভবনে ফিরে এলো। একদিন আশ্রিত বালক নির্মলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারল মন্দাকিনীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই যোগরাণী একটানা দুঃখের বাপের বাড়িতে আছে। পরেশ যে আবার বিয়ে করেছে এই খবর পেয়েই 'গুলির আঘাতে আহত ব্যক্তির মত নীরদের দেহ সজোরে নড়িয়া উঠিল।'

নীরদ 'রায়ভবনের সমস্ত শোক, দুঃখ, বিষাদ ও মর্ম-যাতনার জন্য তাহার একগুঁয়ে স্বেচ্ছাচারিতাকেই একমাত্র দায়ী বুঝিতে পারিয়া, অতি বড় অপরাধীর মত ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল।' যোগরাণী বাবার কাছে নীরদ ও সুরজার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। রায়ভবনের বাগানে নীরদ, সুরজা ও যোগরাণী বসেছিল। নীরদের মনে এক অতীত ঘটনার করুণ স্মৃতি জেগে উঠল, 'তাহারই অসতর্ক হস্ত সঞ্চালনে একদিন এইস্থানে একগাছি পুষ্পহার ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই ছিনহার অদ্যাপি যে জোড়া দিতে পারে নাই। ধীর স্বরে নীরদ বল্লো— রাণী দিদি আমায় এত শক্ত করে বাঁধতে হবে না—বিশ্বাস কর যে, নীরদ আগেকার সেই একগুঁয়ে দুর্বিনীত নীরদ নয়।' নীরদ ও সুরজার বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

পরিচ্ছেদ আঠারো :

গুপ্ত পরিবারে নানা ধরনের অশুভ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নতুন বধুর প্রতি শাশুড়ীর অপরিসীম স্নেহ থেকে বিষফলের জন্ম হয়েছে। অহংকারে ও গর্বে নতুন বধু 'ননদ, স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিতে বা মুখে মুখে সওয়াল — জবাব দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।' পরেশ 'চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল।'

সুরজা ও নীরদের বিয়ের পর তারা রাধানগরে মায়ের কাছে নিজের বাড়িতেই থাকে। নীরদ মায়ের কাছে পরেশের পুনর্বিবাহের কারণ অনুসন্ধান করে। সত্য সন্ধানের জন্য পরেশের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। পরেশকে বন্ধুবান্ধবরা সুযোগ পেলেই খোঁটা দেয়।

পরিচ্ছেদ উনিশ :

রাধানগরে নীরদ স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটায়। অনেকটা ভুলেই গেছে, রাণী বিয়ের আগেই বলে দিয়েছিল 'সস্ত্রীকো ধর্মাচারেৎ'। আজ সুরজাকে লেখা যোগরাণীর চিঠি পড়ে সে সম্বিৎ ফিরে পেল।

নীরদ ধীরে ধীরে পরেশের মনে দাম্পত্য-সুখের প্রকৃত ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়িতে পরেশকে নিয়ে আসে, তাদের অবস্থা দেখায়। পরেশের মনে হাহাকার জাগে। এদিকে নীরদের বাড়িতে আনাগোনা নিয়ে পাড়ায় পরেশের নামে কুৎসা ছড়ায়। বাড়িতেও পরেশ নতুন স্ত্রীর কাছে দুশ্চরিত্র বলে লাঞ্ছিত হয়। স্ত্রী সজোরে আঁচল ছাড়াতে গেলে পরেশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের টেবিলের ওপর—ওই টেবিলের ওপরই স্বামী নির্যাতিতা যোগরাণী একদিন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। অনুশোচনায় দগ্ধ পরেশ ওই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে। পরেশের বর্তমান অবস্থার জন্য নীরদ নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। শ্যামনগরে এক বিশেষ প্রয়োজনে ছুতোয় নীরদও পরেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

পরিচ্ছেদ কুড়ি :

কালীচরণ রায় নায়েবের সঙ্গে উইল সংক্রান্ত পরামর্শ করেন। ইতিমধ্যে খবর আসে গৌহাটী থেকে। পুত্রবধূর শারীরিক অসুস্থতায় তার শুশ্রূষার জন্য যোগরাণীর বিশেষ প্রয়োজন। 'যোগরাণী কামরূপ তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।'

পরিচ্ছেদ একুশ :

পরেশের বোন প্রমোদিনীর বিয়ের সম্বন্ধ কোনদিকেই এগোয় না। এ-অবস্থায় ভুবনেশ্বরী অলংকার বেচে, কিছুটা জমি দায়বদ্ধ রেখে কন্যাকে বিয়ে দিলেন। অল্পদিন পর বিধবার বেশে মেয়েটি বাপের বাড়ি ফিরে এল। 'এই নিদারুণ শোকঘটনা আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত ধর্মভীরু বৃদ্ধ গুপ্ত মহাশয়ের অস্থিপঞ্জর যেন চূর্ণ করিয়া দিল!' ... 'অবশেষে মনশান্তির উপায়স্বরূপ, তখনও শেষ সম্বল তাহার যাহা ছিল, তাহার অর্দ্ধাংশ যোগরাণীর নামে দান করিয়া দান সম্পাদন করিলেন।' এ খবর পেয়ে পরেশের নতুন বৌক্ষেপে গিয়ে নিজের গয়নাপত্র, বাসনকোসন সহ গুপ্তদের বাড়ি ত্যাগ করে বাপের কাছে গিয়ে হাজির হল। ভুবনেশ্বরী স্বামীকে তীর্থযাত্রা

বন্ধ করে পুত্রের উদ্ধারে মন দিতে বললে গুপ্ত উত্তর করলেন—'মা গিয়াছে, বউমা গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে—আমিও যাই—তুমি পেত্নীর মত এই শূন্য শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াও!'

নিরুপায় ভুবনেশ্বরী নীরদের মার কাছে গিয়ে পরেশকে রক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালেন। দেবতার কাছে নিজের ভুল স্বীকার করলেন।

পরিচ্ছেদ বাইশ :

গৌহাটীতে সুরজার চিঠি পেল যোগরাণী।

গুপ্ত পরিবারের শোচনীয় অবস্থা তাকে বিচলিত করে। দাদার সুখের সংসারের পাশাপাশি তার ভাঙা সংসার, স্বামীর বিপদ তাকে আকুল করে তোলে। সে বুঝতে পারে—'আমি অভিমানে সরিয়া আসিয়া কি তাঁহার পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি!' মথুরানাথও গৌহাটী এসে কালীচরণ রায়কে জানালেন তহবিল তছরূপের অভিযোগে পরেশের হাতবাসের কথা। বিস্মিত বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে যোগরাণী জানালো—'উপায় আর কি বাবা? আমার উপায় আমি করব।' যোগরাণী টাকাকড়ি দাসদাসী কিছুই নিল না। নিজের গয়নাগাটি পুটলিতে ভরে নায়েব কাকা মথুরানাথকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে 'রাধানগরের দরিদ্র পরিবারের কুলবধূ'রূপে বদরপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

পরিচ্ছেদ তেইশ :

বদরপুরের সিদ্ধেশ্বর ধাম। সপ্তাহব্যাপী 'লক্ষাচতি' যজ্ঞের পূর্ণাহুতির আগের দিন যোগরাণী আসাম ডাউন মেলে বদরপুর জংশনে পৌঁছল। নীরদের সঙ্গে তাদের ষ্টেশনেই দেখা। পরের দিন সকালে কলকাতা আপ-মেলে নীরদের মা, সুরজা ও আরো দু-তিনজন প্রজাও এলেন। মন্দিরে পুজো সেরে নীরদকে সঙ্গে নিয়ে যোগরাণী গেল পরেশের অফিসে। টাকা ও অলংকারের পুটলিটি বার্মা অয়েল কোম্পানীর সাহেবের হাতে তুলে দিল। 'পরেশ যোগরাণীর প্রবেশ মুহূর্ত হইতে বিস্ময় ও ভয়ে বিকল হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল।' সব কথা শুনে মুগ্ধ সাহেব টাকাটা রাখলেন, গহনা সমস্তই ফেরত দিলেন। তীর্থ পর্যটন করতে করতে আকস্মিকভাবে প্রাণধন গুপ্ত সেদিন তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সিদ্ধেশ্বর তীর্থে 'নারীশক্তির মহিমা'য় ভাঙা গুপ্ত পরিবার আবার জোড়া লাগল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রথম পরিচ্ছেদে গুপ্ত পরিবারের দুটি ছবি ('বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে' হয়তো, প্রায় বিশ বছর) তুলে ধরার দরকার ছিল কি? প্রথম অংশটি বর্জন করলেও তেমন দোষ হতো না বলে আমরা মনে করি। সেখানে অন্যভাবে প্রাণধন, বিশেষ করে ভুবনেশ্বরীর স্বভাব ফুটিয়ে তুলতে হতো।

এরপর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক যোগরাণীর শ্বশুরবাড়ির কথা না বলে তাঁর বাপের বাড়ি ও জয়ন্তপুরের কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রথম যোগরাণীকে শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে দেখানো হয়েছে। এই পরিচ্ছেদ থেকেই যোগরাণীর ওপর নির্যাতনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার কথা বলা হয়েছে, অষ্টম পরিচ্ছেদে এর বাড়াবাড়ি। নবম পরিচ্ছেদে নিরুপমার দাম্পত্যলীলার ছবি এঁকে যোগরাণীর জীবনের কারুণ্যকে প্রকট করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। দশম পরিচ্ছেদে স্বামীর অবহেলা, একাদশ পরিচ্ছেদে স্বামীর থেকে চরম আঘাত পেল যোগরাণী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে যোগরাণী বাপের বাড়ি শ্যামগ্রামে—মার মৃত্যু। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে নীরদের ভ্রমণ প্রসঙ্গ, চতুর্দ্দশে ভুবনেশ্বরী প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে পুত্রের পূর্ণ সম্মতিতে তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিলেন। যোগরাণীর দুর্ভাগ্যের অমাবস্যা সেদিন। বলা চলে, একাদশ থেকে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—এই অংশটুকুতে যোগরাণীর জীবনে চরম বিপর্যয় ঘটেছে, উপন্যাসের এটিই শীর্ষ অংশ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সুরজাকে যোগরাণীর শিষ্যরূপে দেখা গেল, ষোড়শ পরিচ্ছেদে নীরদের ভ্রমণের উত্তরপর্ব ও লামডিং বাসকালে ছোট মা মন্দাকিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি; সপ্তদশে রায়বাড়িতে নীরদ ও তার বিবাহের ব্যবস্থা; অষ্টাদশে গুপ্ত পরিবারের বিপর্যয়ের চিত্র; উনবিংশতেও তাই, তদুপরি পরেশের গ্রামত্যাগ; বিংশ পরিচ্ছেদে যোগরাণীকে গৌহাটীতে আহ্বান; একবিংশে ভুবনেশ্বরীর গর্বখর্ব; দ্বাবিংশে গৌহাটীতে বৌদির উপদেশ ও পরেশর বিপদে যোগরাণীর দুশ্চিন্তা ও স্বামীকে বাঁচানোর দৃঢ় সংকল্প; ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে বদরপুরধামে স্বামী-স্ত্রীর মিলন। গোটা প্লটকে আমরা এভাবে চিত্রায়িত করতে পারি :

গ. কালের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কিনা আলোচনা করা দরকার। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে আনুমানিক বিশ বছর আগে ও পরের দুটি চিত্রের কথা বলেছি। বিশ বছর বলার কারণ—প্রথম চিত্রে ভুবনেশ্বরীকে 'কাঁচা', 'নতুন' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে তার ও প্রাণধন গুপ্তের এন্ট্রান্স পাশ ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে। এর থেকে সময়ের ব্যবধানকে আঠারো থেকে বিশের মধ্যে আনতে পারি। চিত্রে এ জায়গাটায় একটু ফাঁক রাখা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পঙক্তিতে যোগরাণীর বিয়ের খবর পাই। এ-থেকে একাদশ পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত সময় সীমা অনধিক এক বৎসর। এই হিসেবটা পরোক্ষ প্রমাণ ভিত্তিক। যোগরাণীর বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যেই নীরদ অজ্ঞাতবাসে চলে যায়, ফেরে তিন বছর পর। এসে শোনে দুবছর ধরে যোগরাণী বাপের বাড়িতে আছে। এই হিসেবটা সরাসরি উপন্যাস থেকে পাই। যোগরাণীর মায়ের অসুখের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি চলে আসার চল্লিশ দিনের মধ্যেই তার স্বামী পরেশের আবার বিয়ে হল—এখানে তৎপরতার আধিক্য সহজেই নজর কাড়ে। যোগরাণীর বাপের বাড়ি আসা ও নীরদের রায়ভবনে ফেরার মধ্যকার দুবছরের কাহিনী মাত্র একটি পরিচ্ছেদে (পঞ্চদশ) শেষ করে দেওয়া হয়েছে। লামডিং থেকে নীরদের রায়ভবনে ফেরা ও উপন্যাসের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়টাকে মাসছয়েক বলে নির্দেশ করা যায়। এর মধ্যে ডেপুটি কিরণ বিশেষ কার্যদক্ষতাগুণে আশাতীত পদোন্নতি লাভ করে ডিপ্লুড়ে বদলী হয়ে (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) আবার মাস চারেকের মধ্যে (বিংশ পরিচ্ছেদ) গৌহাটীতে কাজে যোগ দিয়েছেন। কার্যকারণটা স্পষ্ট হলে ঠিক হতো। চিত্র—১

ঘ. উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে দুভাগে ভাগ করতে পারি। মুখ্য ও গৌণ চরিত্র। মুখ্য চরিত্র সাতটি। গৌণ চরিত্র তেরো (চারটি চরিত্রকে ধরা হয়নি - এরা প্রমোদিনী, নির্মলা, পরেশের নববধু ও রেল ইন্সপেক্টরের শিশু কন্যা)। বাকি মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের জন্য 'চিত্র দুই' দেখা যেতে পারে।

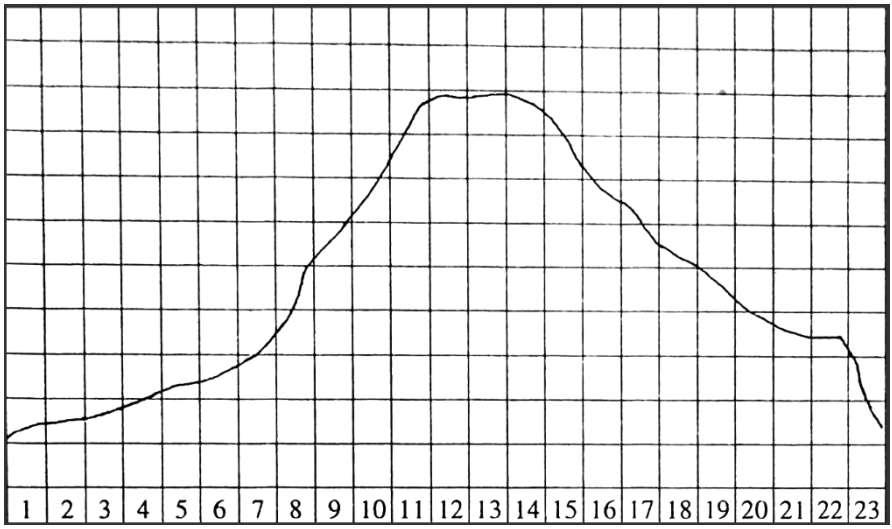

চিত্র এক : 'অশ্রুমালিনী'র প্লট

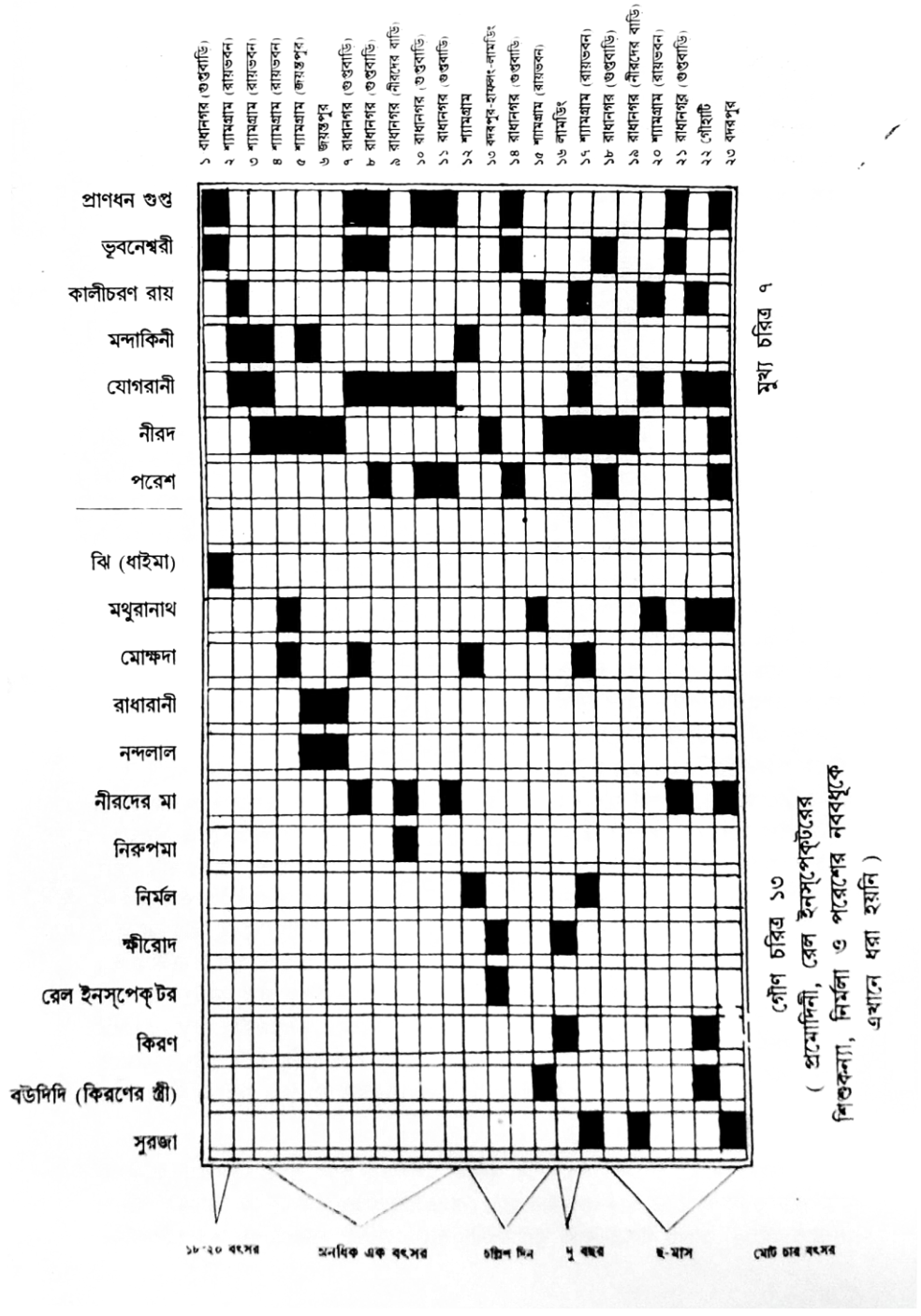

চিত্র দুই । এক নজরে 'অশ্রু মালিনী'র স্থান-কাল-পাত্র

যোগরাণী 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সুখ-দুঃখই গল্পের কেন্দ্র অধিকার করে আছে। অন্যান্য চরিত্র তাকে ঘিরেই আবর্তিত। এক কুড়িরও বেশি চরিত্রের সুখ-দুঃখকে যোগরাণীর দুঃখ ম্লান করে দিয়েছে। সদাচারের প্রতিমূর্তি সে। নিজের জীবন সাধনার তত্ত্বকে সে সুরজার মধ্যে বপন করেছে, নীরদকেও সেভাবে বুঝিয়েছে। যখন ওদের আত্মমগ্ন দেখেছে তখন চিঠি পাঠিয়ে তাদের সজাগ করে দিয়েছে। যোগরাণীকে ঘিরে পাঠকদের বেদনা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। শুদ্ধ ভালোত্বের আলোকে উজ্জ্বল চরিত্রটিকে অবলম্বন করে লেখক চমৎকারভাবে বেদনার মর্মমূলে নিয়ে গেছেন আমাদের। স্বামীর অবহেলায় রান্নাঘরের পেছনের দাওয়ায় নির্জন দুপুরে বসে থাকা যোগরাণীকে কাঁঠাল পাখির মর্মান্তিক আক্ষেপের আয়নায় ফুটিয়ে তুলে আমাদের অভিভূত করে রাখেন ঔপন্যাসিক। তাঁর বোধ হয় এতেও মন ভরে না, তাই তিনি রান্নাঘরের পেছনের জলভরা খালের ওপর দিয়ে স্বামীর ঘরে যাত্রী বালিকা বধূর কান্নার তরঙ্গও তুলে ধরেন পরতে পরতে। যোগরাণীর ব্যথা পাঠকের মর্মস্পর্শ করে। নীরদের বোন নিরুপমা ও তার স্বামীর দাম্পত্য জীবনের বিদ্যুৎউদ্দাস যোগরাণীর জীবনের অন্ধকারকে গভীরতর করে তোলে। অবশ্য যোগরাণী সম্পর্কে আমাদের শেষ কথা এই মুহূর্তে আমরা তুলে রাখছি।

যোগরাণীর বাবা কালীচরণ মধ্যম প্রাণবান, মা মন্দাকিনী কিন্তু লেখকের কল্পনার আদর্শ নারীই হয়ে থাকলেন। ভালো কিন্তু জীবনের স্পন্দন বড় কম। সেদিক থেকে ভালোমানুষ প্রাণধন গুপ্ত অনেকটা জীবন্ত। তাঁর চরিত্রের মৌলিক দুর্বলতার কারণ লেখক উপন্যাসের শুরুতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন—'গুপ্ত মহাশয় শিশুকাল হইতে বৃদ্ধা ঝির শান্তিময় কোলে অতি স্নেহে অতি আদরে লালিত পালিত। চিরকাল নির্জন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকায়, তাহার স্বভাব অতি নিরীহ ও শান্তপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। .....সামান্য বিবাদের সূত্রপাত দেখিলেই ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন ও নিজেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লন।' এবং এর ফলে ভুবনেশ্বরী প্রবল প্রতাপের পেখম মেলে রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য বৃদ্ধের ব্যক্তিত্ব তার পুত্রবধূর প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে তখন তিনি প্রতিবাদ করেছেন, স্ত্রীকে শক্তভাবে নির্দেশ দিতেও পিছপা হন নি। উপন্যাসে তিনিও এক অসহায় চরিত্র, তবে তিনি নিশ্চেষ্ট নন, জীবনবিমুখ নন—হকের আদায়ে তাঁর সদিচ্ছা ও উদ্যম ভরসা জাগায়। যোগরাণীর জীবনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে বৃদ্ধের স্নেহমমতা অরুণিমার মতো দেখা দিয়েছে। সারাটা জীবন অশান্তির হাহাকারে জ্বলে তিনি শেষ পর্যন্ত ঘরের সীনাতেই শান্তির চাবি খুঁজে পেয়েছেন। আমাদের সবচেয়ে অবাক করে ভুবনেশ্বরী চরিত্র। এই চরিত্র বেঁচে থাকবে তার আপন গুণে, না দোষে? উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগের থেকেই তার যে ক্ষুব্ধ মূর্তি আমরা দেখেছি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি ক্রুদ্ধ সাপিনীর রূপ নিয়েছে। নারীকে শুধু স্নেহ-মমতার প্রতিমূর্তি বলে না ভেবে তখনকার দিনের ঔপন্যাসিক তার যে ক্রোধাক্ত রূপ ফুটিয়েছেন—তার জন্য ঔপন্যাসিক প্রশংসা দাবি করতে পারেন। ভুবনেশ্বরীর লোভের চাঁদটি হলো ঘরের চাবি—কর্তৃত্ব। অবশ্য ওই চাবি পেয়েও তার মন শান্ত হয়নি, তিনি ছেলের বিয়েতে পণ নেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, স্বামীর জন্য যখন তা পারলেন না তখন সেই আক্রোশ গিয়ে পড়ল নববধূর ওপর।

''তাহার দোষান্বেষী চক্ষু যোগরাণীর সর্বজন প্রশংসিত সুন্দর সুগঠন সুলক্ষণ অবয়বেও দোষ খুঁজিতে লাগিল। তাই ভুবনেশ্বরীর মুখে যোগরাণীর কৃষ্ণকুঞ্চিত বেণীও 'সাপিনী' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল। তাহার গজেন্দ্রগমন ভুবনেশ্বরীর কর্ণে 'হস্তিনী' পদক্ষেপের মত প্রতিধ্বনিত

হইল।'' ভুবনেশ্বরী যোগরাণীর প্রতি বিরূপ থেকে বিরূপতর হতে লাগলেন। তার তখন প্রধান চিন্তা—'যেন তাহার পরেশ স্ত্রীভক্ত না হইয়া যায়।' তিনি জানতেন 'পরেশের মত মাতৃভক্ত ছেলের পক্ষে তেমন পরিবর্তন সম্ভবপর নহে' তবুও সাবধানতার মার নাই। তার বদ্ধমূল ধারণা—'বর্তমানে স্কুলে শিক্ষিতা পাশটাস করা বয়স্থা মেয়েগুলি ঘরকন্না বা গৃহিনীপনা শিখুক বা না শিখুক, স্বামী বশীকরণমন্ত্রটি খুব ভাল করিয়াই শিখিয়া আইসে।' পরেশ যাতে মন্ত্রের 'কুহকে' না পড়ে তার জন্যে ভুবনেশ্বরী সতর্কতা অবলম্বন করলেন। পরেশ বাড়ি এলে মেয়েকে দিয়ে যোগরাণীকে জানিয়ে দিলেন দিনের বেলা স্বামীর শোবার ঘরে ঢোকা চলবে না 'এদেশের ভদ্রঘরের বউঝিদের পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জাহীনতার পরিচায়ক।' ছেলের প্রতি নির্দেশ জারি হল—দিনের বেলাটা বাড়ির ভিতর বেশি সময় না কাটাতে, কারণ 'পাড়ার মেয়ে মুরুব্বিরা বউ দেখতে বা বেড়াইতে আইসে; ইহারা পরে গুপ্তগৃহের কুৎসা রটনা করিবে।' গুপ্তবাড়ির চিঠিপত্রও ভুবনেশ্বরীর হাত না ছুঁয়ে যেতে পারত না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পত্রালাপও ছিল না।

ভুবনেশ্বরীর আক্রোশ চরিতার্থ করতে স্বামী একদিকে যেমন কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক ছিলেন অন্যদিকে তেমনি পুত্র পরেশ ছিল তার সহায়ক। স্ত্রী সম্বন্ধে এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততা ছিল পরেশের। এর দুটি কারণ দেখা যায়। প্রথমত ধারণা হয় 'মাতৃভক্ত' পরেশ ও মা ভুবনেশ্বরীর যৌথ আচরণটা ইডিপাস-কমপ্লেক্স-লক্ষণাক্রান্ত। কারণ, ১. ভুবনেশ্বরীর আক্রোশ ও দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরেশের নিশ্চুপতা ও পরোক্ষ সমর্থন, ২. প্রতিশোধস্পৃহায় দুজনেই একে অন্যের দোসর। জননীর 'আদুরে গোপাল' পরেশচন্দ্র যখন শ্বশুরের সামনে অপমানিত যোগরাণীকে দাঁ ড়িয়ে থাকতে দেখল ও ইঙ্গিত পেল বাবার 'ক্রোধাগ্নি বর্ষণে'র তখন ধারণা করল তার বিরুদ্ধে যোগরাণী কোনো গুরুতর অভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু জননীর অনুপস্থিতিতে সে অভিযোগের কোন প্রতিকার হইল না দেখিয়া 'মায়ের দুলাল' ছেলের অভিমানদৃপ্ত মন সেই মুহূর্ত হইতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল প্রতিশোধ চিন্তাই করিতেছিল। এখন এই দরদীর (মায়ের) স্নেহস্পর্শে সেই অভিমানের সাগর আরও ফুলিয়া উঠিল।' পুত্র পরেশের এই মনোভাবের পাশাপাশি মায়ের ছবিটিও দেখা যাক। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দেখা গেল মা ভুবনেশ্বরী 'প্রতিশোধস্বরূপ তাহার পুত্রকে আবার বিবাহ করাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিলেন।' নীরদের মা তাকে সৎ পরামর্শ দিতে এলে 'ভুবনেশ্বরীর আক্রোশের আগুন দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিল।' এবং যোগরাণীর বাপের বাড়ি যাবার চল্লিশ দিনের মধ্যেই তিনি তার 'আদুরে গোপাল'কে আবার বিয়ে দিলেন।

এই বিবাহিত যুবকের মাতৃনির্ভরতা এবং মায়ের দিক থেকে একমাত্র ছেলেকে আগলে রাখার প্রবণতা—দুয়ে মিলে আখ্যানের সমস্যা নির্মাণ করেছে এবং উপন্যাসের মূল চরিত্রকে দুঃসহ অভিজ্ঞতায় আরো পাঁচটি নববিবাহিতার থেকে স্বাতন্ত্র্যে স্থাপিত করেছে। নববিবাহিত যুবকের পত্নীতে নির্লিপ্ততা আমাদের পূর্বকথিত লক্ষণের দিকে তাকাতে বাধ্য করে। এভাবেই যদি ব্যাপারটা হতো তা হলে ঔপন্যাসিককে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মনোগহনে অবতরণ করার জন্যে অসংখ্য সাধুবাদ দিতাম, কিন্তু পরেশের একটি উক্তিতে পত্নীর প্রতি তার অনুরাগহীনতার কারণ শুনে আমরা সেই মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। "আগেই তো জানি তুমি আমায় নিয়ে সুখী হবে না, নীরদই তোমার উপযুক্ত স্বামী হইত" —এই 'নিদারুণ বজ্রাঘাতে' যোগরাণী বিধ্বস্ত হয়ে গেল কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম অন্যতর একটি কারণ যা লোকমুখে ক্ষীণ প্রচার থেকে সংগৃহীত। পরেশ জানে অথচ এতবড় একটা অস্ত্র সে মায়ের হাতে তুলে দিল না দেখে একটু অবাক লাগে!

পরেশের অনুকূলতা পেয়ে মায়ের যে তৎপরতা ও প্রতিশোধস্পৃহা তাকে ঠিক 'মায়ের দয়া' ('চোখের বালি') বলে আখ্যা দেওয়া যায় কি? পরেশের ক্ষোভ ও নির্লিপ্ততার সহজ কারণ পরবর্তীকালে পাওয়া গেলেও ভুবনেশ্বরীর ক্ষোভ ও নিষ্ঠুরতার কারণটি সহজ নয় এবং এ-জন্যেই ভুবনেশ্বরী এই উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছে। শুধু এই উপন্যাসেই বা বলি কেন, এই চরিত্রটিকে যে বাংলা উপন্যাসের মধ্যমণি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

নীরদ চরিত্রটিই উপন্যাসে সবচেয়ে প্রাণবন্ত চরিত্র হয়ে উঠতে পারত। প্রাথমিক মানসিক বিপর্যয় ও তারপর চিত্তরঞ্জনের বাসায় শ্যামগ্রামের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে পড়ে সে শুধু উপন্যাসের পটভূমিকেই ব্যাপ্তি দেয় নি সব দিক থেকেই সংগত বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে। মন্দাকিনীর মৃতসংবাদ পাওয়ার পর তার শ্যামগ্রামে ফিরে যাওয়া উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই তার বিয়ে, রাধানগরে বসবাস, সন্তানদের মতলবে পরেশের সঙ্গে যোগাযোগ, পরেশের মনে স্থূলভাবে হলেও নানা ধরণের মনস্তাত্ত্বিক 'থ্যারাপি'র ব্যবস্থা, পরেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া, সুরঞ্জার পত্র (হয়তো নীরদেরই পরামর্শে), পরেশের বিপর্যয়ের খবর সহ যোগাযোগ, সদ্গামেচন্দের প্রাথমিক ব্যবস্থা—সব কিছুর মধ্যেই জীবন-ধর্মিতা ফুটে ওঠার পূর্ণ অবকাশ ছিল কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্র জুড়ে ঈশ্বর সন্ধানের যে তত্ত্বটি অনড় হয়ে আছে তার ফলে চরিত্রটি বাস্তবতার অভিপ্রেত সোনার কাঠির স্পর্শ পেল না।

যোগরাণীর ক্ষেত্রেও এ কথাটা খাটে, তাই সে ভ্রমর হয়ে ওঠে না ('কৃষ্ণকান্তের উইল') সত্যবতী ('প্রথম প্রতিশ্রুতি') হয়ে উঠতে পারে না বরং হয়ে যায় অনেকটা আশালতার ('চোখের বালি') মত। শ্বশুরের ক্রুদ্ধমূর্তির কাছে সে চুপ থাকল। "এই ক্রোধাগ্নিশিখা বিস্তৃত হইলে, কোনদিকে কতটুকু পর্যন্ত গ্রাস করিয়া, কাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারে—তাহা যোগরাণীর বুঝিতে বাকী রহিল না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাহার পড়া ছিল; তাই বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ শ্বশুরের এই ইঙ্গিতবাক্যে চিত্রিত ভাবীকালের ভয়াবহ দৃশ্য তাহার মানসনেত্রে উদিত হইবামাত্র সে বালিকা ভীতা হইয়া গেল। তখনই সে ভয়ত্রস্ত হইয়া, যাহার প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল, তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিল—'না না বাবা, আমার তেমন কিছু হয় নাই'।"

যোগরাণী মায়ের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি গেল। তার ভাগ্য ভাল শাশুড়ীও তখন ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে বাপের বাড়ি। মায়ের নির্দেশে কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে স্বতন্ত্র ভূমিতে দাঁড় করাতে পারল না। আধুনিক মানুষের "Powerful individuality made them in religion, as in other matters, altogether subjective." কিন্তু যোগরাণীর বেলা এমনটি হল না। আজ স্বামীর পাশে দাঁড়ানোই তার ধর্ম। স্বামীর সংকটে সে বাবার অর্থবল জনবল কাজে লাগল না। "কিছুই না বাবা, আমি কিছুই নিতে চাই না। আমি শ্যামগ্রামের জমিদারের কন্যা—একথা আজ ভুলে যান,—মনে করুন আমি রাধানগরের দরিদ্র পরিবারের কুলবধূ।" যোগরাণী উপন্যাসে শেষপর্যন্ত আবার পেয়েছে অনুশোচনাদগ্ধ স্বামীকে, স্নেহবৎসল শ্বশুরকে। গ্রামের সেই রণরঙ্গিনী শাশুড়ী নীরদের মার কাছে এসে কাতরকণ্ঠে পুত্রকে রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন, এ খবর উপন্যাস থেকে পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যায় যোগরাণী এবার ভালো থাকবে। প্রতিবাদ নয়, নারীর কর্তব্য ও আদর্শের দোহাই দিয়ে ঔপন্যাসিক তাদের সকলকে মিলিয়ে দিয়েছেন। যোগরাণীকে পরিবারের যারা অন্যরূপ শক্তির মদৎ দিতে পারতেন সেই দাদা কিরণের (তখনকার দিনের ডেপুটি) নিশ্চুপতা ও নির্লিপ্ততা মেলে

হয় ঔপন্যাসিকই তাকে নিশ্চুপ ও নির্লিপ্ত রেখেছেন) আমাদের মনে এ ধারণার জন্ম দেয়—ঔপন্যাসিকের ধর্মবোধ উপসংহারটা আগেই বানিয়ে রেখেছে।

ঙ. 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসে ছোট বড় সাতখানি চিঠি আছে। চিঠির লেখক ও প্রাপকরা নিম্নরূপ :

১. নীরদ > যোগরাণী (চতুর্থ পরিচ্ছেদ);

২. কালীচরণ রায় > নীরদ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ);

৩. নীরদের মা > কালীচরণ রায় (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ);

৪. ভুবনেশ্বরী > কালীচরণ রায় (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ);

৫. যোগরাণী > সুরঞ্জা (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ);

৬. প্রাণেশ গুপ্ত > যোগরাণী (একবিংশ পরিচ্ছেদ);

৭. সুরঞ্জা > যোগরাণী (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ)।

চিঠিগুলোর মধ্যে প্রথম ও পঞ্চম চিঠি দুটি দীর্ঘ, ষষ্ঠ ও সপ্তম মধ্যম দৈর্ঘ্যের, চতুর্থটি সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির দৈর্ঘ্যর হিসেব দেওয়া সম্ভব নয় কারণ চিঠি দুটি পড়া হলেও ছাপা হয় নি, কিন্তু তা বলে গুরুত্বহীন নয়। দ্বিতীয় চিঠিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিগুলো যে যে মনোভাব বয়ে নিয়ে এসেছে সেগুলো যথাক্রমে : ১. সদুপদেশ ২. বৈষয়িক নির্দেশ ৩. উৎকণ্ঠা ৪. আক্রোশ ৫. সদুপদেশ ৬. অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা ৭. পরামর্শ। চিঠিগুলো অপপ্রযুক্ত নয়।

চ. 'অশ্রুমালিনী'তে কতকগুলো গান সন্নিষ্ট হয়েছে যথাক্রমে ১৩, ১৯ ও ২২ পরিচ্ছেদে। মোট ছটি গানের দুটো নীরদের গাওয়া; একটি সুরঞ্জার, বাকি তিনটি অপরিচিত কণ্ঠের। বদরপুর থেকে লামডিং যাবার পথের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মোহিত নীরদ আপন মনে গেয়ে উঠেছিল—'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' ইত্যাদি। ওই দৃশ্য দেখে বিভোর সহযাত্রীদের গানও ভেসে এসেছে অন্য অন্য কামরা থেকে। এক কামরায় কেউ গাইছে '... এত স্নিগ্ধ নদী কাহার' ইত্যাদি, তো অন্য কামরা মেতে উঠেছে :

'মেরা সোনা কা হিন্দুস্তান—মেরা সোনা কা হিন্দুস্তান।
যমুনাকো তটপর কৈহন মনোহর, শ্যামকো বংশীয়া তান,
তেরা ছাতিপর শ্যামল তরু ছায়া করত দান।' ইত্যাদিতে।

প্রাকৃতিক শোভা বা আবেগ মনকে মাতাল করে তুললে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করেই গান বেরিয়ে আসতে পারে এবং তা সংক্রামিত হয়ে যেভাবে অনবদ্য ঐকতানের জন্ম হয়েছে তাকে স্বাভাবিক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। ১৯ পরিচ্ছেদে নীরদের স্ত্রী সুরঞ্জা গাইছিল 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর', ঠিক তার পরই এই গানের রেশ থাকতে থাকতেই নীরদ গাইতে থাকে—'আর এক বাণী শুন বিনোদিনী / তুমি সে আমার গতি' ইত্যাদি। দুটি গানের ভিতর দিয়েই স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে মমতার ভাব ফুটে উঠেছে। ঠিক এর পরই এসেছে শ্যামগ্রাম থেকে যোগরাণীর চিঠি। গৃহসুখে মমতার সুপ্তিকে ভাঙিয়ে দিয়ে ওই চিঠি

সচকিত করে তোলে নীরদকে। সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। এভাবে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

উপন্যাসের শেষ গান ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপরে বা পাড়ে অপরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে শুনেছিল যোগরাণী ও তার বউদি :

'না জানি আপনা ভুলে চলেছি কোথায়,
মন মাঝে যেন কার ডাক শুনা যায়,
কোন্ সুদূর দেশে না জানি চলেছি ভেসে
ধূ ধূ করে দুই পাশে বিজন বেলা।'

গানটিকে 'অশ্রুমালিনী'র নায়িকার 'জীবনসঙ্গীত' বলা হয়েছে।

ছ. সুরেন্দ্রকুমার যখন উপন্যাস লিখেছেন তখন কলকাতা ও তার আশেপাশে উপন্যাসের জোয়ার। বুদ্ধির স্বাধীনতা, চাঞ্চল্য, বিদ্রোহ ও উপন্যাসের কোষে কোষে জীবনের তরঙ্গ তুলছে। আমরা বাংলা উপন্যাসকে বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে দেখছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে উঁকি দিচ্ছে নব নব প্রভাত। 'চোখের বালি' পড়ে চোখ ঝরঝর করে উঠেছে। 'চতুরঙ্গ'র আত্মসমীক্ষায় আমাদের চোখ খুলে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'নতুন আত্মবিশ্বাস, নতুন শিল্পচেতনা' রিয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিল পাল্টে। পাশাপাশি শরৎচন্দ্র—তিনিও সাবলীল ভঙ্গিতে ঢুকে পড়েছেন হৃদয়ে, সমাজে দরদে ও সহানুভূতিতে। এই অবস্থায় কলকাতা থেকে দূর এক ঔপন্যাসিক পরিমণ্ডলে বসে সুরেন্দ্রকুমার রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের উচ্চতায় উঠতে পারেন 'অ্যাকসিডেন্ট'টা ঘটল নি—সেভাবে তিনি এসেছেন, যেখান থেকে তিনি এসেছেন, আজও বলি সেখান থেকে তিনি যথেষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাঁর উপন্যাসের ভাষারীতির আলোচনা করি নি, তবে যেটুকু দেখা গেল তাতে পুনঃহাতে ঘরে ফেরারো প্রশ্ন ওঠে না। বিশ্বাসটাকে মর্মমূলে স্থান দিয়েছেন সুরেন্দ্রকুমার, তাই তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিচ্ছেদ নয়, বিশ্বাসের সন্ধান করেন—একে আমরা ঈশ্বরসন্ধান বলতে পারি। 'এই রহস্যময় মানবজীবনের অন্যতম প্রদেশ ঈশ্বর-সন্ধান। ঈশ্বর উপন্যাসের বহির্ভূত নন।'

জ. একটি ছোট প্রসঙ্গ।

আমরা জানি 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাস একদা ছোট শহর শিলচরে বসে লেখা। লেখকের গড়া ভুবনেশ্বরী বলতে গেলে একটি দুর্দন্ত চরিত্র (পরে তার শোধন হয়েছিল, এমন ইঙ্গিত উপন্যাসে পাওয়া গেছে)। একটি কথা শাশুড়ী ভুবনেশ্বরীর 'অবিদিত নহে যে, বর্তমানের স্কুলে শিক্ষিতা 'পাশটিং' করা বয়স্কা মেয়েগুলি ঘরকন্না বা গৃহিণীপনা শিখুক বা না শিখুক, স্বামী বশীকরণ মন্ত্রটি খুব ভালো করিয়াই শিখিয়া আইসে। তাই বিবাহের পরেই ছেলেগুলি আশু স্ত্রীবক্ত হইয়া পড়ে। .... এজন্য ভুবনেশ্বরী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন—যেন তাঁহার পরেশ স্ত্রীবক্ত না হইয়া যায়।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

আধুনিক এই আর্থ-সামাজিক সমস্যা তথা আজকালপরত্তর গল্পের পূর্বাভাস আজ থেকে সত্তর বছর আগে কী করে দিলেন লেখক সুরেন্দ্রকুমার? তখন তো এমনটা ছিল না—ব্যাপারটাতো এখানকার। আজকালকার বহু স্নেহাতুর ভুবনেশ্বরীই নিজের ভুবন থেকে বিসর্জিত শুধু পরেশদের 'সুখে'র বিনিময়ে।

তপোধীর ভট্টাচার্য

মননের প্রাকুতায়ন

প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক তত্ত্ববিদ ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর বহুপঠিত নিবন্ধ 'Theses of the Philosophy of History'তে লিখেছিলেন : 'Only a redeemed mankind receives the fullness of its past - which is to say, only for a redeemed mankind has its past become citable in all its moments.' (১৯৮৯ : ২৫৩) অতীতের এই পরিপূর্ণতা স্পষ্ট নয় যাদের কাছে, নিজেদের বর্তমানকেও তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। হেগেলের প্রবাদ-প্রতিম উচ্চারণে আমাদের নিয়তি হলো আমরা কী ছিলাম (Wesen its was gewesen ist)! সুতরাং বর্তমানকে যদি নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক ও আংশিক ভাবে দেখতে না চাই, দৃষ্টি ফেরাতেই হবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক অর্জনের দিকে। অতীতকে পরিপূর্ণভাবে জানা বিশেষভাবে আবশ্যিক বরাক উপত্যকার বাঙালির জন্যে, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিয়তির ক্রুর চক্রান্তে যারা কয়েক প্রজন্ম ধরে অনিকেত। মমতাহীন কালস্রোতে নিরাশ্রিতা নয়, ঔপনিবেশিক শক্তির হাতের পুতুল হয়ে উনিশ শতকে মূল বঙ্গীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল শ্রীহট্টকে। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সাংস্কৃতিক উৎস যেহেতু মূলত শ্রীহট্টে, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রতি সাম্প্রতিক আগ্রহের দিনে সংস্কৃতিচেতনাকে মুক্ত করার স্বার্থে অতীতের পুনর্পাঠকে বিশ্লেষণ করতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে নতুন প্রতিবেদন-রচনার। কেননা আজকের আত্মবিস্মৃত প্রজন্ম অভ্যন্তরীণ শাসন-কাঠামোর পেষণে নিজেদের মনকেও ঔপনিবেশিকৃত হতে দিয়েছে। ঔপনিবেশিকৃত মন আসলে মৃত মন; পাথুরে জমিতে ফুল ফোটানোর চেষ্টা না করে বরং জমিকে কর্ষণযোগ্য করার দুরূহ ব্রত নিতে হবে। অতীত ইতিহাসের অফুরান ভাঁড়ার বিস্মৃতির কালো পর্দার আড়ালে রয়ে যাচ্ছে; ঐ আড়াল সরিয়ে সংগ্রহ করতে হবে বীজধান। আর, সেই সঙ্গে, দর্পণ তুলে ধরতে হবে যার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রকৃত মুখটি দেখতে পাই, হয়ে উঠি সম্পন্ন কৃষক।

আনন্দের কথা, একাজ শুরু হয়ে গেছে। অগ্রণী গবেষক ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য সম্প্রতি তাঁর দীর্ঘকালীন সন্ধানের ফসল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গোলায় তুলে দিয়েছেন। 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ ও পত্রিকা' শীর্ষক বইটি ১৪০০ সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার বলা যেতে পারে। ১৯৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুনিশ্চিত বইতে উষারঞ্জনের মনন ও নিষ্ঠা চমৎকার ধরা পড়েছে। নানা কারণে এই বইটি উত্তরসূরি গবেষকদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। মনন ও নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্যাভিমুখী দৃঢ় অধ্যবসায় এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ কতখানি জরুরি, এবিষয়ে প্রাথমিক পাঠ আমরা এখানে নিতে পারি। আর, এই প্রতিবেদনের শুরুতে যেমন লিখেছি, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্পাঠ ছাড়া বর্তমানও অপ্রতিষ্ঠ, শৃঙ্খলিত। উষারঞ্জন ঐ মুক্তির ইশারা দিয়েছেন 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ ও পত্রিকা' পুনর্পাঠের নমুনা পেশ করে। 'নিবেদন' অংশে তিনি যা লিখেছেন সেই অনুযায়ী আঞ্চলিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ পুনর্পাঠ নিঃসন্দেহে জরুরি- 'এক দীপান্বিত অথচ অনালোচিত বিষয়'। এখানে আমাদের আরো একবার মনে পড়ে বেঞ্জামিনের কাব্যিক মন্তব্য

: 'As flowers turn toward the sun by dint of a secret heliotropism the past strives to turn toward that sun which is rising in the sky of history.' (তদেব)

উষারঞ্জন বইকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম ভাগে রয়েছে পরিষদ ও পত্রিকার প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও লেখকসূচী আর দ্বিতীয় ভাগে পত্রিকা থেকে আটটি নির্বাচিত প্রবন্ধ তিনি পুনর্মুদ্রিত করেছেন। অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতু রচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই কাজ খুবই সহায়ক হবে। পত্রিকার প্রাবন্ধিকেরা তাদের দিনে পণ্ডিত গবেষক হিসেবে সর্বজনমান্য ছিলেন; আজ, বিদ্যাচর্চা জগতে তথ্য ও তত্ত্ব বিস্ফোরণ জনিত তুমুল আন্দোলনের দিনেও, অগ্রপথিক হিসেবে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। বস্তুত সমস্ত ধরণের প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁরা যে মনীষা ও বিবেচনার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন, আজকের প্রজন্মের কাছে সেটিই সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়। ঐ অগ্রণী গবেষকদের রচনা এখন ঐতিহ্যের অঙ্গ; রাতের সমস্ত তারা যেহেতু থাকে দিনের আলোর গভীরে, আজকের বিদ্যাচর্চা নিশ্চয় দৃপ্রোথিত রয়েছে তাঁদেরই গড়া ভিত্তিতে। সম্পাদক হিসেবে উষারঞ্জন বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন পুনর্মুদ্রণের জন্যে প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। তিনি জানিয়েছেন : 'প্রধানত বিষয়বস্তুর আঞ্চলিক চরিত্রের দিকে নজর রেখে প্রবন্ধ নির্বাচন করেছি।' ঠিক কাজই করেছেন তিনি। কারণ, বৃহত্তর বঙ্গীয় পরিমণ্ডলের কাছে চিরদিনের অন্তেবাসী এবং কার্যত প্রত্যাখ্যাত 'অপর' হিসেবে শ্রীহট্ট সংস্কৃতির প্রাকুতায়ন থেকে কী পাঠ নিয়েছে - এইটে বিশ্লেষণ করে আজকের দিনে আমাদের করণীয় সম্পর্কেও মূল্যবান কিছু সূত্র পেতে পারি। সার্থক সম্পাদকের চাই বার্খটিন কথিত 'দ্রষ্টা চোখ'; এই চোখ উষারঞ্জনেরও আছে নিঃসন্দেহে। তাই তিনি পুনর্মুদ্রণের জন্যে সেই সব প্রবন্ধই বেছে নিয়েছেন যা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চাকে অনুপ্রাণিত করবে, হয়ে উঠবে 'ভবিষ্যৎ গবেষণার বিশেষ সহায়ক'। বহুপুড়োনো সেই চিত্রকল্প ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, অতীতের প্রদীপ্ত দীপশিখা থেকে বর্তমানে আরো অনেক প্রদীপ জ্বলে উঠতে পারে। আজকের পাঠকের জন্যে সম্পাদক প্রবন্ধ-লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত করেছেন; ফলে ধূলিমলিন অতীতের প্রশাখা সরিয়ে বর্তমান প্রজন্ম দূরবর্তী যাত্রাসূচনার উপকূলাংশকেও দেখতে পায় যেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনও করে নিয়েছেন তিনি যাতে মুদ্রণ প্রমাদ ও অসম্পূর্ণতার দায় এড়ানো যায়। এইটে সম্পাদকের সতর্ক ও শুভতাসন্ধানী মনের পরিচয় দিচ্ছে।

এই বইয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুলিখিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন। এ-অঞ্চলে যারাই সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করবেন, তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষে এই প্রতিবেদনটি অবশ্যপাঠ্য। শ্রীহট্টের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রাচীন যুগ থেকে পর্বে-পর্বান্তরে কিভাবে বিকশিত হয়েছে, এবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এখন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় যদি সুপরিকল্পিতভাবে দক্ষ গবেষকদের নিয়ে ইতিহাসের নতুন প্রতিবেদন রচনার প্রকল্প গ্রহণ করেন, তাহলে হরিকেল রাজ্য, ইন্দ্রপুরী ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্টতর ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিবর্তনের ইতিহাস। এক্ষেত্রে বাখতিন-কথিত 'বহুস্বরময় সন্দর' বা Polyphonic discourse হতে পারে আমাদের প্রেরণা। ইদানিং যখন বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী চিহ্নায়িত প্রাচীরগুলি ভেঙে পড়ছে, সমবায়ী পাঠ্যকৃতি রচনা আদর্শ বলে বিবেচিত হচ্ছে — সেসময় 'দ্রষ্টা চোখ'এর উন্মোচনই কাঙ্ক্ষিত। ঐতিহাসিক ব্রাউদেল তাঁর 'On History' বইতে (শিকাগো, লন্ডন : ১৯৮০ : ৩৩) 'a whole new way of conceiving

of social affairs' এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের নিয়ন্তা হোক স্বয়ং জীবন; সংস্কৃতি ও সাহিত্যকর্মীদের দায়িত্ব জীবনপ্রবাহে অবগাহন করা - 'to uncover the impersonal forces which in reality fashioned men and their destinies and to plot the slower rhythms at which social time in fact moved' (পৃ: ৬-১১, ১৭) কথা হচ্ছে প্রাগুক্ত ঐ 'দ্রষ্টা চোখ'এর প্রাথমিকতা শুধুমাত্র যার সাহায্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীরা লোকায়ত প্রবাহ থেকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। উষারঞ্জন তাঁর সম্পাদকীয় সন্দর্ভে শ্রীহট্টের উজ্জ্বল সাহিত্যিক অতীতের কথা উত্থাপন করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত উদ্যোগে রচিত ঐসব সাহিত্যকর্মে বৃহৎ ঐতিহ্য ও লঘু ঐতিহ্যের দ্বৈবাচনিকতা কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে, কিভাবেই বা বৃহত্তর ভারতীয় পরিমণ্ডল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সাংস্কৃতিক অনুপুঙ্খগুলি সুদূরবর্তী বহিঃপরিধি অঞ্চলে প্রাকুতায়িত হয়েছে - বর্তমান গবেষক-প্রজন্ম সেদিকে মনোযোগ দিতে পারেন। এব্যাপারে উষারঞ্জন উত্থাপিত সূত্রগুলি খুব কার্যকরী বিবেচিত হবে।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে উষারঞ্জন গবেষকদের জন্যে আদর্শ সন্দর্ভের একটি ধারণা দিয়েছেন। তথ্য সন্নিবেশের সঙ্গে বিশ্লেষণী মনোভিঙ্গীর সমন্বয় ঘটেছে 'পরিষৎ' ও 'পত্রিকা' শীর্ষক অংশে। এতে আমরা বুঝতে পারি, মনন-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদেরা ছিলেন অগ্রণী। এতে নিঃসন্দেহে আরো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবেন উত্তরসূরি গবেষকেরা।

বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে যে আটটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তাদের মূল্য অবাসিত হয়নি আজও। আজকের পাঠক-প্রজন্ম জানেন, পুনঃপাঠে মধ্য দিয়েই কেবল কোনো পুরোনো সন্দর্ভের উপযোগিতা পরীক্ষিত হতে পারে। যদি আমরা নিজেদের পাঠ্যকৃতি বিন্যাসের অবকাশ ও আয়তন খুঁজে পাই, তাহলে ধরে নিতে হবে যে ঐসব নিবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায় নি। সম্পাদক উষারঞ্জন 'পত্রিকা' অংশের বিশ্লেষণে যেসব বিস্তারিত তথ্যসূত্র দিয়েছেন, তাদের সাহায্যে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির মূল্যায়ন অনেকটা সহজ হয়েছে। এখানে অবশ্য কালিদাসের একটি প্রবাদপ্রতিম পঙ্ক্তিকে সতর্কবাণী হিসেবে মনে রাখা প্রয়োজন; 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্' অর্থাৎ পুরোনো হলেই সব কিছু চমৎকার হয় না কিংবা নতুন হলেও সব অনবদ্য হয় না। এর প্রধান কারণ, পূর্বসূরিদের বৈদগ্ধ সত্ত্বেও যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ না থাকার ফলে এবং চিরাগত ভাবসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাঁদের সিদ্ধান্ত কখনো কখনো ভ্রান্ত হয়েছে। পত্রিকার তত্ত্ববিষয়ক বিতর্ক থেকে লেখকদের বিপুল বৈদগ্ধ্যের যে পরিচয় পাই, তা আজকের পাঠকের মনেও সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। আবার সেই সঙ্গে বিশ্লেষণী প্রকরণের অনিবার্য গুরুত্ব সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করে।

উষারঞ্জন বিষয়বস্তু অনুযায়ী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বর্গ নির্ধারণ করেছেন এবং টীকা-টিপ্পণি সহ প্রাথমিক পরিচয় দিয়ে গবেষকদের সম্ভাব্য পরিশ্রমকে লাঘব করে দিয়েছেন। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর আলোচনাকে দিগদর্শক হিসেবে নিয়ে গবেষকেরা যদি উত্থাপিত সূত্রগুলির সন্ধান, বিকাশ ও অনুশীলনে তৎপর হয়ে উঠেন, তাহলেই কেবল সম্পাদকের অধ্যবসায় সার্থক হতে পারে। বিশেষত 'লেখকসূচী' অংশটি এই বইয়ের মূল্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি নতুন চোখে পড়ে সংস্কৃতির বিশ্বজনীন রূপ ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার অন্তর্বয়ন সম্পর্কে আমরা ঋদ্ধ হতে পারি। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্প্রতিক কালের উপলব্ধি দিয়ে বিগত কালের অভিজ্ঞতার সৌধকে আরো পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারি; ইতিহাস বলতে বুঝি সেই প্রতিবেদন যা ক্রমাগত নিজেকে ভাঙতে-ভাঙতে গড়ে। বেঞ্জামিন তাঁর নিবন্ধে লিখেছিলেন : 'History is the subject of a structure whose site is not homogeneous, empty time, but time filled by the presence of the now.' (১৯৮৯ : ২৬১) এই মন্তব্যের তাৎপর্য যদি নিবিষ্টমনে ভাবি, পূর্বসূরিদের বিপুল অধ্যবসায়কে আরো কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারব। তখন বহুপ্রজন্মের সমবেত প্রচেষ্টায় নিয়ত নির্মাণমান সমবায়ী পাঠ্যকৃতির প্রস্তুতিতে নিজেদের ভূমিকাও স্পষ্ট হবে। এই অত্যন্ত জরুরি কাজটুক আমাদের জন্যে যে উষারঞ্জন করে দিয়েছেন, এইজন্যে তাঁর কাছে আমরা আরো অনেকদিন ঋণী থাকব।

দুই

বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চা চিরদিনই ছোট্ট পত্রিকা নির্ভর। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূগোলে শুধু যে পূর্বতন প্রান্তে আমাদের অবস্থান, তা নয়; সংস্কৃতির মূল ভরকেন্দ্র থেকে বহুদূরবর্তী এক পরিধির বিপ্রত ছায়াকুলে থাকার ফলে ভ্রাতৃজনের হ্রস্ব কথাই আমাদের একমাত্র প্রতিবেদন যেন। বরাক-কুশিয়ারা-জিরি-চিরি-ধলেশ্বরী দিয়ে কত জল বয়ে গেলো, আজো প্রকাশন সংস্থা গড়ে উঠলো না। ফলে এই অঞ্চলের মন আজও 'অপ্রতিষ্ঠ'; বৃহত্তর বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এখানকার কোনো বার্তা সহজে পৌঁছায় না। তাই বলে এখানকার অধিবাসী মন কিন্তু হার মেনে নেয় না। সিসিফাস্ এর মতো বারবার নতুন ভাবে শুরু করে পাথর চূড়ায় তোলার প্রক্রিয়া। ছোট পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন প্রকৃতপক্ষে বরাক উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার একমাত্র বিশালকরণী। কথাটা কতখানি সত্য, এর প্রমাণ পাওয়া গেলো আরো একবার করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'অক্ষরবৃত্ত' পত্রিকার 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ বিশেষ সংখ্যা'য়। বঙ্গীয় পনেরো শতকের প্রথম বছর মাঘ মাসে (জানুয়ারি ১৯৯৫) পত্রিকাটির ৫ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যার উপজীব্য 'বরাক উপত্যকার পুঁথিসাহিত্য'। এই সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ কেন নেওয়া হলো, একথা সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছে। সম্পাদক লিখেছেন : 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ১৪০১ বঙ্গাব্দকে 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বরাক উপত্যকার ধারাবাহিক ইতিহাসের যেসব মূল্যবান উপাদান এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে সেগুলোকে খুঁজে বের করা এবং প্রাপ্ত উপাদানকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে জনমানসে সচেতনতা সৃষ্টি করাই ঘোষিত বর্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর এই বর্ষের উদ্যোক্তা সম্মেলনের গবেষণাপর্ষদ অক্ষরবৃত্ত সম্পাদককে উক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার অনুরোধ জানান। এরই ফলশ্রুতি এই বিশেষ সংখ্যাটি।' (পৃ: vi)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, 'অক্ষরবৃত্ত' পত্রিকা মাটির গভীরে প্রোথিত শেকড়কে ভুলে যায় নি। সাধারণত লিটল ম্যাগাজিন নাসিসাস ধর্মী, কস্তুরীমৃগের মতো নিজের গন্ধে নিজেই বিভোর; বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সংযোগসূত্র অস্বীকার করাকেই ভাবে বৌদ্ধিকতার পরাকাষ্ঠা। আনন্দের কথা, বরাক উপত্যকার এই পত্রিকা তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধান অক্ষুণ্ণ রেখেছে; স্বীকার করে

নিয়েছে তার সামাজিক দায়। 'বরাক উপত্যকার পুঁথি সাহিত্য চর্চা'কে কেন বিশেষ সংখ্যার বিষয় করা হয়েছে, এসম্পর্কে সম্পাদক জানিয়েছেন : 'বরাক উপত্যকার পুঁথি সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার এখনও অনালোচিত অবস্থায় রয়ে গেছে; এবং এখানকার ইতিহাসের তো বটেই এমন কি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিরও বহু উপাদান এখনও পুঁথির পাতায় আত্মগোপন করে আছে।' (তদেব) প্রসঙ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন। এ-অঞ্চলের গবেষকেরা যে এই সোনার খনিকে সাধারণ ভাবে অবহেলা করে এসেছেন, এর সবচেয়ে বড়ো কারণ, ঔতিহাসিকভাবে নিববাসিত ছিন্নমূল মানসিকতা। নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের শেকড় সম্পর্কে উদাসীনতা, অনীহা- এমনকি অবজ্ঞা যেখানে এখানকার আত্মবিস্মৃতির ভয়ংকর চরিত্রকে চিনিয়ে দেয়। এই প্রতিবেদনের অন্যত্র যে ঔপনিবেশিকৃত মনের কথা লিখেছি, তারই অভিব্যক্তি এই আত্মঘাতী নিশ্চলতা। একে আরো সর্বগ্রাসী করে তুলেছে পারম্পর্যহীন ও আরোপিত আধুনিকতাবাদের প্রসার। আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্যমহীনতা, বৃত্তবদ্ধত্বের সঙ্গে বিভ্রান্তি। এখানকার গবেষকদের লড়াই ভেতরে ও বাইরে, জ্যাড্যের সঙ্গে এবং স্বহীনতার সঙ্গে। চিন্তচেতনার সর্বশেষ অভিঘাতের সঙ্গে অন্তত প্রাথমিক পরিচয়টুকু যদি না থাকে, কোনটি মনযোগের বিষয় আর কোনটি আদৌ নয় কিংবা কী দেখব কেন দেখব - এসম্পর্কে কোনো ধারণাই জন্মাবে না। তার ওপর রয়েছে সামান্য পুঁজি সম্বল করে অধিকারবহির্ভূত অঞ্চলে পদচারণা করার ক্ষতিকর দুঃসাহস দেখানোর প্রবণতা। এর পরের ধাপে রয়েছে অবধারিত অতৃপ্তি যা কিনা গবেষকের সকর্মকত্বকে নিশ্চিত করে।

এই সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে শিকড়ের পুনরাবিষ্কার, মননের প্রাকুতায়ন। 'অক্ষরবৃত্ত' সেদিকে পদক্ষেপ দিয়েছে বলে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এ-অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির অগ্রণী গবেষক বলে পরিচিত অমলেন্দু ভট্টাচার্য নিজে যেমন বিশেষ সংখ্যায় নিবন্ধ লিখেছেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে জগন্নাথ দেব, তারিণীচরণ দাস, পুলিনবিহারী ভট্টাচার্যের রচনাগুলি সম্পাদককে ছাপানোর জন্যে দিয়েছেন। সম্পাদক এজন্যে অমলেন্দুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, পাঠকও ধন্যবাদ জানাবেন নিশ্চয়। সংখ্যার শুরুতে রয়েছে পুঁথির পাতার চারটে আলোকচিত্র। বরাক উপত্যকার ছাপাখানা এখনো যে অনধুনিক স্তরে রয়ে গেছে, এই দুধুনায়ক তথ্য আরো একবার পীড়িত করে আমাদের। সম্পাদক যন্ত্রের ত্রুটি করেন নি; কিন্তু আলোকচিত্র সহ গোটা সংখ্যাটি এ-অঞ্চলের মুদ্রণ জগতের পিছিয়ে-থকাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সংখ্যার প্রথম নিবন্ধ হলো জগন্নাথ দেবের 'শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'। এই নিবন্ধ পড়ে আমাদের প্রথম যেকথাটি মনে পড়ে, এইটে হলো, আর দেরি না করে শিলচর নর্মাল স্কুল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুরোনো পুঁথির বৈজ্ঞানিক রক্ষণাবেক্ষণ ও যৌথ গবেষণার উদ্যোগ নিতে হবে। অন্য বিষয় ছাড়াও বিশেষভাবে সঞ্জয়ের মহাভারত সম্পর্কে অনতিবিলম্বে একটি গবেষণাপ্রকল্প হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় নিবন্ধ হলো তারিণী চরণ দাস-এর 'বিবেকের যুদ্ধ'। গঙ্গারাম সেন ও ভবানী দাসের পুঁথি আলোচনা করে নিবন্ধকার কিছু প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অগ্রপথিক হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তিনি করে গেছেন। এবার পরবর্তী গবেষক-প্রজন্মের দায় পুঁথি-আলোচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থাপনা। বরাক উপত্যকার সাম্প্রতিক বিশিষ্ট কবি যেমন লিখেছেন : 'পরবর্তী

কুশীলব শিল্পরাজে / গোপন দরজা হয়তো খুলিবে আরো / হয়তো বা মীড়ে ও গমাকে শালিত সত্যের মুখ স্পষ্টতর হবে।

তৃতীয় নিবন্ধ 'জয়ন্তিয়ার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে দিগদর্শন' এর লেখক পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য। অবশ্য এই রচনাকে নিবন্ধ না বলে টিপ্পনি বলা যেতে পারে। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে হলেও প্রত্নকথা-সমাজতত্ত্ব-সাহিত্য-সংস্কৃতিস্তরের সম্মিলিত উদ্ভাসনে উৎসাহী গবেষকদের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন।

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মজ্ঞান হাড়মালা হরপার্বতী সংবাদ' একটি কৌতূহলজনক পুঁথি। এটি পুনর্মুদ্রিত করে সম্পাদক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই চারজন পূর্বসূরি গবেষকদের রচনাবিশেষ তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে সম্পাদক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। চারটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি, শিলচর নর্মাল স্কুল ধাত্রীর ভূমিকা নিয়েছে। পুঁথির রত্নভাণ্ডার হিসেবে গণ্য নর্মাল স্কুলের সংগ্রহকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হতে দেওয়া সামাজিক অপরাধ। 'অক্ষরবৃত্ত'র উদ্যোগে যে-কাজ শুরু হলো, তাকে ঈপ্সিত পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়া আজকের গবেষকদের পক্ষে শুধু সারস্বত কর্তব্য নয়, সামাজিক দায়ও বটে।

যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলা পুঁথির লিপিকাল' খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এর পুনর্মুদ্রণ হওয়াতে সাম্প্রতিক গবেষকদের কাছে কিছু জরুরি তথ্য আরো একবার উপস্থাপিত হতে পারলো। যারা পুঁথি বিষয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য।

জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য 'অষ্টাদশ শতাব্দীর অজ্ঞাত কবির অময়াত দুখানি রচনা' নিবন্ধে কৃষ্ণমোহন নামে আঠারো শতকের এক কবি সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেছেন। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের জন্যে কিছু মূল্যবান সূত্র এতে রয়েছে; ইতিহাস ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে কৃষ্ণমোহনের রচনায় প্রাণদায়ী সমাজের স্থবির অচলায়তনই ব্যক্ত হতে দেখি। 'কালীচরণ উপাখ্যান' এবং 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'র পাঠ্যকৃতি বিশ্লেষণের সাম্প্রতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে গবেষকেরা যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে অঞ্চলের বিদ্যাচর্চায় শুভপুষ্প বিকশিত হতে পারে।

অনুরূপা বিশ্বাসের প্রবন্ধের ভিত্তিও নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত পুঁথি। প্রাগাধুনিক কালের কবি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের 'কৌতুক বিলাস' তাঁর রচনার উপজীব্য। উনিশ শতকের শুরুতে ঔপনিবেশিক সমাজসংস্কারের মধ্যে মধ্যযুগীয় চিন্তাশৃঙ্খল না ভেঙেই যে আধুনিক বাঁকফেরা উন্মেষ হয়েছিল, তাতে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্বয়, প্রকরণ ও মূল্যবোধে নতুন অভিব্যক্তি অর্জন করতে শুরু করেছিল। ঐ শতকের চল্লিশের দশকে শ্যামাচরণ কিন্তু সমকালীন ভাববিপ্লবের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হন নি। ওঁর প্রতিবেদনে দেখি গতির বদলে স্থবিরতা, সন্ধানের বদলে পুরানুবৃত্তি। অথচ সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক পেশো-র মতে সার্থক প্রতিবেদন হলো 'the potential sign of a movement within the sociohistorical filiations of identification, in as much as it constitutes, at the same time, a result of these filiations and the work .... of displacement within their space' (১৯৮৮ : ৬৪৮)। ক্রান্তিকালীন সমাজে যারা লিখছেন, তাঁদের প্রতিবেদন ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। তখন এক ধরণের সন্দর্ভ থেকে অন্য ধরণের সন্দর্ভে রূপান্তরিত পাঠ্যকৃতির মধ্যে সামাজিক চেতনার বিবর্তন প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এমন যদি না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সন্দর্ভ-প্রণেতা আপন সময়ে পরবাসী। সুতরাং শ্যামাচরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ আলোচনায় গবেষকেরা এদিকে মনোযোগী হতে পারেন। নর্মান ফেয়ারক্লাওয়ের মতো বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন; 'Discourse is studied historically and dynamically in terms of shifting configurations of discourse types in discourse processes, and in terms of how such shifts reflect and constitute wider processes of social change.' (১৯৯৪ : ৩৬-৩৮)

জম্মজিৎ রায়ের 'বরাক উপত্যকার মনসা-পুঁথি' একটি সুলিখিত নিবন্ধ। নতুন তথ্য, নতুন তত্ত্ব, নতুন বিশ্লেষণ এর সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রতিবেদন রচনার কাজ যদি আগামী দিনের গবেষকেরা গ্রহণ করেন, সেসময় এধরণের কাজ তাদের প্রেরণার উৎস হতে পারে।

একই কথা বলা যায় অমলেন্দু ভট্টাচার্যের 'গোরক্ষীর পাঁচালী ও পূজাৰিধি : দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি' শীর্ষক নিবন্ধ সম্পর্কেও। লোককথা, কিংবদন্তি, রূপকথা ইত্যাদিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই; তবে কল্পনা ও বাস্তবের দ্বৈবাচনিকতা এদের মধ্যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেবিষয়ে স্পষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা চাই। শ্রুতিসাহিত্য বা লোকশ্রুতি সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতদের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে এ-অঞ্চলের প্রায়োগিকস্তরে তাদের উপযোগিতা পরীক্ষার কাজে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে। 'অক্ষরবৃত্ত'র এই বিশেষ সংখ্যা এব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আশা করি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, উষারঞ্জনের বই এবং কপিলাংশু সম্পাদিত পত্রিকা এসময়ের দুটি সার্থক প্রকাশনা। তবু, সব শেষে যে কথা থেকে যায়, সেটাই হলো, গবেষকেরা চিন্তার কাঠামো যেভাবে তৈরি করুন না কেন - সেই কাঠামো যেন খাঁচার প্রতিবিম্ব না হয়ে ওঠে। নতুন ভাবে গড়ার জন্যে যখন অধ্যবসায়ী উদ্যম নিচ্ছেন, সেসময় যেন প্রয়োজনবোধে ভাঙার জন্যেও তৈরি থাকেন। আলো জ্বলুক, কখনো ধূসরিত কখনো বা তীব্রউজ্জ্বল; পেছনে-থাকা অন্ধকারও যেন না ভুলি। সৃজনের মুহূর্তে সত্যের দ্বৈবাচনিক প্রয়াস-পথকে যদি মনে না রাখি, ছদ্মসত্যের ঝলকানিতে বিড়ম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। থাকুক, তবু গবেষকদের জন্যে একটা পথই খোলা - যে পথ সামনের দিকে।।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা — উষারঞ্জন ভট্টাচার্য; ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

অক্ষরবৃত্তঃ ইতিহাস সন্ধান বর্ষ বিশেষ সংখ্যাঃ Vol-3, No. 1; সম্পাদক-কপিলাংশু কান্তি দে, করিমগঞ্জ, আসাম, জানুয়ারি, ১৯৯৫

অনুরূপা বিশ্বাস

"ইতিহাসের মৌনমুখর মুহূর্তগুলি কথা, বলুক আজ"

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্তের লেখা 'যে পথ দিয়ে এলাম' বইটির প্রথম প্রকাশকাল ডিসেম্বর '৯৪। ঐ মাসেই ১৭ তারিখে North Eastern Centre for Advanced Studies (NECAS) বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের একটি বিশেষ বক্তৃতা সভার আয়োজন করে শিলচর গান্ধীভবনে। সেই সভায় শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থখানির আবরণ উন্মোচন করেন। সংস্থার সভাপতি হিসেবে ঐ দিনের সভার পৌরোহিত্য করেছিলাম আমি। লেখক ঐ দিনটির কথা স্মরণে রেখে বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে। বিশেষত শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্য্যের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তির হাতে উন্মোচিত হয়েছে বলে একটা গোপন গর্ব ও পরিতৃপ্তি বোধ তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি আরো সুখী হয়েছিলেন যখন আমার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে গবেষণা পরিষদের জানালে এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। সাগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন নিজের চোখে সেই গ্রন্থ সমালোচনাটি দেখবেন এবং পড়বেন বলে। কিন্তু দেখা আর হলো না - আজ গ্রন্থ সমালোচনার এই অতিরিক্ত অংশটি লিখতে গিয়ে কলম এগোতে চায় না - মন বেদনাভারে নুয়ে পড়ে। কত কথাই না মনে পড়ছে। আমাকে কথা দিয়েছিলেন স্বাধীনতা পরবর্তী ৩/৪টি বছর অর্থাৎ কাছাড়ের অবিস্মরণীয় কৃষকসংগ্রামের রক্তরঞ্জিত ঝড়ো দিনগুলির ইতিহাস এবার লিখবেন। উত্তাল শ্রেণী সংগ্রামের সেই সব দিনেই আমি তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম, জেনেছিলাম একজন অতি সদক্ষ, অবিচল, গণসংগ্রামের একজন নিখুঁত যোদ্ধারূপে।

১৯/১২/৯৪-র উন্মোচনের দিনে আমাদের হাতে যে বই তুলে দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল - 'ইতিহাসের মৌনমুখর মুহূর্তগুলি কথা বলুক আজ' এই কথাটি। স্বহস্তে সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কথাগুলি চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে অথচ তিনি নেই। মৃত্যু এমন অমোঘ তবু আমরা তা মনে রাখি না। ২০/১০/৯৬ সোমবার রাত পৌনে আটটায় মৃণালকান্তি দাসগুপ্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গেলেন। এমনিতে সুস্থই ছিলেন। দু'দিন আগে বাড়িতে ভোরের দিকে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।

ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের কার্যক্রমে গোড়া থেকেই উৎসাহিত ছিলেন। ৮-ই জানুয়ারী '৯৫ আমাদের সঙ্গে পাথরকান্দি অঞ্চলের 'প্রতাপগড়-জফরগড় ইতিহাস অনুসন্ধান' আলোচনা সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সারা দিন ওখানে ছিলেন। ঐ এলাকায় সর্বজনপ্রিয় নেতা হিসেবে সভায় মনোজ্ঞ ভাষণও দিয়েছিলেন।

তাঁর আরও কাজ অসমাপ্ত রইল। মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। নয়তো বর্ণিত পথের পরের শিহরণ জাগানো দিনগুলির বর্ণাঢ্য বিবরণ পাওয়া যেতো তাঁর কাছ থেকে। বৃহত্তম সংখ্যক বঞ্চিত মানুষের মহত্তম মুক্তির স্বপ্ন দেখা চোখ দুটি চিরনিদ্রার অতল তলে তলিয়ে গেল। ইতিহাস তো জনগণের চলমান জীবনের সমধ্বনি অংশ ধরে রাখে। চিরকালের এগিয়ে চলার সেই ইতিহাসের একটি ছোট্ট খণ্ডিত টুকরোকে দুই মলাটের মধ্যে ধরে রেখে গেলেন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। তারপর, বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে। এখন তিনি নিজেই ইতিহাস।।

'যে পথ দিয়ে এলাম' লেখক শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ। যেহেতু বর্ণিত পথটি ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক বিশেষ পর্বের (১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭) স্মৃতিচিহ্নবাহী, তাই বইটি ইতিহাসের মর্যাদা লাভের অধিকারী। সুরমা উপত্যকার রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চায় এই বই অন্যতর দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম কিভাবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সুরমা উপত্যকায় একশে তরুণদের সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা পথ বেয়ে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির শৃঙ্খলমুক্তির ও সমাজ বদলের অনুপ্রেরণায় শ্রেণী সংগ্রামে পর্যবসিত হল - এই ক্রমটি শ্রী দাশগুপ্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক লেখায় খুব সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। বস্তুত কিশোর বয়স থেকে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবাহে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হবার ফলে এই স্মৃতিচারণ আত্মস্মৃতিমূলক না হয়ে সমগ্র উপত্যকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক তথ্য বহুল ব্যক্তিগত ও নির্ভরযোগ্য দলিল হতে পেরেছে। তিনি বইটি লিখেছেন তাঁর নিজস্ব আত্মীকৃত বিশেষ সমাজ দর্শনের নিরিখে। তাই ইতিহাস রচনায় ইতিহাস প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিষয়ে তাঁর মনে যে প্রশ্নগুলো জেগেছে তা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছেন এইভাবে - "ভূমিধী প্রথার বিরুদ্ধে, প্রজাসত্বের দাবীতে, নানকার প্রথার গোলামীর অবসানে অথবা ভাগচাষের তিন বা পাঁচভাগ ফসলের দাবীতে সারা বাংলাদেশে ও সুরমা ভ্যালীতে কৃষকদের যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সংগঠিত হয়ে গেল - তাতে একজন সামন্তবাদী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গণের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচয়িতার সংঘাত অনিবার্য নয় কি? দুজনেই কী তার একই মূল্যায়ন করতে পারেন?" অথবা "সুরমা ভ্যালীতে ১৯২০-২১ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণমিত প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে বাগান ছেড়ে সদলবলে যে যাত্রা করেছিলন, ইতিহাসে যা 'চাঁদগোলা এপ্রোডাস' নামে খ্যাত, সেই সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের সুরমা ভ্যালী নেতৃত্বের কী ভূমিকা ছিল?" এই সব বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে এ ক্ষেত্রে তিনি সংগ্রামরত শ্রমিক কৃষকদের অবস্থানে নিজেকে রেখে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামগুলির ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর লেখায় তথ্য আছে প্রচুর যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের খুব বেশি কাজে লাগবে।

সুরমা উপত্যকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাপথটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য যে সব ক্ষেত্র গভীর পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে তিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থারম্ভেই ৭ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি সেই ক্ষেত্রগুলির সন্ধান দিয়েছেন এইভাবে - (ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রথমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, পরবর্তী স্তরে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। (খ) সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবী দলগুলির ব্যাপক কার্যকলাপ এবং উপত্যকায় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ যুবসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের উপর তার প্রভাব (গ) কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ সশস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা মার্কসবাদে দীক্ষা নেবার পর সেই নেতৃত্ব এবং কৃষক শ্রমিক ছাত্র আন্দোলন থেকেউদ্ভুত শ্রেণী-সচেতন নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কীভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই সব তথ্য ও তাৎপর্যবই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ভেতর দিয়েই সুরমা উপত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস রচিত হতে পারে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকাকে তিনি এই ধারার মধ্যে রেখে বিচার করার পক্ষপাতী। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পথে তিনি যান নি তাতে এক হিসেবে ভালই হয়েছে। স্মৃতিপ্রস্ত তথ্যের ঘনঘটায়

ভাবাক্রান্ত হয় নি। বইটি সুখপাঠ্য; ভাষা সহজ, গতিশীল, ঝরঝরে; কোথাও আড়ষ্ট নয়। বিষয়টি গুরুগম্ভীর যদিও, এই প্রসাদগুণে সাধারণ পাঠকও পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খাবেন না বলে মনে হয়। তাছাড়া বইখানি পড়লে অনেক কিছু জানা যায়। পেছনে ফেলে আসা সদ্য অতীতটা আমাদের কাছে ধরা দেয় - হয়তো বা স্মৃতিমেদুরতা কদাচিৎ বা বেদনার সঞ্চার করে মনে। বর্ণনার গুণে একেকটি ছবির মতো বিগত দিনের ঘটনাগুলিকে জীবন্ত বলে মনে হয়। তবে কালানুক্রমিকতা সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের কিছু ঘটনার কথা বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে। আমি মনে করি, এই পর্বটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা (তত্ত্বগত) থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই খাপছাড়া মনে হয়েছে। শিলচরের মৈত্রী প্রকাশনীতে বইটি ছাপা হয়েছে। ছাপা যাই হোক - বাঁধাই মোটেই ভাল হয় নি। প্রচ্ছদের বোর্ডটি মূল বই থেকে চট্ করে আলগা হয়ে ছিঁড়ে পড়ে। প্রচ্ছদপটটি ভালই হয়েছে, তবে কাগজ নিম্নমানের বলে দৃষ্টিনন্দন হয় নি। লেখক দাশগুপ্তকে এমন একখানি বই উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

যে পথ দিয়ে এলাম - মৃণাল কান্তি দাশগুপ্ত; প্রকাশক-রফিক আহমেদ, শিলচর, কাছাড় আসাম; ১৯৯৪।

বরাক উপত্যকা ভিত্তিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, নিবন্ধ ও থিসিস সমূহের একটি প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ তালিকা

সংকলক - প্রশান্ত রঞ্জন আচার্য

Acharjya, Sudhir Chandra	1984	"Pre-primary and Primary Education in Tripura and Cachar : Development and Problems." Ph. D. dissertation. G.U.
Ahmed, K. U.	1994	*The Art and Architecture of Assam*. Gauhati and Delhi : United Publishers.
Allen, B. C.	1905	*Cachar District Gazetteer*. Shil-long.
Barman, Nalinindra Kumar	1972	*Queens of the Cachar or Heramba and the History of the Cachar*. Barkhola : Historical and Cultural Research Samity.
	1378 (Bengali Year)	*হেড়ম্বরাজ গোবিন্দচন্দ্রের হিন্দু শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত কীর্ণপঞ্জিকা.* Barkhola : Historical and Cultural Research Samity.
Barpujari, H. K.	1980	*Assam in the Days of the Company* (1826-1858). Gauhati : Spectrum Publications.
Becker, C.	1980	*History of the Catholic Missions in North East India*. Eds. G. Stadler and S. Karotemprel. Calcutta : Firma KLM Pvt. Ltd.
Bhatia, P.	1978	"Mechanisation of Agriculture in Cachar." Ph. D. dissertation. G.U.
Bhattacharjee, Amalendu	1984	"Folk Literature of Cachar." Ph. D. dissertation. G.U.

1985 "Marriage songs of Bengalee Hindus in Cachar District of Assam." *Folklore in North East India*. Ed. Saumen Sen. New-Delhi : Omsons Publications. Pp. 146-155.

1391 (Bengali Year) *বরাক উপত্যকার বারমাসী গান*। শিলচর : কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।

Bhattacharjee, J. B. 1976 "Some Important Sources of the History of Mediaeval and Modern Cachar." *Source Material of Modern Indian History*. Ed. Ram Pande. Jaipur.

1977 *Cachar under British Rule in North East India*. New-Delhi : Radiant Publishers.

1980 "A note on Private Papers in Cambridge South Asia Archives on Assam." *Sources of the History of India*. *Vol. III* Ed. N. R. Roy. Calcutta

1982 (Ed.) *Social Tension in North East India*. Calcutta : Research India Publications.

1983 "Middle Class and Language Politics in Assam during the Colonial Period." (Co-author : Sandhya Barua). *The Emergence and Role of Middle Class in North East India*. New-Delhi : Uppal Publishing House.

1984 "Anatomy of Social Formation in Cachar in 19th Century." *Com-memoration Volume*, 23rd Annual

Conference of the Institute of Historical Studies. Trivandrum.

1985 "History and Folklore in the Context of Barak Valley." *Folklore in North East India*. Ed. Soumen Sen. New-Delhi : Omsons Publications.

1986 (Ed.) *Studies in the History of North East India (H.K. Barpujari Felicitation Volume)*. Shillong, NEHU Publications.

1986 "Glimpses of the Pre-Colonial History of Cachar." *Studies in the History of North East India*. Shillong.

1987 "Dimasa State Formation in Cachar." *Tribal Politics and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North-Eastern India*. Ed. Surajit Sinha. Calcutta : K. P.Bagchi and Co.

1987 "Historical Research in North East India : Trends and Directions" (Co-author : Manorama Sharma). *Indian Historical Research Since Independence*. Ed. Tarasankar Banerjee. Calcutta : Naya Prokash

1987 "Dimasas of Assam in Transition." *Tribes of North East India*. Ed. S. B. Saha. Agartala : Rupali Publishing House.

1989 (Ed.) Sequence of Development in *North East India*. New-Delhi : Omsons Publications.

1989 "Sequence in Development in The Barak Valley." *Sequence of*

Development in North East India. Ed. J. B. Bhattacharjee. New-Delhi : Omsons Publications.

1989 "Changing Land Systems in North Cachar Hills of Assam and its impact on the Contemporary Society." *Changing Land Systems and Tribals in Eastern India in the Modern Period*. Calcutta : Subarnarekha.

1991 *Social and Polity Formations in Pre-Colonial North East India*. New-Delhi : Vikas Publishing House.

1991 "Political Divisions and Culture Zones in North East India." *Archaeology of North East India*. (Eds.) J. P. Singh and G. Sengupta. New-Delhi : Vikas Publishing House.

1992 "Krishnamohan Sharma, a biographical sketch." *Encyclopaedia of India Literature*, Vol. V. New-Delhi : Sahitya Academy.

1992 "Dimasa-Kachari State." *Comprehensive History of Assam*. Vol. II. Guwahati : Assam Publication Board.

1992 "Language and Literature of the Dimasa-Kachari State." *Comprehensive History of Assam*. Vol. III. Guwahati : Assam Publication Board.

1993 Kachari Rajya : *Utthan Aru Patan*. Guwahati : Asom Sahitya Sabha.

1993 (Ed.) *Studies in the Economic History of North East India*. New-Delhi: Har-Anand Publications.

1993 "Forward Policy." Comprehensive History of Assam, Vol. IV. Ed. H.K. Barpujari. Guwahati : Assam Publication Board.

1993 "Indo-Aryan Elements in Tribal State Formation Processes in Mediaeval North East India". *Dimensions of National Integration : The Experiences and Lessons of Indian History*. Ed. Prof. Nisith Ranjan Ray. Calcutta : Puthi-pustak and Institute of Historical Studies. Pp. 180 - 196.

1994 "The Pre-Colonial Political Structure of Barak Valley." *Essays on North East India*. Ed. Milton S. Sangma. New Delhi : Indus Publishing Company. Pp. 61 - 85.

Bhattacharjee, Jatindra Mohan

1349 (Bengali Year) *শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত ও শ্রীহট্ট-কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র।* শ্রীহট্ট : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ।

1378 (Bengali Year) *পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য (সাহিত্য সাধক চরিতমালা - ১১০)।* কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

1978 *বাংলা-পুঁথির তালিকা-সমন্বয়।* কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি।

Bhattacharjee, Jatindra Mohan and Choudhury, Bijonkrishna

1988 (Ed.) *বাউলকবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ।* আগরতলা : সরস্বতী বুক ডিপো।

Bhattacharjee, Jatindra Mohan	1989	*শ্রীহট্টের ভট্টসঙ্গীত।* যাদবপুর : বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।
Bhattacharjee, Manjulika	1986	"Cachar Valley during the Mutiny." M. Phil. dissertation. NEHU.
	1990	"Nationalist Movement in Cachar Valley (1857-1947). Ph. D. dissertation. NEHU.
Bhattacharjee, Padmanath	1317 (Bengali Year)	*হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি।* গৌহাটী : বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা।
	1328 (Bengali Year)	*হেড়ম্বরাজ্যের ক্ষমাশাসনবিধি।* বিহাড়া : শ্রী হরগোবিন্দ সেন।
Bhattacharjee, Suresh Chandra	1929	*আসামে মহাপ্রাবন।* শিলচর : প্রাচ্য-শিক্ষা পরিষদ।
Bhattacharjee, Saurindra Kumar	1980	"The Economic Development of Cachar District during 1951-1974." Ph. D. dissertation. G. U.
Bhattacharjee, Usha Ranjan	1978	"A study of the Kachar Dialect of Bengali." Ph. D. dissertation. G. U.
	1993	*শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ ও পত্রিকা।* কলকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি।
Bhowmick, Kanailal	1982	"The Development of Social Education in Tripura and Cachar." Ph. D. dissertation. G. U.
Bhuyan, Md. Abdul Musabbir		"A study of the Jalalavadi Nagri Script and Literature." Ph. D. dissertation.

Bhuyan, Suryya Kumar	1936	কছাড়ী বুরঞ্জী। গৌহাটি : Department of Historical and Antiquarian Studies.
Biswas, Chinmay Kanti	1986	"Study of a Kabui Naga Pocket in Silchar town : A study of the process of Social Interaction." Ph. D. dissertation. G. U.
Chakraborty, Archana	1984	"The Surma Valley Political Conference (1906-1932)." Public Associations in India. Ed. N. R. Roy. Calcutta : Institute of Historical Studies. Pp. 146-155.
Chakraborty, Barun Kumar	1986	*বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস।* কলিকাতা : পুস্তকবিপণি।
Chakrabroty, Monotosh	1992	"Aryan Influence on the People of Assam." Ph. D. dissertation. R. U.
Chakraborty, Sisir	1982	"The Demographic Aspects of the Economic Development of Cachar, 1951-1974." Ph. D. dissertation. G. U.
Chaudhury, Bibhas Ranjan	1982	"Socio-Economic Problems of Cachar since Partition." Ph. D. dissertation. G. U.
Chaudhury, Jaya	1987	"Decline of the Dimasa State : 1773-1830." M. Phil. dissertation. NEHU.
Choudhury, Sujit	1980	"Ranachandi : Transformation of a Dimasa Cachari Diety." *Religion and society of North East India*. Ed. Sujata Miri. Delhi : Vikas Publishing.
	1981	"A study of the Folk cults of Bengali Hindus of Cachar District." Ph. D. dissertation. G. U.

	1981	(Ed.) Mutiny Period in Cachar. Silchar : Tagore society for Culture.
	1985	"The Deity Dorai and Eunuch Priest-hood." *Folklore in North East India*. Ed. Soumen Sen. Delhi : Omson Publications.
	1986	"Export-price of Bamboo : The Mystry of its rise and fall." *Forest Development in North-East India*. Ed. Soumen Sen. Delhi : Omsons Publications.
	1988	"Bhuban Hill : A Cult Spot on the hill top." *Archeology of North East India*. Eds. Gautam Sen Gupta and D. P. Sinha. New-Delhi : Har-Anand Publications.
	1991	*শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস* - ১ম খণ্ড. কলকাতা : প্যাপিরাস।
Choudhury, Sunirmal	1984	"Growth of Commercial Banking in Cachar and its Impact on the District with special reference to Nationalised Banks." Ph. D. dissertation. G. U.
Das, Shibani	1987	"The Bishnupriya." M. Phil. dissertation. NEHU.
Deb, Anitya Benode	1992	"Implementation of Tribal Welfare Rural Development Programmes : A study of Joypur Part III Village." M. Phil. dissertation. D. U.
Deb, Ranendranath	1983	*শ্রীহট্ট পরিচয়।* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
Deb, Durba	1995	"শিক্ষাসেবক পত্রিকার লেখক ও বিষয় সূচী"; North Eastern Centre for advanced Studies, Silchar.

Dey, Nikhil Bhusan 1982 "Small Scale Industries in Cachar District : Their Growth Problems and Prospects." Ph. D. dissertation. G. U.

Dey, Ratna 1989 "Land Revenue Administration in Cachar During British Rule (1832 to 1900)." Ph. D. dissertation. G. U.

Dutta, Debabrata 1963 *History of Silchar Govt. High School*. Silchar : D. Dutta, Vakilpatty.

1969 *Cachar District Records 1834-53*. Silchar : D. Dutta, Vakilpatty.

কাছাড়ের প্রত্নলিপি। শিলচর : ডি. দত্ত, উকিলপট্টি।

শিলচর পৌরসভার ইতিহাস। শিলচর : ডি. দত্ত, উকিলপট্টি।

Dutta, Jharna 1980 "Social change in South Cachar in 19th Century." M. Phil. dissertation. NEHU.

Dutta, Shantanu 1993 "Development of Regional Identities : Study of N. E. India with special reference to Assam (1921-47)." Ph. D. dissertation. G. U.

Dutta, Sudhangshu Sekhar 1993 "Institutional Finance to Agricul-ture : A case study of Undivided Cachar District of Assam." Ph. D. dissertation. G. U.

Duttachaudhury, Arun 1982 "Some Aspects of Socio-Economic Conditions of Karimganj since Independence with Special reference to Community Development." Ph. D. dissertation. G. U.

Dutta Choudhury, Sunirmal	1988	*গঙ্গা থেকে সুরমা।* কলকাতা : নাভানা বি / ১০০ প্রিন্সেপ স্ট্রীট্।
Gait, Sir Edward	1905	The History of Assam. Gauhati : LBS Publications.
Ghosh, Dipali	1967-70	"Life in Kachari Village : Dimasa (Kachari) Life-way. An Ethnographic Study." Ph. D. dissertation. C. U.
Ghosh, Sujit Kr.	1987	"A Socio-Cultural study of Cachar during 18th and 19th Century." Ph. D. dissertation. G. U.
Gobindachandra Dhwajanarayan, Maharaj	1955	*শ্রী মহারাজগোৎসব গীতাবলী।* শিলচর : নিখিল কাছাড় হৈড়ম্ব বর্মণ সমিতি।
Goswami, Pranay Jyoti	1989	"Socio-Economic Life of Plains Tribal Communities in the Barak Valley - The extent of Transition." Ph. D. dissertation. G. U.
Guha, Upendra Chandra	1971	*কাছাড়ের ইতিবৃত্ত।* গৌহাটি : অসম প্রকাশনা পরিষদ।
Gupta, Kamalakanta	1967	Copper-plates of Sylhet (Vol.I). Sylhet.
Gupta, Nirod Kumar	1974	*স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি।* শিলচর : নির্মলেন্দু গুপ্ত, দেশবন্ধু রোড।
Hunter, W. W.	1990 (Reprint)	*A statistical Account of Assam. Vol. 2*. Delhi : Low Price Publications.
Kar, Suhir	1990	"Jangier Geet : A Heroic tale of Surma Barak Valley." Ph. D. dissertation. G. U.
	1990	*বিদ্রোহকাল ১৮৫৭ ও সুরমা-বরাক উপত্যকা।* করিমগঞ্জ : বিমান দে, ভারতী প্রেস।

	1991	*অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি - জীবনী ও সাহিত্য।* কলকাতা : শ্রী অরিজিৎ কুমার, টেকনোপ্রিন্ট।
	1992	*আসামে নজরুলচর্চা।* ঢাকা : রেজাউদ্দিন স্টালিন, নজরুল ইনষ্টিটিউট, কবিভবন, ধানমণ্ডি।
Laskar, Nitish Ranjan	1993	"Backward Communities in Assam : A study of SCs (1919-1947) with particular reference to the Surma Valley." Ph. D. dissertation. G. U.
Mazumdar, Narayan	1991	"The 1985 Assembly and Parliamentary Elections in Cachar District - An Analytical Study." M. Phil. dissertation. G. U.
Nath, Alpana	1990	"The Socio-Economic basis of Rural Power Structure : A case study of Panchayati Raj Institutions in Karimganj District." Ph. D. dissertation. G. U.
Nath, Narayan	1341 (Bengali Year)	*মহারাণী ইন্দ্রপ্রভার মোকদ্দমা* : বায়ালিপার : ঈশ্বরচন্দ্র দেব চৌধুরী, হাইলাকান্দি।
Nath, Rajmohan	1947	*সোনাধনের গীত।* শ্রীহট্ট : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ।
	1964	(Ed.) *বঙ্গীয় নাথ পন্থের প্রাচীন পুঁথি।* কলিকাতা : সাধনা প্রকাশনী।
	1981	*Antiquities of Cachar.* Silchar : Lopinath Nath, College Road.
Nandy, Monolina	1990	"The Role of Congress in Barak Valley during Pre-Independence Period." M. Phil. dissertation. NEHU.
Paul, Amiya Kumar	1971-74	"Tea-Industry in Cachar." Ph. D. dissertation. G. U.

	1981	"Sterling and North-East India's tea." *Problems of Tea-Industry in N. E. India*. Calcutta : Research India Publications. Pp. 52-65.
Paul, Ashutosh	1986	"The Problems of Industrial Development in Cachar District." Ph. D. dissertation. G. U.
Paul Choudhury, Paritosh		*কাছাড়ের কান্না।*
Paul Choudhury, Sanghamitra	1992	"Sylhet Referendum - 1947." M. Phil. dissertation. NEHU.
Pemberton, Capt. R. G.	1966	*Report on Eastern Frontier of British India*. Guwahati : Department of Historical and Antiquarian Studies in Assam.
Raul, Rajani Kanta	1993	"Industrial Financing : A case study of Cachar and Karimganj Districts." Ph. D. dissertation. G. U.
Roy, Amita	1990	"The Re-Union Movement in Surma Valley (Assam) 1917-1929." M. Phil. dissertation. NEHU.
Roy, Janmajit	1994	*সার্ধ শতকের বরাক উপত্যকা : সাহিত্য ও সমাজ।* করিমগঞ্জ : অক্ষর, সাহিত্য প্রকাশনী।
Sen, Sudhir	1378 (Bengali Year)	*বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙালীদের অবদান।* গৌহাটি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
Sen, Surendra Nath	1942	*প্রাচীন বাংলা পত্র-সংকলন।* কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
Sen Gupta, Arun-Jyoti	1985	"Status of Zamindars and Tenants in Karimganj Sub-division before and after 1951 : a comparative Study." *Land Reforms and*

Peasants Movements. Ed. Atul Goswami. Gauhati : Omsons Publications, New-Delhi. Pp. 116-123.

1986 "Population of Karimganj : A study of Age-Groups." *The Patterns and Problems of Population in N. E. India*. Ed. B. Dutta Roy. New-Delhi : Uppal Publishing House, Pp. 407-418.

1986 "Voting behaviour in Karimganj Sub-division (Assam) : A preliminary exercise." *Electoral Politics in N. E. India*. Ed. Dr. P. S. Dutta. New-Delhi : Omsons Publications. Pp. 53-63.

1990 "Farewell to Welfare : A Study of Tea-Garden labourers in Karimganj District." *The Garden Labourers in North East India : A Multidimensional Study in the Adivasis of the Tea-Gardens in N. E. India*. Eds. S. Karotemprel and Dr. B. Dutta Roy. Shillong : Vendrame Institute. Pp. 368-372.

1991 "Old wine in New Bottles – A Study of the impact of land reforms in Karimganj District." *Impact of Land-Reforms in N. E. India*. Ed. Malabika Das Gupta. New-Delhi : Omsons Publication. Pp. 231-235.

Shamsuddin, Al-Sahiba 1989 "Wage Differentials in Organised and Unorganised Industries in Assam (with special reference to Cachar)." M. Phil. dissertation. A. M. U.

Sharma, Chanchal Kumar	1984	*শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিষ্ট আন্দোলন : স্মৃতিকথা।* কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী।
	1990	*সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস।* কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী।
Sharmono, Shribattabasi	1326 (Bengali Year)	*রামকুমার চরিত।* শিলচর : সরস্বতী লাইব্রেরী।
Shyam, Alpana Nag	1983	"Some Aspects of Employment and Unemployment : A case study in the Cachar District of Assam." M. Phil. dissertation. NEHU.
Sinha, Shashikanta	1974-77	"Study of the Bishnupriya sect of Manipuries : A study of their Social Philosophy specially the Socio-Culuarl Background." Ph. D. dis-sertation. G. U.
Tattanidhi, A. C.	1317 (Bengali Year)	*শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।* সিলেট।
Woodthrope, R. G.	1980	*The Lushai Expedition*, (1871-72) Guwahati : Spectrum Publications.

তালিকাটি সংশ্লিষ্ট গবেষকদের কাছ থেকে ও অপরাপর সূত্র থেকে এ যাবৎ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। এ সম্পর্কিত যে কোন মতামত বা তথ্য গবেষণা পরিষদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হবে।

গবেষণা পরিষদের অনুরোধক্রমে পরিষদ সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিন্যস্ত করে তালিকাটি সংকলন করেছেন প্রশান্ত রঞ্জন আচার্য। তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন, অসিত রঞ্জন ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শান্তনু দত্ত, বিশ্বতোষ চৌধুরী ও অনিত্য বিনোদ দেব।

–আহ্বায়ক, গবেষণা পরিষদ।

১৬ এপ্রিল, ১৯৯৫, শিলচরে 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' কর্মসূচীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পঠিত গবেষণা পরিষদের আহ্বায়কের লিখিত প্রতিবেদন

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও প্রিয় সুধীবর্গ,

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতিকে ও উপস্থিত বিদ্বজ্জনদের গবেষণা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ঐতিহাসিকবিস্মৃতি, উন্নয়নে গতিহীনতা ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা - এ তিনের দীর্ঘকালীন সহবাসে উপত্যকাজুড়ে আজ জন্ম নিয়েছে এক সামাজিক অচলায়তন, ব্যক্তি মনের আবিল যেখানে সৃষ্টির গতিরোধ করে দাঁড়ায়, স্বাভাবিক 'চলা' তার ছন্দ হারিয়ে ফেলে। এ কুয়াশার আবরণ ছিন্ন হোক। আমরা চাইব, ১৪০২ সালে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হোক মনের দিগন্ত। চিন্তার মুক্তি ঘটুক বরাক উপত্যকায়।

১৪০১ সাল শেষ হয়েছে। 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' উদ্যাপনের পথে ৩রা বৈশাখ, ১৪০১ বঙ্গাব্দে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার এক বছর আজ পূর্ণ হ'ল। আপনারা জানেন, এই বর্ষ উদ্যাপনের প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপিত হয় শিলচরের শতাব্দী স্মরণ উপলক্ষে কাছাড় জেলা সমিতি আয়োজিত 'অরাজনৈতিক সংসদ' সভায় ইতিহাস বিষয়ক অধিবেশনে। প্রস্তাবক ছিলেন ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য। শিলচরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে বিষয়-নির্বাচনী সভায় প্রস্তাবটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন কাছাড় জেলা সমিতিই সে সময়কার সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা বিশ্বাস। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, আজ বর্ষ-কর্মসূচীর এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছেন, কাছাড় জেলা সমিতি। আলোচনার অবতারণা করেছেন শ্রীমতী অনুরূপা বিশ্বাস এবং বর্ষ-কর্মসূচীর সমাপ্তিসূচক অভিভাষণটি দেবেন মূল প্রস্তাবক ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য স্বয়ং। গবেষণা পর্ষদের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলা সমিতিকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ।

গবেষণা পর্ষদকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের। নিজ সীমাবদ্ধতার চৌহদ্দিতে আমরা দায়িত্ব পালনের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আজ এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বর্ষ-কর্মসূচীর রূপরেখাটিকে আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরব।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত খাসপুরে উপত্যকার গবেষকদের এক অনাড়ম্বর সমাবেশে বর্ষ-কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইতিহাসবিদ্ ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি শ্রী প্রভাস সেন মজুমদার। ঐ একই দিনে উপাচার্য ডঃ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত কর্মসূচী নির্ধারণী সভায় বর্ষ-কর্মসূচীর প্রাথমিক রূপরেখাটিকে চূড়ান্ত করা হয়।

২৩শে মে থেকে ২৫শে মে, ১৯৯৪ : শিলচর কাছাড় কলেজে অনুষ্ঠিত হয় 'ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতি' শীর্ষক তিনদিনের কর্মশালা। গবেষণা পরিষদের অনুরোধে বরাক উপত্যকার এই প্রথম গবেষণা-বিষয়ক কর্মশালাটির আয়োজন করেন যৌথভাবে কাছাড় কলেজ কর্তৃপক্ষ ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। মোট সাতটি সেশনে বিভক্ত কর্মশালায় ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতি, প্রথাগত ও অপ্রথাগত তথ্যসূত্র, লোকায়ত উপাদান সমূহের ব্যবহার যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষিণ আসামের বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত প্রায় চল্লিশজন গবেষককে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৯শে জুন, ১৯৯৪, গবেষণা পরিষদের আহ্বানে শিলচর দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ে লেখক-সাংবাদিক-শিক্ষাবিদ্ ও সংস্কৃতি-কর্মীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করার জন্যে ইতিহাসবিদ্ শ্রী দেবব্রত দত্তকে সভাপতি করে কাছাড়-জেলা-ভিত্তিক একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কাছাড় জেলার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা, আঞ্চলিক ও জেলা সমিতি, সংবাদপত্র ও লিটল্ ম্যাগাজিন গোষ্ঠী ও আকাশবাণী, দূরদর্শন, মহকুমা পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' কর্মসূচীতে সামিল হবার আহ্বান জানান। পরে করিমগঞ্জে শ্রী চন্দজ্যোতি ভট্টাচার্য ও হাইলাকান্দিতে শ্রী শক্তিধর চৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত দুটি সভা থেকেও ঐ দুই জেলায় বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে একইভাবে আহ্বান জানানো হয়।

বর্ষ-কর্মসূচীর রূপায়ণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল বরাক উপত্যকার গ্রামাঞ্চলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাস-বিষয়ক সেমিনার বা আলোচনা সভা আয়োজনের উপর। এ পর্যায়ে ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, সোনামুখীঘাট মইনুল হক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ মোঃ সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও শিক্ষক শ্রী সঞ্জীব দেব লস্করের উদ্যোগে প্রথম অঞ্চলভিত্তিক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনব্যাপী এই সেমিনারে স্থানীয় শিক্ষক, অধ্যাপক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ লিখিত নিবন্ধ পাঠের মাধ্যমে বৃহত্তর সোনাই অঞ্চলের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন।

গবেষণা পরিষদের সদস্য ডঃ কামালুদ্দিন আহমেদের উদ্যোগে ও শ্রী গোপেন্দ্র কিমার সিন্‌হা ও মোঃ সামসুদ্দিনের আহ্বানে দ্বিতীয় অঞ্চল ভিত্তিক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৫, আসিমগঞ্জে আসিমিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই সেমিনারে প্রতাপগড় জাফরগড় অঞ্চলের ইতিহাসের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৫, ডঃ শিবতপন বসুর উদ্যোগে এবং বদরপুর আঞ্চলিক সমিতি ও বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বৃহত্তর বদরপুর অঞ্চলের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

১৯৯৫ ইংরাজীর ফেব্রুয়ারী মাসে কাছাড়ের বড়যাত্রাপুর কলেজে অনুষ্ঠিত হয় এই পর্যায়ের চতুর্থ ও শেষ অঞ্চলভিত্তিক সেমিনার। ইতিহাস-সচেতনতা ও ইতিহাস অনুসন্ধানের আগ্রহকে জনগণের তৃণমূল স্তর অব্দি ছড়িয়ে দেয়ার কাজে অঞ্চল-ভিত্তিক সেমিনারগুলো যে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে - এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হলো গত ২২শে থেকে ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯৫ - এই তিন দিন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দক্ষিণ আসামের ইতিহাস ও সমাজ'

শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন। গবেষণা পরিষদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ও ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের অনুদানে বরাক উপত্যকায় প্রথমবারের মত এধরণের একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উপত্যকার ও উপত্যকার বাইরে থেকে আসা প্রায় চল্লিশজন গবেষক লিখিত নিবন্ধে বরাক উপত্যকা সহ দক্ষিণ আসামের ইতিহাস ও সমাজের অনালোচিত বহু দিককে সেমিনারে অন্যদের সামনে তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সেমিনারে পঠিত নিবন্ধগুচ্ছকে যথাযথ সম্পাদনা করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বরাক উপত্যকার ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও প্রচারের জন্য গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে ১২ জুলাই, ১৯৯৪, আকাশবাণীর শিলচর কেন্দ্রের অধিকর্তাকে লিখিত অনুরোধ জানানো হয়। পরিষদের আহ্বায়কের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিল দল অধিকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন ও তাকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। আমরা কৃতজ্ঞ যে, আহ্বানে সাড়া দিয়ে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ 'বরাক উপত্যকার ইতিহাসের সন্ধানে' শীর্ষক একটি আলোচনামালা প্রযোজনা ও প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলোচনামালার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বটিও প্রচারিত হবে খুব শিগগিরই।

বর্ষ-কর্মসূচীর রূপায়ণে উপত্যকার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও লিটল্ ম্যাগাজিন গোষ্ঠী যে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন, তা অভিনন্দনযোগ্য। উদারবন্দ থেকে 'উদারবন্দ' পত্রিকা, করিমগঞ্জ থেকে 'দিগ্বলয়' ও 'অক্ষরবৃত্ত', শিলচর থেকে 'অন্তরীণ', হাফ্লঙ থেকে 'জাতিস্মর' বিশেষ ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ-সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকায় অনুসন্ধান-ধর্মী নিবন্ধ প্রকাশের কাজ অব্যাহত রয়েছে। 'সোনার কাছাড়', 'প্রান্তজ্যোতি', 'গতি', 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'এই ত স্বদেশ', 'পূর্বায়ণ' - সহ উপত্যকার প্রায় সব কটি সংবাদপত্র ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ সম্পর্কিত সংবাদ ও নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে গবেষণা পরিষদকে সহায়তা করে গেছেন।

১৯৯৪-র ডিসেম্বর মাসে বিশেষ বক্তৃতাসভার আয়োজন করেছিলেন শিলচরের North Eastern Centre for Advanced Studies। বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য। বক্তব্যের বিষয় : 'ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় নারীবাদী দৃষ্টিকোণ'। ঐ একই সভায় প্রবীণ সংগ্রামী শ্রী মৃণাল দাশগুপ্তের আত্মজীবনী গ্রন্থ 'যে পথ দিয়ে এলাম'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

বরাক উপত্যকার ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই উপত্যকার লোকায়ত তথ্যসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ও লুপ্তপ্রায় উপাদানসমূহের সংগ্রহ ও পরিচর্যার স্বার্থে আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক লোক-উৎসব আয়োজনের জন্য তৎপর হবার আহ্বান জানাই। স্বীকার করা প্রয়োজন, গত ৯, ১০ ও ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪, মোঃ মহবুবুল বারি মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও শিলচর মহকুমা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় তিনদিনব্যাপী যে কাছাড়-জেলাউদ্ভিত্তিক উৎসব ও প্রদর্শনী হয়ে গেল, তা এক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। লোক-উৎসব আয়োজনের এ ধারাটি আগামীতেও অব্যাহত থাকবে এবং উপত্যকার অন্যান্য জেলাতেও তা বিস্তৃতিলাভ করবে - এই আশা রাখছি।

আপনারা জানেন যে, গত দুই দশক যাবৎ উত্তর-পূর্ব ভারতে ইতিহাস গবেষণার অনুকূল পরিকাঠামো ও বাতাবরণ সৃষ্টির কাজে North East India History Association বা NEIHA

উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। অথচ, এখনো অব্দি বরাক উপত্যকায় এই সংস্থার কোন বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় নি। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা ৬ এপ্রিল, ১৯৯৪, একটি চিঠিতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়কে NEIHA র পরের অধিবেশনটি যাতে শিলচরে হয় - এর জন্য উদ্যোগী হবার আহ্বান জানাই। আমরা আনন্দিত যে, উপাচার্য ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য ও NEIHA-র কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ডঃ সঞ্জল নাগের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অরুণাচল প্রদেশে অনুষ্ঠিত NEIHA-র গত অধিবেশনে শিলচরকে এই সংস্থার আগামী অধিবেশনের স্থানরূপে মনোনয়ন করা হয়েছে। বিশাল এই সংস্থার আস্ত অধিবেশনটি যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে, তার জন্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার দায়িত্ব আমাদের সবাইকে নিতে হবে।

ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের মূল লক্ষ্য ছিল দুটি :

(১) বরাক উপত্যকার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অনুসন্ধানের তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপত্যকায় গবেষণামুখী অনুপ্রেরণা সৃজন; ও

(২) জনগণের সকল স্তরে ইতিহাস-সচেতনতার প্রচার ও প্রসার।

গবেষণা পরিষদ বা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সীমিত সাধ্যে এই উদ্দেশ্য-সাধন সম্ভব হতো না। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপত্যকার সকল স্তরের জনগণ, গবেষকগণ, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচীর প্রতি যে সমর্থন ও সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছেন, তা অভূতপূর্ব। এই সমর্থন ও অংশগ্রহণ শুধু যে আমাদের লক্ষ্যে কাছাকাছি পৌঁছতে সাহায্য করেছে, তা নয়, একই সঙ্গে তা গবেষণা পরিষদকে আগামী দিনে আরো বড় প্রকল্পের পরিকল্পনা রচনায় অনুপ্রাণিত করবে।

ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষে আমরা চেয়েছিলাম ছোট বড় মিলিয়ে অন্তত: ত্রিশটি অনুসন্ধান প্রকল্প সম্পাদিত হোক। কার্যত: এই এক বছরে জাতীয় সেমিনার, বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক সেমিনার, প্রকাশনা সবকিছু মিলিয়ে পঞ্চাশটিরও বেশী অনুসন্ধান ধর্মী নিবন্ধ ও গ্রন্থ উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়েছে। বরাক উপত্যকায় এটি একটি রেকর্ড। ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ যে উপত্যকার গবেষকদের মনে নব উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পেরেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্ষ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষিত হবে আজ। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস-অনুসন্ধানের কাজ ত শুরু হলো মাত্র। আগামী দিনে এ অনুসন্ধান যে আরো তীক্ষ্ণ ও তীব্রতর হয়ে উঠবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্ষব্যাপী এ যাত্রায় যাঁদেরকে সহযাত্রী, বন্ধু, পরামর্শদাতা ও শুভানুধ্যায়ীরূপে পেয়েছি, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতি, বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক সমিতির সদস্য বন্ধুদেরকে, বিভিন্ন আলোচনা-সভা, সেমিনার, বক্তৃতা সভা ইত্যাদির আয়োজক ও সংগঠকদেরকে, এবং আকাশবাণী, মহকুমা পরিষদ ও অন্যান্য সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে, যাঁদের অংশগ্রহণ বর্ষ-কর্মসূচীকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে।

শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেও বর্ষীয়ান শ্রী দেবব্রত দত্ত আজ এই অনুষ্ঠানে সভা-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তাঁর অকৃপণ স্নেহ আগামীদিনেও আমাদেরকেও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য বর্ষব্যাপী যাত্রায় ছিলেন একাধারে আমাদের সহযাত্রী, পথপ্রদর্শক ও অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই সনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা আমাদের সঙ্কল্পকে আজ প্রত্যয়ের শক্ত ভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। গত ৩রা বৈশাখ, ১৪০১, ইতিহাস বর্ষে আমাদের 'চলা' শুরু হয়েছিল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে। বর্ষ-শেষে সমাপ্তিসূচক অভিভাষণটির জন্যও তাঁকেই আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

গবেষণা পর্ষদের সদস্য (১৪০১) ডঃ কামালুদ্দিন আহমেদ, ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, ডঃ শিবতপন বসু ও মোঃ আবুল হুসেন মজুমদারকে ধন্যবাদ জানানো অতিশয়োক্তিই নামান্তর। বস্তুতঃ ইতিহাস বর্ষে কাজ যা হয়েছে, তা পরিষদের সদস্যদের সম্মিলিত চিন্তা ও প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি।

আপনারা ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ কর্মসূচী পরিকল্পনার যে গুরু দায়িত্ব আমাদেরে অর্পণ করেছিলেন, আমরা সাধ্যানুসারে তা সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। বহু অপূর্ণতা হয়ত থেকেই গেছে। গবেষণা পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে যাবতীয় অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতির নৈতিক দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।

আপনাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার।

বিনীত

গবেষণা পরিষদের পক্ষে

১৬ এপ্রিল, ১৯৯৫

অপূর্বানন্দ মজুমদার

আহ্বায়ক